নবযুগের বাংলা

বিপিনচন্দ্র পাল

প্রকাশক

নারায়ণ পাল এম. এ

যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড

৪১এ, বলদেওপাড়া রোড,

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট ও বর্ণলিপি

কমল বসু

ব্লক

মডার্ণ প্রসেস এনগ্রেভারস

বাঁধিয়েছেন

ইউনিভার্সাল বুক বাইণ্ডারস

মুদ্রাকর

নিউ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোম্পানী লিঃ

জ্ঞানাঞ্জন পাল

৪১এ, বলদেওপাড়া রোড,

কলিকাতা-৬

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ

বৈশাখ, ১৩৬২

মূল্য—ছয় টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল ১৩২৮—'৩১ সালে "বঙ্গবাণীতে" "বাংলার নবযুগের কথা" নাম দিয়া ধারাবাহিকভাবে ১৬টি প্রবন্ধ লেখেন। তাহাই সংকলন করিয়া "নবযুগের বাংলা" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

"বাংলার নবযুগের নাট্যকলা এবং নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র" প্রবন্ধটি তাঁহার পরলোক গমনের অল্প পূর্ব্বে লেখা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা দিতে তাঁহাকে আহ্বান করেন। সেই সূত্রেই এই প্রবন্ধটি তিনি আরম্ভ করেন, কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই; বক্তৃতাও দেওয়া হয় নাই। ১৯৩২ সালে ২০শে মে সন্ন্যাস রোগে তিনি পরলোক গমন করেন।

বৈশাখ, ১৩৬২

দেশচর্য্যায় দীক্ষা

"শিবনাথ শাস্ত্রীই আমাদের স্বাধীনতার সাধনার ও স্বদেশ-চর্য্যার প্রথম দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। তাঁহার নায়কত্বে আমরা ক'জন মিলিয়া একটা ছোট দল গড়িবার চেষ্টা করি।

" আমাদের প্রতিজ্ঞা-পত্রের প্রথম কথা ছিল—'স্বায়ত্ব-শাসনই (তখনও স্বরাজ শব্দের প্রচার হয় নাই) আমরা একমাত্র বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি।' অর্থাৎ যে শাসন স্বায়ত্ব-শাসন নহে, শাসিতের উপরে ধর্ম্মতঃ তাহার কোনও অধিকার আছে বলিয়া আমরা মানি না। 'তবে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের আইন-কানুন মানিয়া চলিব—কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দ্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও এই গভর্ণমেণ্টের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিব না।'

"এই প্রতিজ্ঞা-পত্রের দ্বিতীয় কথা ছিল—'আমরা জাতিভেদ মানিব না; পুরুষের একুশ বৎসর পূর্ব্বে এবং রমণীর পক্ষে ষোল বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করিব না, বিবাহ দিব না এবং বিবাহে সাহায্য করিব না।'

"তৃতীয় কথা ছিল—'লোকশিক্ষা প্রচারে প্রাণপণ যত্ন করিব।'

"চতুর্থ কথা ছিল—'অশ্বারোহণ, বন্দুক ছোড়া (তখনও অস্ত্র-আইন প্রচলিত হয় নাই) প্রভৃতি নিজেরা অভ্যাস করিব এবং অপরকে অভ্যাস করিতে প্রণোদিত করিব।'

"পঞ্চম কথা ছিল—'আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জ্জন বা রক্ষা করিব না, যে যাহা অর্জ্জন করিবে তাহাতে সকলের সমান অধিকার থাকিবে, এবং সেই সাধারণ ভাণ্ডার হইতে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিয়া স্বদেশের হিতকর কর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিব।'

"নবযুগের বাংলা"—পৃঃ ১২২-২৩

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

নবযুগের বাংলা

প্রথম কথা

বাংলার বৈশিষ্ট্য

বাঙ্গালী বাংলার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত বাংলার শ্রেষ্ঠতম মনীষিগণ বাংলায় যে চিন্তা ও ভাবকে তিলে তিলে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, আজিকার বাঙ্গালী যুবকেরা কেবল নহেন অনেক বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত সে বাংলাকে চেনেন না। বাংলার চিন্তারাজ্য আজ নিস্পন্দ, ভাবের স্রোত বন্ধ, বাংলার যে একটা বৈশিষ্ট্য চিরদিন ছিল, এখনও আছে, যে বৈশিষ্ট্য হারাইলে ভারতবর্ষের সমষ্টিগত চিন্তা, ভাব ও কর্ম্মভাণ্ডারে বাংলার আর কিছুই দিবার থাকিবে না, সে বৈশিষ্ট্যের কথা আজিকার বাঙ্গালী কেবল ভুলিয়াছেন তাহা নহে, তাহার উল্লেখমাত্র তাঁহাদিগকে অধীর করিয়া তুলে।

তাঁরা বলেন, আমরা কি প্রাদেশিকতাকে আবার বাড়াইয়া তুলিয়া ভারতের বিরাট জাতীয় জীবনের ঐক্যকে নষ্ট করিয়া দিব? বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালীত্বের অভিমানে ফাঁপিয়া উঠে, মারাঠা ও পাঞ্জাবী যদি আপন আপন প্রাদেশিক ইতিহাসের গৌরবে মুগ্ধ হইয়া ভারতে আবার নিজকে সকলের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, রাজপুত যদি পাঠান হইতে, তামিল যদি তৈলঙ্গী হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া রাখিতে চাহে, তবে ভারতে আমরা যে বিরাট জাতীয় জীবনের স্বপ্ন দেখিতেছি, তাহার সফলতার সম্ভাবনা কই? প্রাদেশিকতার যুগ চলিয়া গিয়াছে,

জাতীয়তার যুগ আসিয়াছে, এ যুগে আবার বাংলার কথা লইয়া অত বাড়াবাড়ি কেন ?

যাঁরা এভাবে ভারতের নূতন জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহেন, তাঁরা যেমন বাংলাকে চিনেন না সেইরূপ ভারতবর্ষকেও চিনেন না। তাঁহারা এখনও য়ুরোপের ইতিহাসের মোহে পড়িয়া আছেন। য়ুরোপ যে পথে তার আধুনিক জাতীয়তা বা Nationalism গড়িয়া তুলিয়াছে, ইঁহারা সেই ভাবেই ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ ও নানা জাতিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক ছাঁচে ঢালিয়া একটা নূতন ভারতীয় জাতি বা Indian Nation গড়িয়া তুলিতে চাহেন।

ইঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে তাঁহাদের এই ভাবের মধ্যে ইংরাজের ভাবই জয়যুক্ত হইতেছে। ইংরাজ কহেন ভারতবর্ষ একটা দেশ নহে, কিন্তু একটা মহাদেশ, ভারতবর্ষের এক পর্য্যায় আমরা ইতালী বা ফরাসী, ইংলণ্ড বা জার্ম্মানীকে বসাইতে পারি না। ভারতবর্ষের এক পংক্তিতে বসাইতে হইলে গোটা য়ুরোপকেই বসাইতে হয়। য়ুরোপের মধ্যে যেমন ইংলণ্ড আছে, ফরাসী আছে, ইতালী আছে, অষ্ট্রিয়া আছে, জার্ম্মানী আছে, রুশ আছে, সেইরূপ ভারতবর্ষে বাংলা আছে, গুজরাট আছে, পাঞ্জাব আছে, অন্ধ্র আছে, রাজপুতানা আছে, কর্ণাট আছে, মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজ আছে। এ সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যতটা পার্থক্য ও প্রভেদ আছে, য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রেও প্রায় সেইরূপই প্রভেদ আছে। এদের ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, প্রকৃতি এমন কি সমাজ-গঠন পর্য্যন্ত পরস্পর হইতে স্বল্পবিস্তর বিভিন্ন। গোটা ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে মোটামুটি ধর্ম্মের একটা ঐক্য আছে বটে ; এরূপ ঐক্য য়ুরোপেও আছে। তুরস্ককে বাদ দিলে য়ুরোপের সর্ব্বত্র একই খৃষ্টধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। আর প্রটেষ্টেণ্ট, ক্যাথলিক, গ্রীক চার্চ্চ বা রাশিয়ান চার্চ্চ—এ সকলের মধ্যে যে

পার্থক্য আছে, মাদ্রাজের স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব, মহারাষ্ট্রের শৈব ও গাণপত্য, বাংলার শাক্ত ও বৈষ্ণব, এ ছাড়া নানকপন্থী, কবীরপন্থী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা কম নহে—এ সকলের উল্লেখ করিয়া ইংরেজ কহেন যাহাকে জাতি বা নেশন কহে, তার উপাদান ভারতে এখন বিদ্যমান নাই। ইংরাজ ভারতের একচ্ছত্র রাষ্ট্রপতি হইয়া এক শাসন শৃঙ্খলে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশকে বাঁধিয়া, একখাতে ভারতের আধুনিক ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের প্রবাহকে চালাইয়া, ভারতে এই সর্ব্বপ্রথম একটা জাতীয় জীবনের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। এই পথেই যদি সম্ভব হয় ভবিষ্যতে একদিন য়ুরোপের মত ভারতবর্ষেও একটা বিরাট জাতির সৃষ্টি হইতে পারে। হইবেই যে এমনও বলা যায় না। এই অজুহাতেই ইংরাজ এ পর্য্যন্ত আমাদের আধুনিক জাতীয়তার স্পর্দ্ধাকে অগ্রাহ্য করিয়া আপনার শাসন শৃঙ্খলাকে সর্ব্বদাই নানাভাবে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

ইংরাজ কহেন, আমরা চিরদিনের জন্য তোমাদের শাসনভার বহন করিতে আসি নাই। আমাদের দেশ যেমন এক হইয়াছে, এক শাসনে শাসিত, এক ভাষা, এক ধর্ম্ম, এক ভাবের ও ঐতিহাসিক গৌরবের বন্ধনে আবদ্ধ, তোমরা যেদিন সেইরূপ হইবে অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষে যেমন এক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইরূপ একভাষা প্রচলিত, এক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত, এক সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, মোটের উপর একই আচার-পদ্ধতি, একই রীতিনীতি, একই আদর্শের প্রেরণা গড়িয়া উঠিবে, সেদিন ভারতে জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা হইবে, সেইদিন তোমাদের নেশনত্বের দাবী মাথা হেঁট করিয়া মানিয়া লইতেই হইবে; সেদিন আমরা অম্লানবদনে তোমাদের দেশ ও তোমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের ভার তোমাদের হাতে অর্পণ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিব। কিন্তু যতদিন না তোমরা একটা জাতি হইয়াছ ততদিন

আমরা যদি না থাকি—তোমাদের ছাড়িয়া যাই, তোমরা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া দেড়শত বৎসরে দেশে যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিবে এবং আমাদের পরিত্যক্ত রাজদণ্ড অন্য কোন প্রবলতর প্রতিবেশী আসিয়া নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া আবার তোমাদিগকে নূতন পরদেশী শাসনের অধীন করিবে।

যাঁরা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক জীবনকে পঙ্গু করিয়া ভারতের একতার নামে প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাহ্য করিয়া য়ুরোপের ছাঁচে ভারতের জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিবার কল্পনা করেন, তাঁরা ইংরাজের এ আপত্তিকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। তাঁরা জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক ভারতের জাতীয় জীবনের গঠনে, য়ুরোপে যে আদর্শে আধুনিক জাতীয়তা বা Nationality'র প্রতিষ্ঠা হইয়াছে সেই আদর্শেরই অনুসরণ করিতেছেন। তাঁহাদের য়ুরোপ-বিদ্বেষ যতটা প্রবল হউক না কেন, এই বিদ্বেষের ভিতর দিয়াই তাহারা সর্ব্বদা—"শত্রুভাবে" য়ুরোপকেই সাধন করিয়া য়ুরোপকেই পাইতেছেন। তাঁরা বলেন বটে, ভারতের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করাই ভারতের নূতন জাতীয়তার লক্ষ্য, কিন্তু ভারতের এই বৈশিষ্ট্য কি,—এ প্রশ্নটা সম্যক অনুধাবন করিয়া দেখেন না।

(২)

কি, ধর্ম্মে কি সমাজে, কি রাষ্ট্রীয় গঠনে, যখন ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র ছিল—ভারতবর্ষের প্রকৃতি ও সাধনা, জীবনের সকল বিভাগে সর্ব্বদাই সমষ্টির ঐক্যের ভিতরে ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কোথাও কোন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা

করিতে যাইয়া সেই সম্বন্ধের অন্তর্গত ব্যক্তি বা বিষয়ের স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যকে বিনাশ করে নাই। ভারতের দেবতা এক নহেন বহুও নহেন, কিন্তু তিনি সেই এক যাঁহার মধ্যে একের সঙ্গে বহু ও বহুর সঙ্গে একের সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের ধর্ম্ম খৃষ্টীয়ান বা মুসলমান ধর্ম্মের মতন ঠিক একটা ধর্ম্ম নহে; এ ধর্ম্মে কোনও এক অনন্যপন্থা, কোনও একটা সাধন, কোনও একটা মাত্র প্রামান্য শাস্ত্র, কোনও একজন মাত্র ঈশ্বরের বা গুরুর প্রতিষ্ঠা হয় নাই। এ ধর্ম্মের বহু শাস্ত্র, সকলেই নিজ নিজ অধিকারে প্রামান্য বলিয়া পরিগণিত; বহু পন্থা, কিন্তু নদীসকল যেমন এক সাগরে যাইয়া পড়ে, সেইরূপ এই সকল বিভিন্ন পন্থা, যিনি "নৃণাম একো গন্তব্যঃ" তাঁহারই পদতলে গিয়া মিশিয়াছে। এ ধর্ম্মের বহু অবতার, নিজ নিজ যুগে সকলেই অনন্য-প্রাধান্য রক্ষা করিয়া সেই একেরই মহিমা প্রচার করিয়াছেন। এ অবতার-ধারা সৃষ্টির অনাদি আদি হইতে আরম্ভ হইয়া আজ পর্য্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইতেছে। এ ধর্ম্মে অসংখ্য গুরু, নিজ নিজ জীবনের প্রামান্য ও প্রত্যক্ষ সিদ্ধির পথে মুমুক্ষু মানবকে লইয়া যাইতেছেন। এত বৈচিত্র্যের মধ্যে এমন অপূর্ব্ব একত্ব, এত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এরূপ বিরাট উদার সমতা, ব্যষ্টিকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন করিয়াও সমষ্টির নিরবিচ্ছিন্ন ঐক্য এমন ভাবে রক্ষিত আর কোথাও দেখিতে পাই না। আর সর্ব্বত্রই প্রায় মানুষকে এক ছাঁচে ঢালিয়া একাকারের উপরে ঐক্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে। সে চেষ্টা সফল হয় নাই; মানুষের প্রকৃতিতে এরূপ নিষ্পেষণ সহ্য হয় না। এই জন্য বারংবার মানুষ ধর্ম্মের এই কঠোর শাসনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে। কিন্তু ভারতের মনীষা স্মরণাতীত কাল হইতে মানব-প্রকৃতির মর্য্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া তাহাকে ধর্ম্মের শাসনে

ও সমাজের বন্ধনে বাঁধিয়াও, বৈষম্যের মধ্যেই সাম্য, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

যেমন ধর্ম্মে সেইরূপ সমাজে। বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে আধুনিক মনুষ্যত্বের আদর্শের দিক দিয়া বিচার করিলে অনেক কথা কহিতে পারা যায়। আমাদের প্রাচীনেরাও যে এই বর্ণাশ্রমকে ধর্ম্মের বা সমাজের শ্রেষ্ঠতম পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। বৈদিক যুগ হইতে জ্ঞানের পথ ও কর্ম্মের পথ—এই দুইটি প্রশস্ত পন্থা বিভাগ হইয়া, কেহ বা জ্ঞানকাণ্ড, কেহ বা কর্ম্মকাণ্ডের আশ্রয়ে নিজ নিজ জীবনের সার্থকতা অন্বেষণ করিয়াছেন। আর জ্ঞানের পথে যাঁহারা চলিতেন তাঁহারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম—উভয়কেই অগ্রাহ্য করিতেন। গীতাতে প্রথমে বর্ণাশ্রমের কর্ত্তব্য-বিধান করিয়াই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন, এই যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, ইহাই শেষ কথা নহে, প্রকৃত জ্ঞানী যাঁহারা, তাঁহারা সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি লাভ করিয়া গরু, হাতী, কুকুর, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে একই চক্ষে দর্শন করেন। বর্ণাশ্রমের উপরেও কথা আছে; সে কথা

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।

বর্ণাশ্রমাদি সকল প্রকারের লোকধর্ম্ম উপেক্ষা বা বর্জ্জন করিয়া, কেবলমাত্র সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান যে আমি, তাঁহারই শরণাপন্ন হও। আমিই তোমাকে এই বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম পরিত্যাগজনিত যে পাপ তাহা হইতে রক্ষা করিব।

সেই প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে কত ভাঙ্গাগড়া হইয়াছে, কত নূতন মতের প্রতিষ্ঠা, কত নূতন পন্থার প্রচার, কত নূতন সাধনের আবিষ্কার হইয়াছে। ইহারা প্রত্যেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকিয়া একই হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া

রহিয়াছে। এই ভাবে সমাজের কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বাহিরের বর্ণাশ্রম রক্ষা করিয়াও ভিতরে ভিতরে তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়াছে। অথচ হিন্দুসমাজ বলিয়া যে বিরাট বস্তু তাহার অঙ্গহানি কেহ করে নাই, করিতে পারে নাই, কাহাকেও করিতে দেওয়া হয় নাই। হিন্দুসমাজ কাহাকেও একান্ত বর্জ্জন করে নাই, সকলকেই আপনার বিশাল অঙ্কে তাহাদের নিজ নিজ কোটে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া রক্ষা করিয়াছে। যেমন হিন্দুধর্ম্মে, সেইরূপ হিন্দু সমাজজীবনেও এই ভাবে স্মরণাতীত কাল হইতে ব্যষ্টির বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য পরিপূর্ণ মাত্রায় রক্ষা রাখিয়া সমাজের সাধারণ একতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

যখন হিন্দুর নিজের অধিকারে রাষ্ট্রশক্তি ছিল তখন রাষ্ট্রীয় ঐক্য বন্ধনেও হিন্দু নীতিজ্ঞেরা এবং রাষ্ট্রপতিগণ এই আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। হিন্দু মহারাজ-চক্রবর্ত্তীরা রোমান বা আধুনিক য়ুরোপীয় জাতিদিগের মত এক একটা বৃহদায়তন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন নাই, কিন্তু প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের সঙ্গে সখ্যবদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সকলের অভিমতানুযায়ী তাহাদের অধিনেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন। কাহারও সঙ্গে বিরোধ হইলে তাহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া পরাজিত রাষ্ট্র আত্মসাৎ করিতেন না, কিন্তু পরাজিত রাষ্ট্রপতির কোনও উপযুক্ত দায়াধিকারীকে শূন্য সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহারই হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতেন, এবং তাঁহাকে আপনার সখা বা সামন্তরাজ রূপে গ্রহণ করিতেন।

এইরূপে কি ধর্ম্মে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে—সর্ব্বত্র হিন্দু বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়াই সাম্যের স্বাধীনতাকে বজায় রাখিয়াই ঐক্যের, ব্যষ্টির ও ব্যক্তির আত্মবিকাশ ও আত্মচরিতার্থতার পথ অবাধ রাখিয়া সমষ্টির ঘননিবিষ্টতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মুসলমানেরা যখন

এদেশে আসিলেন তখনও ভারতীয় সাধনার এই বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় নাই। মতবাদের বিরোধ সত্বেও হিন্দু মুসলমান সাধনার সার্ব্বজনীন সত্যকে আপনার করিয়া লইয়াছে, এবং ক্রমে, বিশেষতঃ এই বাংলা দেশে, এমনও দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে হিন্দুরা অকুণ্ঠিতভাবে মুসলমান দরগায় সিন্নি দিতেন এবং মুসলমানরাও সরল ভক্তিভরে হিন্দু দেব দেবীর নিকট বলি আনিয়া দিতেন। মুসলমান যুগে এইরূপে হিন্দুমুসলমানের একটা সমন্বয় সাধনের বহুতর চেষ্টা হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমানকে হিন্দু করিতে চাহে নাই, নিজেও মুসলমান হয় নাই, কিন্তু নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াই পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির সার্ব্বজনীন সাধনে এবং মানবতার উদার ভূমিতে হিন্দুমুসলমানের একটা ঐক্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আর সে চেষ্টা যে নিষ্ফল হয়, এমনও বলা যায় না। আধুনিক য়ুরোপীয় চিন্তা এই আদর্শকেই Federalism নামে অভিহিত করিয়াছে। আধুনিক সভ্যতা এবং সাধনাও এই আদর্শের অন্বেষণেই চলিয়াছে। এই আদর্শে স্বাধীনতার সঙ্গে বশ্যতার, স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে ঐক্যের, বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমতার সমন্বয় সাধন হইয়াছে। এই আদর্শের সন্ধান য়ুরোপ সবে মাত্র পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ পথ ভারতের চির-পরিচিত পথ।

ভারতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করাই যদি ভারতের জাতীয়তার লক্ষ্য হয়, তবে ভারতের এই নব জাতীয়তার সাধকেরা তাঁহাদের সাধনার এই সনাতন প্রকৃতিকে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভারতের বৈশিষ্ট্য যে কি, ইহা যাঁহারা বোঝেন এবং সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া চলেন, তাঁহারা সমগ্র ভারতের ঐক্য সাধনের লোভে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যকে কখনই উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভারতের এই বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান প্রায় লোপ পাইয়াছে বলিয়াই, আজ

বাঙ্গালী প্রত্যক্ষ বাংলাকে ভুলিয়া, অপ্রত্যক্ষ যে ভারতবর্ষ নামে কল্পিত বস্তু, তাহার পশ্চাতে ছুটিতে চাহে।

(৩)

ভারতের সমষ্টিগত সমাজ ও চরিত্রের এবং সাধারণ ভারতীয় সাধনার যেমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেইরূপ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক সাধনা ও সভ্যতার তুলনায় বাংলারও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। জগতের বিভিন্ন সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার যেমন একটা বিশেষত্ব আছে, ভারতের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে বাংলার সভ্যতা ও সাধনার সেইরূপ একটা বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বই বাঙ্গালীকে ভারতের অপরাপর জাতি হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে ; ইহাই বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব। বাংলার ইতিহাসে, বাংলার ধর্ম্মে, বাংলার সাহিত্যে ও শিল্প-কলাতে, বাংলার সমাজ-জীবনে—সকল বিষয়ে বাঙ্গালীর এই বিশেষত্বটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বিশেষত্বটা আধুনিক নহে—অতি পুরাতন। যতদিন বাঙ্গালী সৃষ্টি হইয়াছে ততদিন হইতে এই বিশেষত্ব তিলে তিলে ফুটিয়াছে। এই বিশেষত্বকে রক্ষা করিয়া, এই বিশেষত্বের মধ্যে যাহা সার্ব্বজনীন তাহাকে বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়া, তাহার দ্বারা ভারতের সাধারণ সাধনা ও জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টি সাধন করাই বর্ত্তমান যুগে বাংলার প্রধান কর্ত্তব্য। বাংলা, পাঞ্জাব বা মাদ্রাজ, গুজরাট বা অন্ধ্র নহে বলিয়াই বিচিত্র ভারতীয় সাধনাতে তাহার একটা বিশেষ স্থান আছে। এই স্থানভ্রষ্ট হইলে ভারতবর্ষকে বাংলার কিছু দিবার থাকিবে না, আর যাহার বিশ্বকে কিছু দেবার থাকে না, সে প্রাচীনের স্মৃতিচিহ্ন রূপে পড়িয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার বাঁচিবার অধিকার থাকে না। বাঙ্গালী যদি বাংলাকে ভুলিয়া যায় তাহা হইলে তাহারও আর

জীবনের উপরে কোনও দাবী থাকিবে না। সে বাঁচিল কি মরিল, ইহাতে কি ভারতের, কি জগতের কিছুই আসিয়া যাইবে না। এই কথাটাই আজ বাঙ্গালীকে সকলের আগে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

(৪)

বাংলা সম্বন্ধে অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে। আধুনিক বাংলাকে ইংরাজই গড়িয়া তুলিয়াছে ইংরাজের ত এ অভিমান আছেই, অনেক শিক্ষিত ভারতবাসীর মনেও এরূপ একটা সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে যে এ সংস্কার নাই, এমন নহে। এ সকল বাঙ্গালী সহসা প্রাচীনের প্রতি অত্যধিক আসক্তিবশতঃ ভারতচন্দ্রের পরে রাজা রামমোহনের সময় হইতে বাংলার যে নূতন সাহিত্য ও সাধনা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে ইংরাজের অনুচিকীর্ষার ফল ভাবিয়া তাহাকে অত্যন্ত হেয় মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহারা কল্পনা করেন যে এই আধুনিক বাংলা সত্যকার বাংলা নহে। সে বাংলা ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সুতরাং, এ বাংলার কথা লইয়া আর অত বাড়াবাড়ি কেন?

কিন্তু বাংলা কি সত্যই ইংরাজী শিখিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে? এই ইংরাজী শিক্ষা'ত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বাংলা না হয় সকলের আগে ইংরাজী সাহিত্য ও য়ুরোপীয় সাধনার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু, ক্রমে সে সাহিত্য ও সাধনা সমগ্র ভারতবাসীর চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। অথচ, একই ইংরাজী শিক্ষার ফলে বাঙ্গালী যেভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে অন্য প্রদেশে ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতবাসী সে ভাবে'ত ফুটিয়া উঠে নাই— এমনটা কেন হইল? এ সমস্যার ত সমাধান করা চাই।

এ প্রশ্নটা তুলিলেই আমরা দেখিতে পাই, আধুনিক বাংলার এই বিশেষত্ব কেবল ইংরাজী শিক্ষার ফলে নহে, কিন্তু বাংলার পুরাতন সাধনা ও মনীষার উপরে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা ও শিক্ষার জ্যোতিঃ পড়িয়া সেই প্রাচীন প্রাণকে অভিনব ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা বাংলায় একটা নূতন যুগ আনিয়াছে, একথা মানিতেই হইবে। কিন্তু বাংলার চরিত্র ও ইতিহাসের অনুসন্ধান করিলে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে এই নূতন যুগেও সেই পুরাতন বাঙ্গালী চরিত্র ও সাধনাই অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র। কেবল রূপের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, মূল বস্তু নষ্ট হয় নাই ; তাহা যেমন ছিল, তেমনই আছে।

সে মূল বস্তুটী স্বাধীনতা। বাংলা চিরদিন—কি সমাজের কি ধর্ম্মের—সকল প্রকারের বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া মুক্তভাবে আপনার সার্থকতার অন্বেষণ করিয়াছে, প্রাচীন শাস্ত্র-মানিয়াও তাহার অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া সেই শাস্ত্র বন্ধনকে সর্ব্বদা শিথিল করিয়া আসিয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুগণ যেকালে পুরাতন স্মৃতির শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়াছিলেন, তখনও স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন নূতন স্মৃতি রচনা করিয়া বাংলার হিন্দু-সমাজকে প্রাচীনের নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতের হিন্দু-সমাজের আর কোথাও এরূপভাবে এত বড় একটা বিপ্লব ঘটিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। ব্যবহার-শাস্ত্র এবং অর্থনীতি সম্বন্ধেও বাংলা প্রাচীনকাল হইতেই আপনার একটা নিজের পথ গড়িয়া তুলিয়াছিল। ইংরাজী একাদশ শতাব্দীর শেষ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, আমাদের দশশততম শকাব্দে ভট্টনারায়ণের বংশধর ব্যবহারবিদ্ ও স্মার্ত্তশিরোমণি জীমূতবাহন বাঙ্গালী হিন্দুর দায়াধিকার নির্ণয় করিয়া দায়ভাগ প্রণয়ন করেন। এই দায়ভাগ কেবল বাংলার হিন্দু-সমাজেই

প্রচলিত, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুগণ মিতাক্ষরার অধীন। মিতাক্ষরাতে ধনীর নিজের ধনের উপরে সম্পূর্ণ স্বাধীন অধিকার নাই। দায়ভাগেতে ধনীকে তাহার মৃত্যুর পরে বা পূর্ব্বে স্বেচ্ছামত নিজের ধন সম্পর্কিত বা অ-সম্পর্কিত যাহাকে ইচ্ছা দান করিবার অধিকার দিয়াছে। এ বিষয়ে কোন প্রকার বাঁধাবাঁধি নাই। জীমূতবাহনই যে ইহা নিজে সৃষ্টি করিলেন, এরূপ কল্পনা করা যায় না। সমাজে যাহা প্রচলিত ছিল, সমাজের গতি ও প্রকৃতি যেদিকে চলিতেছিল, তাহার উপরেই তিনি আপনার নূতন বিধান প্রতিষ্ঠিত করেন। জীমূত-বাহনের চারিশতাধিক বৎসর পরে স্মার্ত্তশিরোমনি রঘুনন্দন দায়তত্ত্ব প্রচার করিয়া জীমূতবাহনের দায়ভাগই কোনও কোনও বিষয়ে নূতন ব্যাখ্যার দ্বারা আরও উদার করিয়া তুলিলেন। মিতাক্ষরা অনুসারে সম্পত্তি সমগ্র পরিবারেতে সমষ্টিভাবে আবদ্ধ থাকে; পরিবারের ভিন্ন লোকেরা পারিবারিক সম্পত্তির নিজ নিজ অংশ পরিবারের অন্যান্য অংশীদারের অনুমতি ব্যতীত হস্তান্তরিত করিতে পারেন না।, দায়ভাগ অনুসারে বাঙ্গালী হিন্দুর এ অধিকার আছে। ইহাতে বাংলার হিন্দু-সমাজে অর্থ-ব্যবহার সম্বন্ধে এমন একটা স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হয়, যাহা মিতক্ষরার অধীন হিন্দু-সমাজে হয় নাই। মেইন সাহেব কহেন যে, বাংলা অতি প্রাচীন কাল হইতে বাণিজ্য-প্রধান দেশ ছিল বলিয়াই মিতাক্ষরার বাঁধাবাঁধি নিয়ম তাহার সহ্য হয় নাই। জীমূত-বাহন কহিয়াছেন যে, শত শাস্ত্রবচনের দ্বারাও বস্তুর পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। ইহাতেই বাংলার মনীষার সনাতন স্বাধীনতা প্রবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

মুসলমান সভ্যতা ও সাধনার প্রভাবে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে অনেক নূতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। নানক, কবীর প্রভৃতি যে সাধনা প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা হিন্দুসাধনার অন্তর্গত হইলেও ঠিক সে

সাধনার ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখে নাই। শিখেরা' ত সম্পূর্ণরূপেই পৃথক হইয়া পড়েন। কিন্তু ঐ যুগেই মহাপ্রভু বাংলা দেশে যে যুগধর্ম্মের প্রচার করেন তাহাতে হিন্দু সাধনাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই এক নূতন প্রাণতার সঞ্চার করিয়া তাহাকে সে যুগের উপযোগী এক নূতন আকার প্রদান করেন। ফলতঃ বাংলার বৌদ্ধযুগের অবসান হইতে বাঙ্গালী ধর্ম্ম-সাধনে, সিদ্ধান্তে, মতবাদে ও সামাজিক আচার-ব্যবহারে এমন একটা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, যাহা ভারতবর্ষের অন্যান্য কোনও হিন্দুসমাজে দেখা যায় না। সাধক এবং সিদ্ধ-পুরুষেরা নূতন নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ সকল সাধনার লোকেরা সমাজের মধ্যে থাকিয়াই আপনাদের অন্তরঙ্গ ধর্ম্মজীবনে প্রাচীন শাস্ত্র কিম্বা আচার-বিচারের বন্ধন মানিয়া চলেন নাই। সমাজও ইঁহাদিগকে এই স্বাধীনতা দিয়া আসিয়াছে। কুলগুরুর সঙ্গে সঙ্গে সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়া স্বাধীন ভাবে ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধনার কথা আর কোথাও শুনি নাই। "লোকের মধ্যে লোকাচার, সদ্‌গুরুর কাছে সদাচার" ইহার অনুরূপ কথা অন্যত্র নাই। আপাততঃ কথাটা কেমন কেমন শোনায় বটে—অনেকে ইহাকে মিথ্যাচারও বলিতে পারেন, কিন্তু ইহার ভিতরে যে স্বাধীনতার প্রেরণা আছে, ইহাতে সমাজের বশ্যতার সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যে একটা সঙ্গতির চেষ্টা রহিয়াছে, একথাও অস্বীকার করা যায় না। বামাচারী তান্ত্রিকদিগের চক্রে কোনও প্রকারের জাতিভেদ মানা হয় না। "প্রবর্ত্তে ভৈরবী চক্রে সর্ব্ববর্ণাঃ দ্বিজোত্তমাঃ" —ভৈরবী চক্রে বসিলে চণ্ডালও শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণের সমান হন; তখন চণ্ডালের মুখের অন্ন ব্রাহ্মণ নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারেন। ইহার মধ্যে কোনও লুকোচুরি ছিল না। অন্যান্য সম্প্রদায়েও সাধন-মণ্ডলীতে জাতিবর্ণের বিচার হয় নাই। ইহা বাংলার বিশেষত্ব

এ সকলের দ্বারা স্বাধীনতা-স্পৃহা বাংলার প্রকৃতির ভিতরে কতটা যে বলবতী, ইহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলায় দক্ষিণের শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত সমগ্র হিন্দুসমাজের কোনও অধিনায়ক ছিলেন না এবং নাই। বাংলায় কুলগুরু আছেন, সদ্‌গুরু আছেন, কিন্তু সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবান ব্যতীত "জগৎগুরু" বলিয়া কোনও মানুষ বা মোহান্ত নাই। বাংলায় ব্রাহ্মণ আদি বর্ণ আছেন। কিন্তু মাদ্রাজ বা দাক্ষিণাত্যের মত ব্রাহ্মণ্য প্রভাব নাই। বাংলায় চণ্ডালেরা মাদ্রাজ বা মহারাষ্ট্রের "পারিয়া"-দিগের মত একান্তভাবে কখনও "অস্পৃশ্য" বলিয়া বিবেচিত হন নাই। পারিয়ারা হিন্দুর দেবমন্দিরের ছায়ার নিকটও যাইতে পারেন না—মন্দিরসংলগ্ন জলাশয় স্পর্শ করিতে পারেন না, মন্দির-পার্শ্ববর্ত্তী পথে বিচরণ করিবার তাঁহাদের অধিকার নাই। বাঙ্গালীর চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গণে বাংলার চণ্ডালেরা পূজার সময় দেবতার ভোগ-আরতিকালে ঢোল বাজাইয়া থাকেন। মাদ্রাজে "দৃষ্টিদোষ" মানা হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের খাদ্যের উপরে অ-ব্রাহ্মণের চক্ষু পড়িলে তাহা অশুচি হইয়া যায়, বাংলায় "দৃষ্টিদোষ" বলিয়া কোনও বস্তু নাই। এইরূপ কি সামাজিক জীবনে, কি ধর্ম্মসাধনে বাংলার সাধনার মধ্যে বৌদ্ধযুগ হইতেই একটা অপূর্ব্ব স্বাধীনতার প্রেরণা জাগিয়া আছে। ইহাই বাংলার প্রধান বিশেষত্ব।

বাংলার সনাতন সাধনার আর একটা বিশেষত্ব—ইহার মানবতা—ইহাকে আর কি বলিব, সহসা ভাবিয়া পাই না। বাংলায় দেব-বাদ আছে সত্য, কিন্তু বাংলায় যেসকল দেবদেবীর পূজা প্রচলিত তাঁহাদের সকলের মধ্যেই একটা অদ্ভুত মানবতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালী, দুর্গা, সরস্বতী, ইঁহাদের কাহারও বা দশ, কাহারও চারি হাত আছে বটে, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এসকল যে অপূর্ব্ব মাতৃ-মূর্ত্তি

ইহা আশ্চর্য্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়। এই অতি-প্রাকৃত হাতগুলি বাদ দিলে ইঁহাদিগকে ম্যাডোনার সঙ্গে তুলনা করা যায়। দুর্গা ও সরস্বতীর মুখের অণুতে অণুতে আমরা যে মাতৃঅঙ্কে লালিত পালিত, সেই সার্ব্বজনীন মানবীয় মাতৃভাব যেন ফাটিয়া পড়ে। দক্ষিণের হিন্দুরা হনুমানের ও গণপতির পূজা করেন। পশ্চিমেতে মহাবীরের আরাধনা বহুলোক-প্রচলিত। কিন্তু বাংলার মূর্ত্তিপূজাতে কেবলমাত্র দুর্গাপ্রতিমার সঙ্গে গণেশের মূর্ত্তি থাকে। জনসাধারণের উপাস্যরূপে আর কোথাও গণপতির পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত নহে, কেবল বাংলার বণিকসম্প্রদায় সিদ্ধিদাতারূপে গণেশের ছবি আপনাদের খাতার শিরোদেশে অঙ্কিত ও গণেশের প্রতিমূর্ত্তি ব্যবসায়-স্থানের দ্বারদেশের উপরে স্থাপন করিয়া থাকেন। এছাড়া বাংলার মূর্ত্তিপূজায় বা প্রচলিত দেবোপাসনায় অতি-প্রাকৃতের বা অতি-মানবতার প্রভাব অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে কম।

তারপর বাংলার অবতারবাদকে আশ্রয় করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র ধর্ম্মের গোড়ার অতি-প্রাকৃতের ও অতি-মানবতার প্রভাব স্বল্প-বিস্তর ক্ষীণ হইয়া মানুষের আরাধ্য দেবতাকে মানবত্বের ভূমিতে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারতবর্ষের পৌরাণিক ধর্ম্মেও অবতারবাদের আশ্রয়ে পরম দেবতা মানব-দেহ ধারণ করিয়া মানবত্বের ভূমিতে আসিয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন। পশ্চিমে এবং দাক্ষিণাত্যে এইরূপে শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা ধর্ম্মকে মানবত্বের ভূমিতে আনিয়াছে। কিন্তু বাংলায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে এই অবতার-বাদ যে অদ্ভুত বিকাশ লাভ করিয়াছে সেরূপ আর ভারতের অন্য কোথাও হয় নাই। ভারতের অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা আছে। কিন্তু এ সকল কৃষ্ণোপাসকেরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলিয়াই জানেন। কেবল বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরাই শ্রীকৃষ্ণকে অবতার রূপে নহে, কিন্তু

"অবতারী" রূপে—অর্থাৎ যাহা হইতে সকল অবতার-প্রবাহ প্রকাশিত হয় সেই পরম পুরুষ শ্রীভগবানরূপে—প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং"—আমরা যে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করি, তিনি—স্বয়ং ভগবান। শ্রীজীবগোস্বামী 'লঘু-ভাগবতামৃতে' স্পষ্ট করিয়াই কহিয়াছেন যে, যদু-সম্ভূত যে শ্রীকৃষ্ণ তিনি অন্য। আমরা যে শ্রীকৃষ্ণের কথা কহি, তিনি এই যদু-সম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ নহেন। যদু-সম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার রাজা ছিলেন, ভারতযুদ্ধে পাণ্ডবদিগের সহায় ছিলেন, কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের রথের সারথী হইয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের যে শ্রীকৃষ্ণ –

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কশ্চিৎ নৈব গচ্ছতি।

—বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কদাপি তিনি অন্যত্র গমন করেন না। এই বৃন্দাবন তাঁহার চিদানন্দময় নিত্য-ধাম। এই শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ বা ষড়ভূজ নহেন—তিনি সর্ব্বদাই দ্বিভূজ। এইরূপ সিদ্ধান্তের দ্বারা বাংলার বৈষ্ণব মহাজনেরা স্বয়ং ভগবানের পরিপূর্ণ মানবত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভগবান নিরাকার নহেন, জড়াকারও নহেন, কিন্তু চিদাকার। তিনি বিদেহী নহেন, অপচয়-উপচয়শীল জড়দেহধারীও নহেন, কিন্তু চিদ্দেহধারী, নিখিল রসামৃত-মূর্ত্তি। তিনি অতীন্দ্রিয় বটেন অর্থাৎ প্রাকৃত মানবীয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না, তাই বলিয়া তিনি নিরীন্দ্রিয় নহেন, কিন্তু চিদিন্দ্রিয়-সম্পন্ন। তিনি নিঃসঙ্গ নহেন, কিন্তু তাঁহার নিত্যলীলা পরিজন ও পরিকার সঙ্গে নিত্যকাল বিরাজিত। এইরূপে বাংলার বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ভগবানের পরিপূর্ণ মানবতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সাধারণ মনুষ্যত্বের ভূমিতে মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে এক নিত্য মাধুর্য্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীভগবানের অনন্তলীলা, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি জীবের সঙ্গে তিনি অনন্তভাবে লীলা করিতেছেন।

কিন্তু

কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার সহায়।

এমন কথা ভারতের অন্যত্র কেন, জগতের আর কোথাও কেহ কহিয়াছেন বলিয়া জানি না। এই সিদ্ধান্ত ও সাধনার বলেই বাংলার কবি চণ্ডীদাস দুনিয়ার মানুষকে ডাকিয়া কহিয়াছেন—

শুন হে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

আধুনিক যুগের কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের কবি ইহারই যেন প্রতিধ্বনি করিয়া গাহিয়াছেন,—

"কি আর বলিব রে, কে করিবে প্রত্যয়
এই মানুষে আছে সত্য, নিত্য চিদানন্দময়।"

অতি সংক্ষেপে এবং সামান্য ভাবেও বাঙ্গালীর চিন্তার ও সাধনার ইতিহাস লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এক দুর্দ্দমনীয় স্বাধীনতার স্পৃহা এবং সাধনের দ্বারা দেবতাকে মানুষ বলিয়া ধরা এবং মানুষের মধ্যে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করা, ইহাই বাঙ্গালীর পুরাগত সাধনার মূল লক্ষণ বলিয়া দেখিতে পাই। এই স্বাধীনতার ভাব ও মানবতার আদর্শ আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়াছিল বলিয়াই ইংরাজ যখন য়ুরোপের এই যুগের নূতন স্বাধীনতার ও নূতন মানবতার সংবাদ লইয়া আমাদের নিকট আসিল, আমাদের সেই লুপ্ত স্মৃতিকে জাগাইয়াই তাহার এই নূতন শিক্ষা আমাদিগকে এমনভাবে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। যদি এই নূতন শিক্ষা আমাদের পুরাতন প্রাণের স্মৃতিকে না জাগাইত, তাহা হইলে কখনও আমরা ইহাকে এমন করিয়া প্রাণ দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিতাম না। একই ইংরাজী শিক্ষা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া বাংলায় যেভাবে

ফলিত হইয়া উঠিয়াছিল, অন্যত্র যে সেভাবে হয় নাই, ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল বাংলার পুরাগত সাধনার বৈশিষ্ট্য। বাহিরে নূতন হইলেও এই শিক্ষার মূলমন্ত্র আমাদের নিকট নূতন ছিল না বলিয়াই প্রাক্তনজন্য বিদ্যার মত ইহা আমাদের মধ্যে এমন অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

এই গোড়ার কথাটা না জানিলে ও ভাল করিয়া ধরিতে না পারিলে বাংলার নবযুগের কথা বলাও বৃথা, শোনাও নিস্ফল।

দ্বিতীয় কথা

যুগ-প্রবর্ত্তক রামমোহন

রাজা রামমোহন হইতেই বাংলার নবযুগের সূচনা, অনেকে একথা কহিয়া থাকেন। কথাটা সত্য বলিয়া মনে হয়। রাজাই প্রথমে বাংলার সনাতন স্বাধীনতা-প্রবৃত্তি ও মানবতাকে বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চাহেন। জীব যেমন জাগে ও ঘুমায়, সমাজও সেইরূপ এক একবার জাগিয়া উঠিয়া আপনার লক্ষ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়, আবার সেই লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়া যেন ঘুমাইয়া পড়ে। নিদ্রাটা তমোগুণের প্রাবল্য হেতু আমাদিগকে আসিয়া আচ্ছন্ন করে। কোন জাতি যখন ঘুমাইয়া পড়ে তখন এই তমোগুণের দ্বারাই সে একান্ত অভিভূত হয়। আলস্য, অজ্ঞানতা, এ সকলই তমের লক্ষণ। তম-অভিভূত হইলে সমাজ যাহা চলিয়া আসিয়াছে তাহাতেই গা' ঢালিয়া দেয়। ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম উভয়েই তখন প্রাচীন নেমি-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া একান্ত গতানুগতিক হইয়া পড়ে। শাস্ত্রাদির প্রামাণ্য তখন বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। যেখানে জিজ্ঞাসাই জাগে না সেখানে বিচারের অবসর কৈ? আমাদের সমাজও রাজা রামমোহনের সময়ে এই দশাই প্রাপ্ত হইয়াছিল। অধিকাংশ লোকে ধর্ম্মটাকে অন্তরের অনুভবের উপরে গড়িয়া না তুলিয়া বাহিরের আচার বিচার দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। হিন্দুর প্রামাণ্য শাস্ত্র যে বেদ, পণ্ডিতেরা এবং জনসাধারণ মুখে ইহা মানিতেন, কিন্তু বেদের অধ্যয়ন দেশে লোপ পাইয়া গিয়াছিল; স্মৃতি এবং পুরাণই ধর্ম্মের প্রামাণ্য-শাস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এই সকল স্মৃতি

ও পুরাণের মধ্যে অনেক পরস্পর বিরোধী কথা আছে। এই সকল বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়া পুরাণের ও স্মৃতির মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন ও মর্য্যাদা রক্ষা করার চেষ্টা কেহ করিতেন না, নিজেদের সুবিধামত শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিতেন মাত্র। রাজা রামমোহনের সঙ্গে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিচার হয় তাহা পড়িতে পড়িতে দেশের সেকালের লোক-চিন্তার ও লোক-প্রবৃত্তির এই ছবিটাই চক্ষের উপরে পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়া উঠে।

এই অবস্থায় রাজা রামমোহন বাংলার সেই চির-প্রাচীন এবং চিরপরিচিত, কিন্তু সম্প্রতি বিস্মৃত, স্বাধীনতা ও মানবতার মন্ত্র জপিতে জপিতে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাজার এই চৈতন্য ইংরাজী শিক্ষার প্রেরণায় জাগে নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সঙ্গে বিচারে, কিম্বা তিনি যে বেদান্ত শাস্ত্রের প্রচার করেন তাহার ভূমিকায়, অথবা অন্যান্য ধর্ম্ম পুস্তিকায় এমন কি তাঁহার সামাজিক আলোচনাতেও ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ সকল ক্ষেত্রে রাজা সর্ব্বত্রই স্ব-জাতির পুরাগত শাস্ত্র-প্রামাণ্যের উপরেই আপনার সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগকে এই পথ দেখাইয়া দেয় নাই।

যে ইংরাজী শিক্ষা এদেশে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় তাহার উপরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের ফরাশী যুক্তিবাদের ছাপ পড়িয়াছিল। এই শিক্ষা যুক্তিকেই বস্তু-জ্ঞানের ও সত্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র পন্থা বলিয়া আমাদের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করে। আমাদের প্রথম যুগের ইংরাজী-নবীশেরা প্রায় সকলেই এই যুক্তিবাদের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজা এরূপ যুক্তিবাদ অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু যুক্তি এবং শাস্ত্রের পরস্পরের বিরোধ মিটাইয়া যুক্তি দ্বারা শাস্ত্রার্থকে নিষ্কাশিত ও শাস্ত্র দ্বারা যুক্তিকে সুদৃঢ় করিয়া, যুক্তি এবং শাস্ত্র উভয়ের

সমন্বয়ের উপরে আপনার সিদ্ধান্ত ও মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন।

শাস্ত্র ত কথা; কথা ত বস্তুর অর্থাৎ যাহা আছে বা হইয়াছে তাহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র; যাহা আছে বা হইয়াছে তাহা আছে কি নাই, হইয়াছিল কি না, ইহার প্রমাণ মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভব। সুতরাং শাস্ত্রীয় কথার প্রামাণ্য প্রকৃতপক্ষে সে নিজে নয়, কিন্তু সাধকের অনুভূতি। যতক্ষণ না শাস্ত্রোপদেশ সাধকের অনুভূতিতে প্রত্যক্ষ হইয়া ফুটিয়া উঠে ততক্ষণ তাহার সত্য এবং প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না, ততক্ষণ শাস্ত্র অজ্ঞাত-অর্থ-ধ্বনির মত পড়িয়া থাকে। যাজ্ঞিকেরা কর্ম্মকাণ্ডে শাস্ত্রের প্রামাণ্য এইরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে জ্ঞান-সাধনার মূল ভিত্তি নষ্ট হইয়া যায়। যতক্ষণ না বস্তুর অনুভব হয় ততক্ষণ তাহা জ্ঞানেতে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় না। কারণ "অনুভূতি পর্য্যন্তম্ জ্ঞানম্"—অনুভূতিতে যাহা শেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহাই জ্ঞান। এই জন্যই জ্ঞানকাণ্ডের পথ—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। কেবল শ্রবণ নহে, শাস্ত্রের শব্দ শুনিলেই জ্ঞান জন্মে না। শ্রবণের পরে মনন চাই। মনন অর্থ, বিচারপূর্ব্বক শ্রুত শাস্ত্রের বা উপদেশের অর্থের ধারণা লাভ করা। এখানেই জ্ঞান-সাধনে বিচারের প্রতিষ্ঠা হইল। বিচারের বাহন যুক্তি। সুতরাং জ্ঞানের পথে যে চলিবে সে যুক্তি ছাড়িয়া এক পা'ও অগ্রসর হইতে পারে না। এই বিচারের লক্ষ্য, শাস্ত্রে যাহা শোনা গেল, অনুভবেতে তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করা।

রাজা এই প্রাচীন পথ ধরিয়াই শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয় সাধন করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্ম্মকে তাহার অনুভবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। রাজার যুক্তিবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ূরোপীয় যুক্তিবাদের অনুকরণে গড়িয়া উঠে নাই। রাজা আমাদের প্রাচীন মীমাংসার পথ ধরিয়া য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর এই যুক্তিবাদের অপূর্ণতা ও

অসম্যক দৃষ্টি নষ্ট করিতেই চাহিয়াছিলেন। রাজার বিচার-পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তাদি একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই, আধুনিক ইংরাজী শিক্ষা যে তাঁহাকে সংস্কার-ব্রতে উদ্বুদ্ধ করে নাই, ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলতঃ, ইংরাজী বর্ণমালার প্রথম অক্ষরের জ্ঞানলাভ করিবার পূর্ব্বেই রামমোহন আপনার জীবন-ব্রত গ্রহণ করেন।

তাঁহার জীবনের প্রথম প্রেরণা আসে মুসলমান যুক্তিবাদী মোতাজোলা সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি পড়িয়া। রামমোহন তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক মাত্র বলিলেও হয়। পাটনায় পারসী ও আরবী পড়িতে যাইয়া মুসলমান সাধনার সংস্পর্শে তাঁহার অন্তরে দেশের প্রচলিত দেব-বাদ ও প্রতিমা-পূজার বিরোধী ভাবের সঞ্চার হয়। 'তুফাতুলমহাউদ্দীন' নামক পুস্তিকায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পাটনা হইতে রাজা সংস্কৃত পড়িবার জন্য কাশীতে যান। এইখানেই উপনিষদ্ ও মীমাংসা শাস্ত্রের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ইহার বহুদিন পরে রাজা ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন। রাজা বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার একজন আদি প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু তখনও য়ুরোপীয় সাধনার পূর্ণজ্যোতিঃ এদেশে ফুটিতে আরম্ভ করে নাই। রাজার অলোকসামান্য মনীষা তাহার কতকটা আভাস পাইয়াছিল সত্য। লর্ড আমহার্ষ্টকে তিনি যে পত্র লেখেন তাহাতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই রাজা নূতন করিয়া বাংলাদেশে আমাদিগের পুরাতন স্বাধীনতা ও মানবতার দুন্দুভিনাদ করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল তলাইয়া দেখিলে রামমোহন যে যুগের প্রবর্ত্তনা করেন, তাহাকে কিছুতেই ইংরাজ যুগ বা ফেরঙ্গ যুগ বলা যায় না। যে সূত্র অবলম্বনে রাজা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের জঞ্জাল কাটিতে আরম্ভ করেন সেই সূত্র অবলম্বনেই শ্রীরামপুরের পাদরীদের সঙ্গে বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে তাঁহার 'Three Appeals'

to the Christian Public' গ্রন্থে প্রচলিত খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মেরও জঞ্জাল কাটিতে চেষ্টা করেন। এদিকে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং অন্যদিকে প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক পাদরী —এই উভয় দলের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া রাজা সত্য প্রতিষ্ঠার ও শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ের যে সকল মূল সূত্র স্থাপন করেন তাহাতে কেবলই যে তাঁহার অলৌকিক মৌলিকতাই প্রমাণিত হয় তাহা নহে, কিন্তু রাজা ভারতের প্রাচীন সাধনা ও অভিজ্ঞতার উপরে দাঁড়াইয়াই যে এই সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ইহাও প্রতিষ্ঠিত হয়। যাঁহারা এ সকল তলাইয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা কিছুতেই রাজা রামমোহনকে পরবর্ত্তী ইংরাজী-নবীশ বাঙ্গালীদিগের মতন বিদেশীয়ের অনুকরণশীল, বিদেশী প্রভাবের দ্বারা অভিভূত, আপনার স্বদেশের সনাতন প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের জ্ঞানশূন্য, মামুলী ধর্ম্ম বা সমাজ সংস্কারক বলিতে পারেন না। রাজা বর্ত্তমান যুগের যুগসন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং একদিকে প্রাচীনের সূত্র দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া, অন্যদিকে নিজের স্বজাতির সাধনার সনাতন কষ্টিপাথরে য়ুরোপের আগন্তুক সাধনাকে কষিয়া, উভয়ের সম্মিলন ও সমন্বয়ের উপরে এদেশে বর্ত্তমান নূতন যুগের, নূতন সাধনার গোড়াপত্তন করিয়া যান। এই জন্যই রাজা রামমোহনকে বাংলার নবযুগের প্রবর্ত্তক বলিতেছি।

(২)

যে বেদ শাস্ত্রের উপরে হিন্দু আপনার ধর্ম্মের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করে সেই বেদই যে জগতের সনাতন সত্যকে মানবের অনুভব-সাপেক্ষ করিয়াছে, ইহা দেখাইবার জন্যই, মনে হয়, রাজা রামমোহন উপনিষদ্ ও বেদান্ত-সূত্রের প্রচার করিয়াছিলেন। রাজা ঈশ,

কেন, কঠ, মণ্ডুক, ও মাণ্ডুক্য—এই পাঁচখানি উপনিষদের মূল ও বাংলা অনুবাদ প্রচার করেন। আর এই ক'খানি উপনিষদেই মোটের উপরে বিশ্বের পরমতত্ত্ব ব্রহ্মবস্তুকে সাধারণ মানবের সাধারণ অনুভবের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; শাস্ত্র প্রমাণ্যের উপরে করে নাই। অন্য পক্ষে 'কেন' উপনিষদ্ সুস্পষ্ট ভাষায় বেদাদি শাস্ত্রকে নিকৃষ্ট বিদ্যা এবং যাহা দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় তাহাকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়াছেন। সুতরাং তত্ত্ববস্তুর প্রামাণ্য বেদ নহে, কিন্তু তাহা, যাহা দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়। ব্রহ্মকে জানা যায় দুই উপায়ে,—এক, জগৎকার্য্য দেখিয়া; অপর, সমাধি-যোগে। সৃষ্টি আলোচনা করিয়া ব্রহ্মকে জগৎরূপ কার্য্যের কর্ত্তারূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণের পক্ষে ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশস্ত পথ। বেদান্ত-সূত্র এই পথই প্রথমে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" জগতের জন্ম, স্থিতি এবং লয় যাহা হইতে তাহাই ব্রহ্ম,—বেদান্ত এই বলিয়াই ব্রহ্ম-মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উপনিষদ্ কহিয়াছেন যে সাধকের ইন্দ্রিয়গ্রাম, মন এবং বুদ্ধি ইহাই ব্রহ্ম-সাধনের পথ। ভৃগু-বারুণী সংবাদে এই পথই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আমাদের ইন্দ্রিয়-সকলের দ্বারা আমরা সর্ব্বদাই ইহা দেখি যে যাহা ছিল না, তাহা হইল, যাহা হইল তাহা রহিল, আর যাহা রহিল তাহাও ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। এই তিন অবস্থাকেই বেদান্ত জন্মাদি কহিয়াছেন। এই যে সার্ব্বজনীন অভিজ্ঞতা, মন এবং বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ইহার বিশ্লেষণ করিতে করিতেই বরুণপুত্র ভৃগু ক্রমে ব্রহ্ম-তত্ত্বে উপনীত হন।

একটু ভাবিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে ভৃগু-বারুণী সংবাদে উপনিষদ্ ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের যে প্রশস্ত পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন সে পথে, ভারতের প্রাচীন ব্রহ্ম-তত্ত্বের সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার জড়-

বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের আশ্চর্য মিল হইয়াছে। বরুণ-পুত্র ভৃগু ব্রহ্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সে বস্তু কি, যাহা হইতে জগতের জন্ম আদি হইতেছে, তপস্যা দ্বারা তাহার সন্ধান করিতে যাইয়া সর্ব্ব প্রথমে অন্নই ব্রহ্ম, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এই অন্নের সত্য অর্থাৎ অনুভবপ্রতিষ্ঠ অর্থ কেবল প্রাকৃত অন্ন বা খাদ্য নহে, কিন্তু এই বিশ্বের প্রত্যক্ষ জড় উপাদানসমূহ। সূক্ষ্ম জড় হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি, এই জড়ের দ্বারাই বিশ্বের স্থিতি, এই সূক্ষ্ম জড়েতেই বিশ্বের পরিণতি বা লয়, অন্ন-ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তের ইহাই নিগূঢ় মর্ম্ম। এই সিদ্ধান্ত জড়-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। আমাদিগকে বর্ত্তমানে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের জন্য প্রথমে বরুণ-পুত্র ভৃগুর ন্যায় এই জড়-বিজ্ঞানের পথই অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদিগের ইন্দ্রিয়সকল জড়কে গ্রহণ করে, জড়েতেই সঞ্চরণ করে, জড়কে পাইয়া আনন্দ উপভোগ করে। এই জড়-জগৎ একান্ত মিথ্যা নহে। এই জড়-জগতেই আমরা ব্রহ্মকে বিশ্বের অনাদি-আদি কারণরূপে, আদ্যাশক্তি-রূপে, জগদম্বা-রূপে, কারণজলে ভাসমান ব্রহ্মাণ্ডের মূল অণ্ডরূপে, প্রত্যক্ষ করি। এই কারণব্রহ্মই ব্রহ্ম-জ্ঞানের প্রথম বনিয়াদ। অন্ন-ব্রহ্মকে প্রথমে না জানিয়া প্রকৃতপক্ষে একেবারে বিজ্ঞান-ব্রহ্মকে জানা যায় না।

কিন্তু ভৃগু যেমন এই সিদ্ধান্তের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিয়া পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রাণ, যাহার দ্বারাই অন্নের সার্থকতা সম্পাদিত হয়, সেই প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমাদিগকেও সেইরূপ জড়-বিজ্ঞানের ভূমি হইতে উঠিয়া জীব-বিজ্ঞানের ভূমিতে ব্রহ্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হইবে। ভৃগু প্রাণ-ব্রহ্মের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিয়া, ক্রমে যে মনেতে প্রাণের প্রামাণ্য, সেই মনকে ব্রহ্ম বলিয়া ধরেন। এ পথ মনোবিজ্ঞানের পথ। কিন্তু মন এবং তাহার অধীন জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল প্রকৃতপক্ষে

বস্তুর খণ্ড জ্ঞানই লাভ করে, সমগ্র বস্তুকে যুগপৎ গ্রহণ করিয়া তাহার একত্ব ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। এই একত্ব অনুভব করা মনের অধিকারের বাহিরে। যে বৃত্তি-দ্বারা আমরা মন এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত খণ্ড খণ্ড জ্ঞানকে অখণ্ড বস্তু রূপে গাঁথিয়া তুলি, তাহার নাম বিজ্ঞান। ভৃগু মনই ব্রহ্ম, এই সিদ্ধান্তের অপূর্ণতা উপলব্ধি করিয়া, ক্রমে বিজ্ঞানই ব্রহ্ম, ইহা জানিয়াছিলেন। কিন্তু এখানেই বিশ্ব-সমস্যার শেষ মীমাংসা হইল না। এই বিজ্ঞানের দ্বারা আমাদিগের অভিজ্ঞতার সকল প্রকোষ্ঠই খুলিতে পারি, কেবল একটি মাত্র প্রকোষ্ঠ বিজ্ঞানের চাবি দিয়া খোলা যায় না। সেই প্রকোষ্ঠটি আনন্দের প্রকোষ্ঠ। এইরূপে পরিণামে জড় হইতে আরম্ভ করিয়া ধাপে ধাপে ভৃগু ব্রহ্মানন্দের যে অভিজ্ঞতা, তাহাতে যাইয়া পৌঁছিয়াছিলেন। ভৃগু-বারুণী সংবাদের ব্রহ্ম-সাধনের সঙ্কেতটী ভাল করিয়া ধরিতে পারিলে এখানে আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার সঙ্গে ভারতের সনাতন ব্রহ্ম-সাধনার অদ্ভূত সম্মিলন ও সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। ভৃগুর অন্ন-ব্রহ্ম আধুনিক য়ুরোপের physico-chemical group of the sciences-এর চরম সিদ্ধান্ত মাত্র। এই সংবাদের প্রাণ-ব্রহ্ম য়ূরোপের biological group of the sciencesএর চরম সিদ্ধান্তের নামান্তর মাত্র। সেইরূপ ভৃগুর মনো-ব্রহ্ম আধুনিক psychological group of the sciences-এর শেষ সিদ্ধান্তের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ভৃগুর বিজ্ঞান-ব্রহ্ম এবং আনন্দ-ব্রহ্ম আধুনিক সাধনার philosophy এবং art-এর চরম সিদ্ধান্তেরই নামান্তর মাত্র। রাজা এসকল কথা কোথাও খুলিয়া বলিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। কিন্তু একদিকে তাঁর বেদান্ত-শাস্ত্র প্রচার এবং অন্যদিকে এদেশে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদির শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা এ দুয়ের মধ্যে সঙ্গতি ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে, এই সূত্রের

আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তিনি বারংবার কহিয়াছেন, "ব্রহ্মকে জগতের কর্ত্তা-রূপে ভজনা কর, কার্য্য দেখিয়া কর্ত্তা মান।" তলাইয়া দেখিলে ইহাই ভৃগু-বারুণী সংবাদের প্রথম শিক্ষা। বিশ্বের প্রকৃতি অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই জগৎ-কার্য্যের সম্যক্ জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। আর বিশ্বপ্রকৃতির অনুসন্ধান করিতে গেলেই জড়-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানাদির পরীক্ষিত পথের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই পথে প্রাচীন ভারতের ও আধুনিক য়ুরোপের সাধনার মিলন সহজ ও অবশ্যম্ভাবী। রাজার জীবনের সমগ্র চেষ্টা এই লক্ষ্য ধরিয়াই চলিয়াছিল। ভারতের মধ্যযুগের ঐকান্তিক অন্তর্মুখী ব্রহ্ম-সাধনকে মানুষের দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে জুড়িয়া রাজা সত্যোপেত ও বস্তু-তন্ত্র করিতে চাহিয়াছিলেন।

উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বে কোনও অতিপ্রাকৃতের কথা নাই, কোনও অলৌকিক ব্যাপার নাই, কোনও প্রকারের অনুভূতির অনধিগম্য শাস্ত্র-প্রামাণ্যের উল্লেখ নাই। যাহা হইতে এই সকল ভূতগ্রাম উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যাহা দ্বারা এই সকল ভূতগ্রাম জীবিত থাকিতেছে, যাহার প্রতি এই সকল ভূতগ্রাম গমন করিতেছে ও অন্তিমে যাহাতে প্রবেশ করিতেছে—তাহাই ব্রহ্ম, বেদান্তের "জন্মাদ্যস্য" সূত্র এই শ্রুতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রাজার উপনিষদ্ ও বেদান্ত-প্রচারের মূল লক্ষ্যটি এখানেই ধরা পড়ে। এই ব্রহ্মই হিন্দুর সাধনায় জীবের একমাত্র সাধ্য। এই ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে জীব কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারে না। দেবতারা পর্য্যন্ত এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য লালায়িত, ব্রহ্মের নিকটে তাঁহারাও মুক্তিকামী হইয়া ব্রহ্মের ভজনা করেন। শাস্ত্র-প্রমাণে এ সকল কথা দেখাইয়া রাজা বাংলার ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল নির্ব্বিশেষে সকল হিন্দুকে ডাকিয়া এই ব্রহ্মসাধনার পথ নির্দ্দেশ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে বেদাদি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র সংস্কৃতেতেই আবদ্ধ

ছিল। সুতরাং অতিশয় পণ্ডিত লোক ব্যতীত আর কেহই,—কি ব্রাহ্মণ কি অন্য জাতি—এই শাস্ত্রের সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ করিতে পারিতেন না। কিন্তু মুক্তি ত কেবল পণ্ডিতেরই সাধ্য নহে, জীবমাত্রেরই সাধ্য। মুক্তি-সাধনের অধিকার যেমন ব্রাহ্মণের সেইরূপ চণ্ডালের, যেমন বিদ্বানের সেইরূপ অজ্ঞ জনের। মোক্ষ-প্রতিপাদক শাস্ত্রগুলিকে অতিশয় কঠিন যে সংস্কৃত ভাষা তাহার আবরণ দিয়া বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখিলে চলিবে কেন? সকল শাস্ত্র যাহাতে সকল লোকে পড়িতে ও বুঝিতে পারে, তাহার জন্যই রাজা এসকলের বাংলা অনুবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই ভাবে বাংলার হিন্দু সাধারণের স্বাধীন চিন্তা জাগাইয়া যাহাতে তাহারা বুঝিয়া শুনিয়া বিচারপূর্ব্বক শাস্ত্রের অর্থ ধারণা করিয়া ধর্ম্মসাধনে সমর্থ হয়, তিনি তাহার পথ প্রশস্ত করিয়া দেন।

ইহা কেবল ধর্ম্মসংস্কার নহে। কিন্তু উপনিষদাদির বাংলা অনুবাদ প্রচার করিয়া রাজা বাংলাদেশে বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজে এক অভিনব চিন্তার খাত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আবার নূতন করিয়া ভগীরথের মতন বাঙ্গালীর মুক্তি-কামনায় এক অভিনব গঙ্গা ডাকিয়া আনিলেন। আমরা আজ বাংলার হিন্দু সমাজ চিন্তা ও সাধনায় যে এক নূতন প্রাণতা ও সমন্বয় চেষ্টা দেখিতেছি তাহার মূল নির্ঝর রাজা রামমোহনের শাস্ত্র-প্রচারে।

(৩)

রাজা কেবল স্বদেশবাসীগণের চিত্ত ও চিন্তাকে অন্ধ শাস্ত্রানুগত্যের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। যেখানে বন্ধন সেখানেই তাঁহার শাণিত খড়্গ গিয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুকে স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হইলে সকলের আগে তাহার ধর্ম্মকে স্বাধীন করিতে হয়। ধর্ম্মের এই স্বাধীনতা একভাবে এদেশে

চিরদিনই ছিল। অর্থাৎ ব্যক্তিগত মতবাদ বা সিদ্ধান্ত বা সাধনার উপরে সমাজ কখনও হস্তক্ষেপ করে নাই, কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাসে ও ধর্ম্ম-সাধনে মানুষ যে পরিমাণে স্বাধীনতা পাইয়াছিল সেই পরিমাণেই সমাজ আচারের ও কর্ম্মের বন্ধনে তাহাকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল।

যদি যোগী ত্রিকালজ্ঞ সমুদ্রলঙ্ঘনক্ষমঃ।
তথাপি লৌকিকাচারঃ মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ ॥

যদি যোগী ত্রিকালজ্ঞ এবং যোগবলে সমুদ্রলঙ্ঘনক্ষমও হয়েন তথাপি চিন্তাতেও তিনি লৌকিকাচারকে লঙ্ঘন করিবেন না। এই লৌকিকা-চারই ধর্ম্মের শাসন-দণ্ড হাতে লইয়া মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়া-ছিল। শাস্ত্র ও উচ্চতর সাধনের কথা কেই বা জানিত! যদি ক্বচিৎ কেহ জানিতেন, তাহা জনমণ্ডলীকে জানাইবার চেষ্টা করিতেন না। সমাজের এই অবস্থায় রাজা এক দিকে যেমন ব্রহ্মজ্ঞান ও মুক্তি-সাধনাকে জনসাধারণের অনুভূতির উপরে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন সেইরূপ অন্যদিকে তাহাদের আচার ব্যবহারকেও প্রচলিত সংস্কারের ও রীতিনীতির বন্ধন হইতে অনেকটা মুক্ত করিয়া দেন; এবং যেমন ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে সেইরূপ এসকল ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের বাহিরের কার্য্যেও তিনি একান্তভাবে য়ুরোপীয়-দিগের মতন কেবলমাত্র যুক্তির পথ ধরিয়া চলেন নাই, কিন্তু শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়কে মিলাইয়া সমাজ-সংস্কার ব্রতে ব্রতী হয়েন।

রাজা দেশ-প্রচলিত "ছোৎমার্গের" পক্ষপাতী ছিলেন না, ইহাকে নষ্ট করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রানুমোদিত পন্থা পরিত্যাগ করেন নাই। রাজা কহিয়াছেন—ব্রহ্মজ্ঞান যে সাধনা করিবে তাহার আবার শুচি অশুচি কি? যে সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি সাধন করিবে সে বাহিরের পবিত্রতা বা অপবিত্রতার বিচার করিবে

কেন ? মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের পঞ্চম উল্লাসের ব্রহ্মসাধনের বিধানে এই ছোৎমার্গের নামগন্ধও নাই। স্নাত হউক বা অস্নাতই হউক, শুচিই বা অশুচিই হউক, সকল অবস্থাতেই পরব্রহ্মের উপাসনা প্রশস্ত। এইরূপে তিনি দেশবাসীর আচারকেও প্রাচান সংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করেন।

(৪)

তারপর আরও খোলাখুলিভাবে রাজা মানুষের মানুষ বলিয়াই যে একটা অধিকার আছে, ধর্ম্ম-সাধনের বা সমাজ-শাসনের অজু-হাতে কিছুতেই যে এই অধিকারকে নষ্ট করিতে পারা যায় না, এই মহা সত্য নানাভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই সত্যের প্রেরণাতেই রাজা সতীদাহ নিবারণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। হিন্দু স্ত্রীলোকের দায়াধিকার সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ প্রচার করেন তাহাতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিলাতে গিয়া পার্লা-মেণ্টের ভারত শাসন সম্বন্ধীয় কমিটির নিকট তিনি যে সাক্ষ্য প্রদান করেন তাহার ভিতরেও তাঁর এই মানবতার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা ভারতের প্রত্যেক কৃষক যাহাতে তাহার নিজের চাষের জমির উপরে সম্পূর্ণ সত্বাধিকার প্রাপ্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পার্লামেণ্টকে অনুরোধ করেন। রাজার বিলাত প্রবাসকালে আরনল্ড নামে একজন ইংরাজ তাঁহার সেক্রেটারী ছিলেন। আর-নল্ডের কথায় জানা যায় যে রাজা চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে বৃটিশের আধিপত্য থাকিবে, এইরূপ মনে করিতেন। এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের লোকেরা সম্পূর্ণরূপে য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলাদি শিক্ষা করিয়া দেশের শাসন নিজেদের হাতে গ্রহণ করিতে পারিবে। ভারতবর্ষের লোকেরা চিরদিন বা সুদূর অনির্দ্দিষ্টকাল

পর্য্যন্ত বিদেশীদের শাসনাধীনে বাস করিবে, এ চিন্তা রাজার পক্ষে অসম্ভব ছিল। অন্যদিকে তিনি ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলাকুশলাদি সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিতে না পারিলে বর্ত্তমান সময়ে কোনও জাতি দুনিয়ার মাঝখানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না। এই জন্য ইংরাজ শাসনের সাময়িক প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা তিনি স্বীকার করিতেন। এই জন্যই ইংরাজ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতের রাজদণ্ড ধারণ করিয়া থাকুক, ইহাতে রাজার আপত্তি ছিল না। কিন্তু এতবড় একটা প্রাচীন জাতি এরূপ একটা সার্ব্বজনীন ও উদার সভ্যতা ও সাধনার অধিকারী হইয়া জগতের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে আত্ম-প্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না, এমন দুর্ঘটনা রাজার কল্পনাতেও স্থান পায় নাই। এই দিক দিয়া দেখিলে রাজা রামমোহনকে আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেরও প্রবর্ত্তকরূপে প্রত্যক্ষ করি। ফলতঃ যে সকল শাসনসংস্কারের কথা বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া আমরা কহিয়া আসিতেছি তাহার প্রায় সকলগুলির আলোচনাই রাজা রামমোহন প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে করিয়া গিয়াছেন।

(৫)

যেমন ধর্ম্মে ও সমাজ-সংস্কারে সেইরূপ রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও রাজা কেবল ভেদ বিবোধকেই জাগাইয়া তুলেন নাই, কিন্তু পরস্পরবিরোধী মতের, শক্তির বা স্বার্থের একটা সমন্বয়ের পথ আবিষ্কার করিতে গিয়াছেন। বৃটিশ শাসনের সাময়িক প্রয়োজন ও উপকারিতা স্বীকার করিয়া ইংরাজ ভারতবর্ষে যে স্বার্থের জাল পাতিয়া-ছিল, বিশ্বমানবের কল্যাণের মুখ চাহিয়া তাহাকে একদিন সেই

জাল গুটাইতে হইবে এবং সেই বৃহত্তর স্বার্থের ভূমিতে ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের ক্ষুদ্রতর স্বার্থের সমন্বয় সাধিত হইবে, ইহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই রাজা স্বদেশের এবং জগতের কল্যাণ কামনায় এই শাসনের ভ্রম, ত্রুটি, অভাব এবং অভিযোগ যাহাতে দূর হইতে পারে পার্লামেণ্টের কমিটিকে সেই পথ দেখাইয়াছিলেন। রাজা সংগ্রামে পরান্মুখ ছিলেন না। হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে এবং খৃষ্টিয়ান পাদরীদিগের সঙ্গে একাকী তিনি কি অদম্য উৎসাহে ও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কতদিন ধরিয়া যে আত্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাঁহার গ্রন্থাবলীতে ইহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাধীনতার আকাঙ্খা যার প্রাণে বলবতী সে সংগ্রাম-বিমুখ হইতে পারে না ; মানুষের উপর মানুষ অযথা আধিপত্য করুক, রাজা ইহা সহিতে পারিতেন না। ইংরাজ পার্লামেণ্টে যখন ১৮৩২ খৃস্টাব্দে রিফর্ম্ম (Reform) বিলের আলোচনা হয়, রাজা তখন বিলাতে। সে সময় তিনি তাঁহার ইংরাজ বন্ধুদিগকে বলিয়াছিলেন যে পার্লামেণ্ট যদি এই পাণ্ডুলিপি অগ্রাহ্য করে তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ইংলণ্ডে বাস করা অসাধ্য হইবে।

(৬)

রাজার এই মানবতা তাঁহার রক্তের মধ্যে ছিল। সকল বাঙ্গালীর রক্তের মধ্যেই ইহা আছে। ভাগ্যবানের মধ্যে ফুটিয়া উঠে, অন্যে এই দেবদুর্লভ বস্তুকে অজ্ঞাতসারে নিজের প্রকৃতির ভিতরে লুকাইয়া রাখে। রাজার অন্তর্নিহিত এই উদার মানবতার আদর্শ উপনিষদের শিক্ষা ও ব্রহ্মজ্ঞান সাধনার দ্বারা আশ্চর্য্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। যে আত্মাতে সকলকে দেখে ও সকলের মধ্যে আত্মাকে দেখে, সে কি জাতি ধর্ম্মের বিচার করিয়া মানুষে মানুষে

কোনও কৃত্রিম ভেদের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে? রাজা তাঁহার গ্রন্থে ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনার একটা অপূর্ব্ব শ্লোক তুলিয়া জীবের শিবত্ব প্রচার করিয়াছেন। সন্ধ্যাবন্দনার সময় প্রত্যেক ব্রাহ্মণ কহেন :—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মাস্মি ন চ শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥

আমিই দেবতা, অন্য কেহ নহি; আমিই ব্রহ্ম, শোকের ভোক্তা নহি; আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিত্যমুক্ত স্বভাবসম্পন্ন।

ইহাই মানবের মূল প্রকৃতি। এই প্রকৃতির ভূমিতেই জীব ও শিব এক। সেখানে মানুষ—তার জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, দেশ, যাই হউক না কেন—সেই যে শিবস্বরূপ, কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ আপনাকে আপনি জানেনা বলিয়া এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ মানুষ দুঃখে ম্রিয়মান, শোকে মুহ্যমান, পাপে তাপে নিয়ত জর্জ্জরিত এবং আপনাকে বদ্ধ ভাবিয়া কল্পিতবন্ধনে পড়িয়া হাহাকার করে। এই জীবের শিবস্বরূপের সাক্ষাৎকার যে সাধক ঈষৎ পরিমাণে লাভ করিয়াছেন, তিনি যেখানে মানুষের মধ্যে আনন্দ ধারা প্রবাহিত সেখানেই অকুতোভয়ে আপনাকে ডুবাইয়া দেন, যেখানে মানুষের জ্ঞান চেষ্টা প্রকাশিত সেখানেই উৎফুল্ল হইয়া উঠেন, যেখানেই মানুষ আপনার জীবনের বহিরঙ্গে নিজের নিত্যসিদ্ধ মুক্তস্বভাব বা স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করে সেখানেই তিনি নিজের আরাধ্য দেবতার প্রকাশ দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হয়েন।

রাজা রামমোহনের মধ্যে ইহার অনেকটা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইংরাজের ভোগবিলাস তাঁহাকে বিরক্ত করে নাই, কিন্তু সেই ভোগ-বিলাসের মধ্যে তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ যে আত্মা তাহার আনন্দ উপলব্ধির বহিঃচেষ্টা দেখিয়া সম্পূর্ণভাবে এ সকল ভোগ বিলাসে যোগদান করিতেন। আর, ঠিক সেই হেতুতেই রাজা বিলাত যাইবার

সমুদ্রপথে ফরাসী জাহাজের দেখা পাইয়া ফরাসী গণতন্ত্রের পতাকাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন।

রাজার এই মানবতার আদর্শকে ঠিক ফরাসী বিপ্লবের 'Humanity'র আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ফরাসী চিন্তার Humanity বা মানবতা ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্যে যে প্রত্যক্ষ বৈষম্য আছে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া একটা কৃত্রিম সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। সকল মানুষই শক্তিতে বা সাধনায় সমান, একথা সত্য নহে। আর মানুষের মধ্যে শক্তির ও সাধনার তারতম্য যখন আছে তখন সকলের সমান অধিকার, এমন কথাও বলা যায় না। কারণ, যার যে কার্য্য করিবার শক্তি বা শিক্ষা নাই সে অধিকারও তাহার হয় না। হিন্দু চিরদিন মানুষের শক্তি সাধ্যের দ্বারাই তাহার অধিকার নির্ণয় করিয়া আসিয়াছে। এই অধিকার-ভেদ হিন্দু সাধনার একটা প্রধান কথা। এই অধিকার-ভেদের উপরেই হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন পন্থার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আর, এই বিভিন্ন পন্থার প্রতিষ্ঠা করিয়াই হিন্দু আপনার ধর্ম্মের অপূর্ব্ব উদারতা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। রাজা এই অধিকার-ভেদ মানিতেন এবং অধিকার-ভেদ মানিয়াই তিনি বৈষম্যের মধ্য দিয়া সাম্য এবং স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়াই একতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। রামমোহনের পক্ষে য়ুরোপের নিরাকার বা একাকার মানবতার আদর্শের অনুসরণ করা সম্ভব ছিলনা। তবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ফরাসী বিপ্লবের মাদকতার উত্তেজনায় য়ুরোপ যে মানুষকে তার জন্ম, ধন, পদ বা অন্য কোনও উপাধির বিচার না করিয়া কেবল মানুষ বলিয়াই বড় করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল ইহাতেই রাজার চিত্তকে আকর্ষণ করে। ইহার অন্তরালে তিনি আপনার স্বদেশের সনাতন আদর্শের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হ'ন। আমাদের দেশে ব্রহ্ম-সাধনের ভিতর দিয়া যে ভাবটা ফুটিয়া উঠিয়াছিল

সেই ভাবই য়ুরোপের এই সাম্যবাদের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজা য়ুরোপের সাম্য, মৈত্রী এবং বিশ্বমানবতা বা Humanityকে আপনার পরিচিত বৈদান্তিক সাধনের ভিতর দিয়াই দেখিয়াছিলেন। আর এই জন্যই তাঁর মানবতার আদর্শ শূন্যগর্ভ এবং বস্তুতন্ত্রহীন ছিল না। তিনি প্রত্যক্ষ বৈষম্যকে অগ্রাহ্য করিয়া সকল মানুষকে একাকার করিতে চাহেন নাই।

মানুষ নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ নহে, সে সাকার। তার চিন্তা সাকার, ভাষায় এবং জীবনের কর্ম্মে প্রকাশিত। তার ধর্ম্ম সাকার অর্থাৎ বিশিষ্ট মতবাদ, বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত ও বিশিষ্ট সাধনার পূজা পদ্ধতিতে গঠিত। তার সামাজিক সম্বন্ধগুলিও সাকার, বিশিষ্ট অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানাদির ভিতর দিয়া চরিতার্থতা লাভ করে। এসকল বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে, মানুষ বলিয়া একটা ভাববাচক শব্দমাত্র প্রাপ্ত হই, কিন্তু মানুষ বস্তুটিকে ধরিতে ছুঁইতে পাই না। অথচ অষ্টাদশ, ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় মানবতার আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ও সাধনার ভেদ বৈষম্যকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া একটা নির্ব্বিশেষ মনুষ্যত্বের এবং ধর্ম্মের সন্ধানে ছুটিয়াছিল। রাজা য়ুরোপের এই বস্তুত্বহীন আদর্শ গ্রহণ করেন নাই।

(৭)

করেন নাই বলিয়াই রাজা ভিন্ন ভিন্ন মানুষের এবং ভিন্ন ভিন্ন সমাজের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়া তাহাদের মধ্যে একটা সম্মিলন এবং ক্রমে সমন্বয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'ব্রহ্ম-সভার' আদর্শের মধ্যে ইহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজার সে আদর্শটি বর্ত্তমান ব্রাহ্ম-সমাজের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে।

এই জন্য ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া রাজা ভারতবর্ষের আধুনিক ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির যে পথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন আমরা তাহা ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই। রাজা দেখিয়াছিলেন যে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সমাজ বা ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া এক ছাঁচে ঢালিয়া য়ুরোপে যেভাবে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সে ভাবে একটা ঘননিবিস্ট ভারতীয় Nation বা জাতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। সম্ভব হইলেও সমীচীন হইত না। এ সকল ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ও সম্প্রদায়ের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইলে কেবল যে তাহাদেরই ক্ষতি হইবে এমন নহে, ইহাতে সমগ্র মানবমণ্ডলী বা বিশ্বমানব, ইংরাজীতে যাহাকে Universal Humanity কহে তাহারও সমূহ ক্ষতি হইবে। এই বিশ্বমানব বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রহ্মের মতন বিভিন্ন আধারের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই বিশ্বমানবের প্রকৃত সত্য, শক্তি ও সৌন্দর্য্য প্রকাশিত। বিশ্বমানব অঙ্গীস্বরূপ, জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি এই বিরাট পুরুষের অঙ্গস্বরূপ। বিশ্বমানব কিংবা Universal Humanity এবং জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা Nation, এতদুভয়ের মধ্যে একটা জীবন্ত অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। জীবের সকল অঙ্গ যদি নস্ট হইয়া একমাত্র অঙ্গে পরিণত হয়, তাহাতে যেমন সে পঙ্গু হইয়া পড়ে, সেইরূপ জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতিসকল যদি একাকার হইয়া যায়, তাহা হইলে বিশ্বমানবও পঙ্গু হইয়া পড়িবে। রাজা এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াই ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন সমাজ, ধর্ম্ম এবং সাধনাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক ছাঁচে ঢালিয়া নূতন করিয়া গড়িবার চেস্টা করেন নাই। হিন্দুকে তিনি হিন্দু রাখিয়া বড় করিতে চাহিয়াছেন, মুসলমানকে মুসলমান রাখিয়াই বিশ্বমানবের অভিমুখীন করিতে চাহিয়াছেন, খৃষ্টীয়ান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ভিন্ন

ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে নিজ নিজ সিদ্ধান্তে এবং সাধনে সুপ্রতিষ্ঠ রাখিয়াই সেই সকল সিদ্ধান্ত এবং সাধনের মধ্যে যে সনাতন সত্যের এবং কল্যাণের ধারা প্রবাহিত, যুগে যুগে সাধক এবং সিদ্ধ মহাজন পরম্পরায় যে সত্য ও কল্যাণের আশ্রয়ে নিজ নিজ জীবনে সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে ফুটাইয়া তুলিয়াই নিজেদের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মকে উদার বিশ্বধর্ম্মের প্রতি উন্মুখ করিতে চাহিয়াছিলেন। সত্য এবং কল্যাণ যে আকারেই প্রকাশিত হউক না কেন, মূলে এক। সত্যে সত্যে এবং প্রকৃত কল্যাণের পথে কোনও ভেদ বিরোধ নাই। যে ভেদ দেখিতে পাই তাহা কেবল ভাষাগত ও আকারগত, পুরাতন সংস্কারের আবরণে আবৃত বলিয়া। এ সকল বাহিরের ভেদ বিরোধকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিলেই সাধক সেই মহামিলন ক্ষেত্রে উপনীত হন, যেখানে—

"মিটে যায় সব ধন্দা
যাঁহা রাম রহিম এক বান্দা,
কাফেরে মুসলমানা।"

সেই মহামিলন ক্ষেত্রের পথ গড়িয়া তুলিবার আশাতেই রাজা 'ব্রহ্মসভা'র প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা দেখিলেন, ভারতবর্ষ আপনার বৈচিত্র্যে একটা ক্ষুদ্র বিশ্বের মতন। এই ভারতে যাহা নাই জগতেও তাহা নাই বলিলে চলে। এখানে বহু ভাষা, বহু ধর্ম্ম, বহুবিধ সামাজিক রীতিনীতি, বহু আচার পদ্ধতি, বহু সাধনা এবং সভ্যতা আসিয়া মিলিয়াছে। এই ভারতে যদি এক মহাজাতির প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা হইলে এই সকল বৈচিত্র্য এবং বৈষম্যকে যথাযোগ্যভাবে বজায় রাখিতেই হইবে। ভারতের লোক পুরাকাল হইতেই ধর্ম্মপ্রাণ, তাহারা ধর্ম ছাড়িয়া যে কখনও একান্তভাবে আধুনিক য়ুরোপের Secularistদিগের মত নিজেদের ব্যক্তিগত বা সামাজিক

কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, ইহা সম্ভব নহে। আধুনিক জগতে ভারতবর্ষকে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে হইলে তাহার এই প্রকৃতিগত ধর্ম্মানুরাগকে নষ্ট করিলে চলিবে না। ধর্ম্ম যেখানে সংস্কারবদ্ধ হইয়া নিজের প্রাণতা হারাইয়াছে, সেখানে তাহাকে সংস্কারমুক্ত করিয়া সজীব করিতে হইবে; যেখানে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে সেখানে উহাকে উদার হইতে হইবে, কিন্তু ভারতের ধর্ম্মপ্রাণতাকে নষ্ট করা ত' দূরের কথা, উপেক্ষা করিয়াও একটা ভারতীয় জাতি গঠন করা সম্ভব নহে। আর অন্যদিকে হিন্দুকে মুসলমান কিম্বা মুসলমানকে হিন্দু অথবা হিন্দু এবং মুসলমান উভয়কে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়া এবং জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সেই সঙ্ঘভুক্ত করিয়া ভারতে একটা ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নহে। যে উচ্চতর সাধনার ভূমিতে ভক্ত সাধক এবং সিদ্ধ মহাপুরুষেরা সকল ধর্ম্মের সমন্বয় প্রত্যক্ষ করেন সেই ভূমিতেও জনসাধারণকে লইয়া যাওয়া সাধ্যায়ত্ত নহে। অন্যপক্ষে এ সকল ধর্ম্মের মধ্যে যে ভেদ ও বিরোধ আছে তাহার তীব্রতা যদি নষ্ট না হয়, তাহা হইলেও হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণ পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া নিজ নিজ সমাজের এবং সমষ্টিভূত ভারতীয় জাতীয় জীবনের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা এবং সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে বিরোধ আছে তাহা দূর না হইলে ভারতে আধুনিক আদর্শের একটা নূতন জাতির পত্তন কিছুতেই হইতে পারে না। রাজা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এবং ভারতের জাতীয়তার মূল অন্তরায় দূর করিবার উদ্দেশ্যেই, মনে হয়, তিনি তাঁহার 'ব্রহ্মসভা'র প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে কোনও নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন নাই, ব্রাহ্মসমাজ নামে কোনও সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাহেন নাই।

নিজের সিদ্ধান্তে ও সাধনে রাজা বৈদান্তিক হিন্দুই ছিলেন। পরমহংসাচার্য্য হরিহরানন্দ স্বামী রাজার গুরু ছিলেন। বাংলার তান্ত্রিক সাধন অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তের আশ্রয়েই গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজা এই তান্ত্রিক সাধনেরই লোক ছিলেন। কিন্তু এই সাধনকে তিনি লোকসমাজে প্রচার করেন নাই। তিনি প্রচার করিয়াছিলেন বেদান্তাদি শাস্ত্র; তিনি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন প্রাচীন ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত; তিনি প্রাচীন শাস্ত্র ও মহাজন-পথ অবলম্বন করিয়াই হিন্দু সমাজের সঙ্কীর্ণতাকে নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রাচীন আচার্য্যেরা যেভাবে শাস্ত্র ও সমাজ-ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই এগুলিকে নিজ নিজ সময়ের উপযোগী ব্যাখ্যার দ্বারা পরিবর্ত্তিত, সংশোধিত, ও সম্বর্দ্ধিত করিতে চাহিয়াছিলেন, রাজা রামমোহনও তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আধুনিক ভারতে সেই কাজটিই করিতে চাহিয়াছিলেন। এই জন্য শ্রীযুক্ত রানাডে বলিতেন,—Raja Rammohan is one of the Fathers of the great Hindu Church. He is not the founder of a new religion.

(৮)

রাজা ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কেবল লোকের ধর্ম্মসাধনের সহায় হইবে বলিয়া নহে। এখানে তিনি যে প্রণালীতে জগতের স্রষ্টা পাতা পরিত্রাতার ভজনার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা ধর্ম্মসাধনের ক খ বলিলেই চলে—অতিশয় বাল্যাবস্থার কথা। এইরূপ ভজনাতে সংস্কারবদ্ধ ধর্ম্মকে উপাসকের অনুভবের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু গভীরতর ধর্ম্মজীবন এইরূপ একটা নির্ব্বিশেষ ভজনার দ্বারা গড়িয়া উঠিতে পারে না। রাজা

নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে ব্রহ্মসভায় যে ভজনা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে জগৎকর্ত্তাকে কেবল তটস্থ লক্ষণের দ্বারাই ধরিবার চেষ্টা হইয়াছে, স্বরূপ লক্ষণের সাক্ষাৎকারের কোনও প্রকারের প্রয়াস হয় নাই। স্বরূপ উপাসনা নিম্নতম অধিকারীর জন্য নহে। যাঁহাদের সমাধির অধিকার জন্মিয়াছে, তাঁহারাই কেবল স্বরূপ উপাসনা করিতে পারেন। কেবল তটস্থ লক্ষণের দ্বারা যে ভজনা হয় তাহাতে সাধকের চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে, ভক্তিরও সামান্য উন্মেষ সম্ভব, কিন্তু মুক্তিলাভ বা ভক্তিমার্গের উচ্চতর শিখরে আরোহণ কখনই সম্ভব হয় না। ব্রহ্মাত্মৈকত্ব অনুভূতি ব্যতীত জীবের মুক্তিলাভ হইতেই পারে না, আর এই ব্রহ্মাত্মৈকত্বানুভূতি স্বরূপ উপাসনার অধিকারের কথা। তটস্থ লক্ষণার দ্বারা যে উপাসনা হয় তাহাতে এই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার আদৌ সম্ভব নহে। ইহাই রাজার সিদ্ধান্ত ছিল। সুতরাং 'ব্রহ্মসভা' প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া তিনি যে একটা উচ্চতর সাধন ক্ষেত্র গড়িতে চাহিয়াছিলেন, এরূপ কল্পনা সঙ্গত নহে। ব্রহ্মসভার মূল লক্ষ্য ছিল—উচ্চতর ধর্ম্মসাধন নহে। কিন্তু ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মসম্প্রদায়কে পরস্পরের প্রতি মর্য্যাদাশীল করিয়া ভারতের জাতীয় একতার প্রধান অন্তরায় দূর করাই এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। রাজা জানিতেন যে তাঁহার এই 'ব্রহ্মসভা'তে কখনই জন-সাধারণে আসিয়া যোগদান করিবে না। তিনি জানিতেন হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন, যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী এবং ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধনায় অল্পবিস্তর অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল এই মহামিলন-মন্দিরে আসিবেন এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের জ্ঞানী সাধকেরা যদি এভাবে সম্মিলিত হইয়া নিজ

নিজ সিদ্ধান্ত ও সাধনার কথা ব্যক্ত করেন তাহা হইলে এ সকল ধর্ম্মের মধ্যে যে সনাতন ও সার্ব্বজনীন সত্য আছে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে। এভাবে হিন্দু দেখিবেন যে মুসলমানের মধ্যেও তাঁহার নিজের শাস্ত্র ও সাধনার অনেক সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুসলমানও দেখিবেন যে হিন্দুর সঙ্গে তাঁহার শাস্ত্র ও সাধনার অনেক মিল আছে। সেইরূপ খৃস্টিয়ান, বৌদ্ধ প্রভৃতিও অপরাপর ধর্ম্মে ও সাধনে নিজ নিজ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম আভাস পাইয়া সে সকল ধর্ম্মের প্রতি মর্য্যাদাশীল হইয়া উঠিবেন। ধর্ম্মে ধর্ম্মে যে ভেদ-বিরোধ তাহা বহিরঙ্গের, আচার-বিচারের, সাধনের অতি নিম্নস্তরের। ধর্ম্ম-বস্তু যখন অনুভবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আরম্ভ করে এবং সাধক যখন সাধনার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করেন তখন এ সকল ভেদ বিরোধ তাঁহার দৃষ্টি হইতে আপনি ঝরিয়া পড়ে। হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের চিন্তানায়ক এবং উদার সাধকেরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া যাহাতে একে অন্যের ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সত্যের ও কল্যাণের সন্ধান পাইতে পারেন এবং এই সন্ধান পাইয়া একে অন্যের ধর্ম্মকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন, ইহাই রাজার 'ব্রহ্মসভা' প্রতিষ্ঠার নিগূঢ় উদ্দেশ্য বলিয়াই মনে হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্ট্‌ডীড্‌ পড়িয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ট্রাষ্ট্‌ডীডের অন্য কোনও সমীচীন ব্যাখ্যা হয় না। আর এখানে এই ব্রাহ্মসভাতে যদি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের চিন্তানায়ক এবং সাধকগণের একটা মিলনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে এই সকল ধর্ম্মের জন-সাধারণের মধ্যেও একে অন্যের প্রতি একটা শ্রদ্ধা, অন্ততঃ পরস্পরের আচার অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে যে সকল প্রভেদ আছে সে সকল উদারভাবে গ্রহণ করিবার একটা শক্তি জন্মিত। এইরূপে ভারতের জন-সমুদ্রের ধর্ম্ম ও আচারগত ভেদ ও বিরোধের অন্তরায়কে ক্রমে

ক্রমে দূর করিয়া, এ সকল ভেদের ভিতর দিয়াই ভারতবর্ষে একটা বিরাট জাতীয় একতার প্রতিষ্ঠা করিবার আশাতেই মনে হয় রাজা রামমোহন তাঁহার 'ব্রহ্ম-সভার' প্রতিষ্ঠা করেন।

এইরূপে রাজা ভারতের নূতন জাতীয় জীবনের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। বাংলার এই নবযুগে আমরা যে পূর্ণতম মনুষ্যত্ব সাধনের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছি এবং যে মনুষ্যত্ব লাভের জন্যই আমরা ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে নানা দিক দিয়া নানা চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই আদর্শ সর্ব্বপ্রথমে রাজা রামমোহনের মধ্যেই ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। এই জন্যই তাঁহাকে বাংলার এই নবযুগের যুগ-প্রবর্ত্তক বলিয়া অভিবাদন করি।

তৃতীয় কথা

ইংরাজী শিক্ষার প্রথম ফল—যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

(১)

রাজা রামমোহন বাংলার এই নব-যুগের প্রবর্ত্তক হইলেও তিনি যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহা অঙ্কুরিত হইতে অনেকদিন লাগে। এমন কি তাঁহার গ্রন্থাবলী পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছিল। স্বর্গীয় ঈশান চন্দ্র বসু মহাশয়ের চেষ্টায় তাহার কতকগুলি উদ্ধার হইয়াছে বটে; কিন্তু রাজার সকল পুস্তক পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রাজার আদর্শটি বহুদিন পর্য্যন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীরা ধরিতে পারেন নাই। এখনও পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। রাজা সমসাময়িক সমাজের জড়তা নষ্ট করিবার জন্য একটা বিরোধের সৃষ্টি করেন ইহা সত্য। এরূপ বিরোধের ভিতর দিয়াই লোক-চিন্তা ও লোক-চরিত্রকে তমঃ-প্রধান অবস্থা হইতে রজঃপ্রধান অবস্থায় ঠেলিয়া তুলিতে হয়। যাহা বর্ত্তমান তাহাকেই সনাতন বলিয়া ধরিয়া লওয়া, ইহা তামসিক-তার একটা প্রধান লক্ষণ। তামসিক অবস্থায় ধর্ম্ম ও কর্ম্ম কিছুই লোকের অনুভবে বা জ্ঞানেতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। এই তাম-সিকতাকে দূর করিবার জন্যই রাজা দেশের ধর্ম্মকর্ম্মকে লোকের অনুভবের উপরে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। আর এটী করিতে যাইয়া তিনি অনুভব-প্রতিষ্ঠ যে বেদান্ত-বিদ্যা তাহার সঙ্গে প্রচলিত গতানুগতিক ধর্ম্ম-কর্ম্মের বিরোধ দেখাইয়া সমাজে একটা সংগ্রামের সূত্রপাত করেন। এই সংগ্রামে রাজা দুইটি অস্ত্র ব্যবহার করিয়া-

ছিলেন, এক শাস্ত্র, অপর যুক্তি ; কিন্তু যুক্তি ছাড়িয়া শাস্ত্র, কিম্বা শাস্ত্র ছাড়িয়া যুক্তি অবলম্বন করেন নাই। ইহার ফলে রাজা যে আদর্শটি প্রচার করেন, তাহাতে দেশে কেবল বিরোধ জাগাতেই চাহে নাই, কিন্তু বিরোধের সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিরোধকে নিঃশেষে নিরস্ত করিয়া পূর্ব্ব-পক্ষ ও উত্তর-পক্ষ উভয়কেই একটা উচ্চতর ভূমিতে তুলিয়া লইয়া উভয়ের মধ্যে একটা সম্যক সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু দেশের জন-সাধারণের'ত কথাই নাই, যাঁহারা জ্ঞান-ভাণ্ডারের দায়াধিকারের দাবী করিয়া দেশের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত রাজার এই আদর্শটিকে ভাল করিয়া ধরিতে পারিলেন না। ধরিবার তখন সময়ও আসে নাই। রাজা আপনার অসাধারণ মনীষা প্রভাবে অনাগত ভবিষ্যতের জটিল সমস্যা প্রত্যক্ষ করিয়া আগে হইতেই তাহার মীমাংসার পথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন। সে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি'ত দেশের লোকের ছিল না। সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত সে সকল সমস্যা জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ হইয়া না উঠিয়াছে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার মীমাংসার পথও লোকে খুঁজিতে যায় নাই। ইহা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে।

(২)

রাজা দেখিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষকে যদি এযুগে সত্যভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীদিগকে নিজেদের সনাতন সভ্যতা ও সাধনা লইয়া আধুনিক সভ্য সমাজের মাঝখানে যাইয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে হইবে ; আর কূপমণ্ডুক হইয়া থাকিলে চলিবে না। ভারতবর্ষ যখন বড় ছিল, তখনও সে কূপমণ্ডুক ছিল না। বিশ্বের সঙ্গে তাহার তখন জীবন্ত সম্বন্ধ ছিল। অন্যান্য জাতিকে তখন সে আপনার যাহা ভাল তাহা দিয়াছে ; আর অপর জাতির

নিকট হইতেও যাহা তাহাদের ভাল এবং নিজের প্রয়োজনীয় নিঃসঙ্কোচে তাহা লইয়াছে। বিশ্বের জীবন-ধারা ও জ্ঞান-ধারা হইতে তখন ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। যেদিন হইতে সে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, সেদিন হইতে ভারতের সভ্যতা এবং সাধনা সঙ্কীর্ণ খাতে আবদ্ধ হইয়া আপনার শক্তি ও সত্য হারাইতে লাগিল।

ভারতবর্ষকে যদি বাঁচাইতে হয়, তাহা হইলে সকলের আগে তাহাকে এই বদ্ধ কূপ হইতে বাহির করা আবশ্যক। এই কারণেই রাজা ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত করিবার জন্য এতটা আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। রাজা দেখিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিলেও আর দুনিয়াকে নিজের দৃষ্টির বাহিরে ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না। যেদিন ইংরাজ মোগলের হস্তচ্যুত রাজদণ্ড নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছে, সেদিন হইতেই ভারতীয় সভ্যতা এবং সাধনার মধ্যযুগের বদ্ধজলের বাঁধ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, ভারতবর্ষকে এখন আধুনিক সভ্যতা ও সাধনার স্রোতের মাঝখানে যাইয়া পড়িতেই হইবে। এই বানচালের মুখে ভারতের সর্ব্বস্ব যাহাতে না ভাসিয়া যায়, সর্ব্বাগ্রে তাহাই দেখিতে হইবে। জলপড়া বা ধূলাপড়া দিয়া এই বন্যাকে আটকাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না। যে শক্তি ইহাকে ঠেলিয়া তুলিয়াছে, সেই শক্তিকে হস্তামলকবৎ আপনার আয়ত্বাধীন করিতে হইবে। যাদুমন্ত্রে জড়-বিজ্ঞানের শক্তিকে ঠেলিয়া রাখা যায় না। শ্রুতি দ্বারা যুক্তিকে কখনই কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। মন্ত্রের একটা স্থান ও অধিকার থাকিতে পারে। সে স্থান মানুষের মনে। সে অধিকার নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিতেছে আধুনিক মনোবিজ্ঞান। যন্ত্রেরও একটা স্থান এবং অধিকার আছে। তাহা বাহিরে—মনের ভিতরে নহে। সে স্থান ও অধিকার নির্দ্ধারণ করে জড়-বিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞানের দ্বারা জড়-বিজ্ঞানের কাজ হইবে

না। জড়-বিজ্ঞানের দ্বারাও মনো-বিজ্ঞানের কাজ হইতে পারে না। ইহারা যখন পরস্পরের সত্য অধিকারটা স্বীকার করিয়া লয়, তখনই উভয়ের মধ্যে সমন্বয় ও সন্ধির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। এটা স্বীকার না করিয়া মন্ত্র যদি যন্ত্রকে উড়াইয়া দিতে যায়, পরিণামে সে আপনার অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া যন্ত্রকেই বাড়াইয়া তুলে, নষ্ট করিতে পারে না। সেইরূপ শ্রুতি দ্বারা যুক্তিকেও কিছুতেই ঠেকাইয়া রাখা যায় না। শ্রুতি বা শাস্ত্র যদি যুক্তির অধিকার অস্বীকার করিয়া তাহাকে পিষিয়া মারিতে বা চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, তাহার ফলে শাস্ত্রই মর্য্যাদাশূন্য হইয়া পরিণামে যুক্তির হাতে মারা পড়ে। দুনিয়ার ইতিহাস বারে বারে ইহাই প্রমাণ করিয়াছে। রাজা এ সকল প্রত্যক্ষ করিয়াই ভারতের মধ্যযুগের মন্ত্রমুগ্ধ ও শাস্ত্রবদ্ধ সাধনা ও শিক্ষাকে নিজের প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা দেখাইয়া আধুনিক য়ুরোপের যন্ত্রবহুল এবং যুক্তিপ্রধান সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে একটা সমীচীন সমন্বয়ের পথে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন।

কিন্তু তখনও য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবটা দেশের লোকে প্রত্যক্ষ করিতে আরম্ভ করে নাই। যে শক্তি তাহাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তখনও তাহারা তাহার দুর্দ্ধর্ষতা উপলব্ধি করে নাই। সুতরাং তাহার সঙ্গে যে একটা সন্ধি করা আবশ্যক, ইহাও লোকে বুঝিল না। বুঝিল না বলিয়াই তাহারা রাজার সম্যক দৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া তাঁহার পথ ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল না। বিরোধটা তখনও পাকিয়া উঠে নাই বলিয়াই দূরদৃষ্টিহীন সমাজ রাজার শিক্ষা-দীক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু রাজা যাহা সম্মুখে না দেখিয়াও ত আসিতেছে ইহা বুঝিয়াছিলেন, ইংরাজী শিক্ষা-প্রভাবে তাহা যখন উজ্জ্বল হইয়া চক্ষুগোচর হইল, তখন লোকে রাজাকে একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিল। সুতরাং ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীরা স্বদেশকে

ভুলিয়া একেবারেই নূতন বিদেশী শিক্ষা ও সাধনার হাতে আত্ম-সমর্পণ করিতে লাগিলেন।

(৩)

ইংরাজ বণিক-কোম্পানী এদেশের টাকা লুটিতেই আসিয়াছিল, রাজ্য-শাসনের দুর্ব্বহ ভার গ্রহণ করিতে আসে নাই। যখন বিধি-চক্রে মোগলের মাথার মুকুট খসিয়া পড়িল এবং ইংরাজ তাহা হাতের নিকটে পাইয়া মাথায় তুলিয়া লইল, তখনও তাহার বণিক-বৃত্তি নষ্ট হয় নাই। প্রজার কল্যাণের জন্য কি করা প্রয়োজন এ প্রশ্নটা তাহার মনে জাগে নাই। তবে "চাচা আপন বাঁচা"—আজি পর্য্যন্ত ইহাই রাষ্ট্রনীতির সার্ব্বজনীন মূলসূত্র হইয়া রহিয়াছে। ভারতে ইংরাজ বণিকরাজও এই সূত্র অবলম্বনেই চলিতে লাগিল। তখনও তাহার রাজকীয় বুনিয়াদ পাকা হয় নাই। এই বিশাল জনসমুদ্রের মাঝ-খানে কি করিয়া সে আপনার পদ ও প্রাণ বাঁচাইবে, এ ভাবনা তাহার অন্তরে দিবানিশি জাগিয়া ছিল। প্রজাবিদ্রোহের বিভীষিকা তাহাকে সতত সন্ত্রস্ত রাখিত। অতএব কি জানি প্রজা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে, এই ভয়ে ইংরাজ প্রথমে কিছুতেই এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত করিতে চাহে নাই। পাদ্রী কেরী যখন কলিকাতায় আসিয়া ধর্ম্মতলায় ভদ্র বাঙ্গালী বালকদিগের জন্য একটা ইংরাজী স্কুল খোলেন, তখন ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল। ফলে কেরীকে অল্পদিনের মধ্যেই এ অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। পরে যখন ইংরাজী শিক্ষা ও খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কেরী এবং মার্শম্যান এদেশে একটা কলেজ খুলিতে চাহেন তখনও ইংরাজ বণিক-রাজের রাজ্যে ইহার স্থান হইল না। কলিকাতার নিকটে শ্রীরামপুরে দিনেমার রাজার জায়গাতে যাইয়া

তাঁহাদের আশ্রয় লইতে হয়। শ্রীরামপুরের কলেজের ইতিহাস পড়িলে দেখা যায় যে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট আদিতে কোনও চেষ্টাই করেন নাই, বরঞ্চ নানাদিকে বাধা দিতে চাহিয়াছিলেন *। তাঁহারা হিন্দুদের শিক্ষার জন্য সংস্কৃত কলেজ এবং মুসলমানদের জন্য আরবী ও ফার্শী মাদ্রাসাই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে যখন কলিকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়া বাংলায় ইংরাজী শিক্ষার সূত্রপাত হয় তখনও গভর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎভাবে ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই। দেশের লোকেরাই কোনও কোনও সদাশয় ইংরাজের সঙ্গে মিলিয়া এই কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার বহুদিন পরেও সরকার এদেশের পুরাতন শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, কিম্বা আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারে ব্রতী হইবেন, এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে তখন এ বিষয়ে দুইটা মত প্রবল হইয়া উঠে। একদল বলেন, হিন্দু ও মুসলমানকে তাহাদের নিজেদের বিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া হউক। ইউ-রোপের নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানাদির আমদানী করিতে গেলে ইহাদের পুরাতন সংস্কারে আঘাত লাগিয়া দেশে ঘোরতর অশান্তির সূত্রপাত হইতে পারে; সুতরাং সে পথ নিরাপদ নহে। আর একদল কহেন যে ইউরোপীয় শিক্ষা ও সাধনা প্রচার করাই কর্ত্তব্য। সে শিক্ষা ও সাধনা ব্যতীত দেশীয় লোকের জ্ঞান উন্নত ও চিন্তা উদার হইতে পারে না। আর আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়া এদেশের লোক যদি ক্রমে আমাদের অধীনতা হইতে মুক্তি লাভ করিতেই চাহে, তাহাতেই

* ১৮১৪ সালে কাশীরাম ঘোষাল নামক একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোক মৃত্যুকালে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর হস্তে ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিংশতি সহস্র মুদ্রা দিয়া যান। গভর্ণ-মেণ্টকে শিক্ষাদান বিষয়ে উদাসীন দেখিয়াই তিনি ঐ প্রকার করিয়া থাকিবেন। স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ" পৃঃ ৮৫।

বা কি আসিয়া যাইবে? আমরা একটা প্রাচীন সভ্য জাতিকে অসহায় ও পতিত অবস্থায় পাইয়া যদি হাত ধরিয়া তুলিয়া পুনরায় স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বাধীন করিয়া দিতে পারি, ইহা অপেক্ষা আমাদের গৌরবের কথা আর কি হইতে পারে? লর্ড মেকলে এই শেষোক্ত দলের নেতা ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত দলকে Orientalists কহিত। শেষোক্ত দলের Anglicists নামকরণ হইয়াছিল। বহুদিন ধরিয়া এই দুই দলের মধ্যে এদেশের শিক্ষানীতি লইয়া বিরোধ চলে। পরিণামে ১৮৩৩ ইংরাজীতে মেকলের দল বা Anglicistsরাই জয়-লাভ করেন। তখন হইতে ইংরাজ বণিক-সরকার সরকারী খরচে ও সরকারের তত্ত্বাবধানে ইংরাজী স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করেন। রাজা রামমোহন তখন বিলাতে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি লর্ড আমহার্ষ্টকে যে নূতন শিক্ষানীতি সমর্থন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, নয় বৎসর বাদানুবাদের পরে সেই নীতিই গৃহীত হইল।

রাজা যে বীজ বপণ করিয়াছিলেন, ইহার পূর্ব্বেই কিন্তু তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বণিকরাজ সরকারের এই ব্রত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই কলিকাতার দেশ-নায়কেরা হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার দ্বারা নিজেদের সন্তানগণের শিক্ষার ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই কলিকাতা সমাজে এই নূতন শিক্ষার ফলে একটা প্রবল ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লবের বান ডাকিয়াছিল। রাজা রামমোহন প্রাচীন বেদান্তাদি গ্রন্থ প্রচার করিয়া প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে যে বিরোধ জাগাইতে চাহিয়াছিলেন, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে সে বিরোধটা সত্বরই আর এক দিক দিয়া পাকিয়া উঠিতে লাগিল।

বিরোধটা পাকিল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাজা যে

সমন্বয়ের পথটা দেখাইয়াছিলেন, তাহার সন্ধান লোকে পাইল না। ফলে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম ঢেউ শিক্ষিত বাঙ্গালীকে একেবারেই স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার কোল হইতে তুলিয়া লইয়া আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার দিকে প্রবল বেগে ঠেলিয়া দিল। আর ইহার মূল কারণ ছিল—এই নূতন শিক্ষা ও সাধনার অতিশয় বলবতী স্বাধীনতা ও মানবতার প্রেরণা। ইহাই বাঙ্গালীর অন্তর্নিহিত চিরন্তন কিন্তু অধুনা বিস্মৃত স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শকে জাগাইয়া কস্তুরী-মৃগকে যেমন নিজের নাভিগন্ধে মাতাইয়া চারিদিকে ছুটাইয়া থাকে বাঙ্গালীকেও সেইরূপ নিজের আদর্শের গন্ধেই য়ুরোপের দিকে ছুটাইয়া দিল।

৪

মেকলের কথার অমর্য্যদা না করিয়াও ইংরাজ বণিক-কোম্পানী যে পতিত ভারতবর্ষের উদ্ধার কল্পেই এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত করিয়াছিল, এ কথাটা একেবারে বিশ্বাস নাও করা যাইতে পারে। কারণ এই শিক্ষা প্রচলিত না করিলে ইংরাজের পক্ষে এই বিশাল দেশকে এত সহজে শাসন করা কখনই সম্ভব হইত না। ইংরাজ যতদিন কেবল ব্যবসা বাণিজ্য লইয়া ব্যস্ত ছিল, ততদিন এই প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। মোগলের রাজদণ্ড নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াও কিছুকাল ধরিয়া ইংরাজ বণিক কোম্পানী রাজকার্য্য অপেক্ষা নিজের ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে বিলাতের সাধারণ ইংরাজ-সমাজের চক্ষু ভারতবর্ষের উপরে পড়িতে আরম্ভ করে। শিক্ষিত ইংরাজ তখন ভারতবর্ষের সুশাসনের জন্য স্বল্প-বিস্তর ব্যগ্র হইয়া উঠেন। পার্লিয়ামেণ্টে লাট হেষ্টিংস্ অসহায় ভারতবাসীর উপর অকথ্য অত্যাচার করিবার

অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে ভারত শাসন সম্বন্ধে ইংরাজ শাসক সমাজ নিজেদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করেন। তখন হইতে কেবল ব্যবসা বাণিজ্য নহে, কিন্তু সুশাসনও এদেশের নূতন ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। সকল ইংরাজই ভারতবর্ষের টাকা লুঠিতে চাহে নাই। অনেক ইংরাজ সরলভাবেই ভারতবর্ষে নিজেদের সভ্যতা ও সাধনা বিস্তারের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ইঁহারা স্বদেশের আইন কানুন অনুযায়ী যাহাতে ভারতের শাসনকার্য্য পরিচালিত হয়, ইহা চাহিয়াছিলেন। ইহাই ক্রমে ভারত শাসনের আদর্শ হইয়া উঠে। এই আদর্শে রাজ্য শাসন করিতে হইলে দেশীয় রাজকর্ম্মচারীদিগকে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। সুতরাং পতিত ভারতের উদ্ধার কল্পেই যে ইংরাজ এদেশে আধুনিক শিক্ষা বিস্তার করিতে অগ্রসর হয়, একথা আংশিক সত্য হইলেও যোল আনা সত্য নাও হইতে পারে।

তারপর আরও কথা আছে। দূরদর্শী ইংরাজ মনীষীরা ইহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছিলেন যে কেবল ভয় দেখাইয়া এই বিপুল জনসমুদ্রকে বহুদিন নিজেদের শাসনাধীনে রাখা সম্ভব হইবে না। লাঠির জোরে মাটি জয় হইয়াছে বটে, এখন যদি নিজেদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বলে এদেশের লোকের চিত্তকে জয় না করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে ইংরাজ প্রভুশক্তি কিছুতেই বেশীদিন তিষ্টিতে পারিবে না। দেশের লোকে তখন ইংরাজকে ম্লেচ্ছ মনে করিয়া অত্যন্ত ঘৃণা করিত। যাহারা কোম্পানীর আফিসে বা আদালতে কিম্বা ইংরাজ সওদাগরদিগের দপ্তরে কার্য্য করিয়া জীবিকা উপার্জন করিত তাহারা পর্য্যন্ত সন্ধ্যাকালে সেই আফিসের পোষাকশুদ্ধ গঙ্গাজলে অবগাহন স্নান না করিয়া বাড়ীতে ঢুকিত না। যে প্রজারা রাজাকে এরূপ 'অস্পৃশ্য' মনে করে তাহারা কখনই বেশীদিন তাহার শাসন মানিয়া

চলিতে পারে না। এ অবস্থায় এদেশে যতদিন না ভদ্রসমাজের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা ও সাধনার বিস্তারের ফলে এমন একদল লোকের সৃষ্টি হইবে যাহারা দেশের নূতন রাজপুরুষদিগের রীতি-নীতি ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সভ্যতা ও সাধনাকে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বরণ করিয়া লইবে ততদিন এই বিদেশীয় শাসন কিছুতেই বদ্ধমূল হইতে পারিবেনা। এই দিক দিয়া বিচার করিয়াও এদেশে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন ইংরাজের রক্ষার জন্যই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। মেকেলে প্রভৃতি নীতিজ্ঞেরা একথাটা যে ভাল করিয়া বুঝেন নাই, এরূপ কল্পনা করাও কঠিন। বিশেষতঃ ইঁহাদের প্রতিপক্ষীয়েরা যখন রাজ্যরক্ষার জন্যই এদেশের লোককে ইংরাজী না শিখাইয়া প্রাচীন সংস্কৃত, ফার্শী এবং আরবীই শিখাইতে চাহিয়াছিলেন তখন এই দিক দিয়া যে কথাটার বিচার হয় নাই, এরূপ অনুমানও করা যায় না। সুতরাং কেবল আমাদের উদ্ধারকল্পেই নহে, কিন্তু নিজেদের রাজ্যে শাসন সংরক্ষণের সুবিধা করিবার জন্যও যে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

৫

তবে মেকলে প্রভৃতি যে যুগের লোক ছিলেন সে যুগটাই য়ুরোপে এক অভিনব স্বাধীনতা এবং মানবতার প্রেরণায় মাতিয়া উঠিয়াছিল। যে আদর্শের ইঙ্গিতে ফরাসী বিপ্লবের সৃষ্টি হয়, সেই আদর্শ তখন য়ুরোপের মনীষী সমাজের মধ্যে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শিক্ষিত ইংরাজেরাও তখন ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্র্য, স্বাধীনতা এবং বিশ্বমানবতা বা Humanityর আহ্বানে অনেকটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এদেশে যে সকল ইংরাজ রাজপুরুষ তখন আসিয়াছিলেন তাঁহারা অনেকেই এই আদর্শের দ্বারা স্বল্পবিস্তর অভিভূত

হইয়াছিলেন। সুতরাং মেকেলে যে সরলভাবেই ভারতবর্ষের উদ্ধার-কল্পে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত করিতে চাহিয়াছিলেন, একথাও অস্বীকার করিবার কোনও হেতু নাই। অধিকাংশ সময়ই মানুষ কেবল একটা লক্ষ্য ধরিয়াই কাজ করে না। নানা ভাবের প্রেরণা মানুষকে কর্ম্মে প্রণোদিত করে। স্বার্থ ও পরার্থ অনেক সময়ে উভয়ে এমন জড়াজড়ি করিয়া থাকে যে কোথায় স্বার্থ আর কোথায় পরার্থ ইহা নির্দ্ধারণ করা সহজ হয় না, সম্ভবই হয় কিনা সন্দেহ। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। নিজেদের স্বার্থ সাধন এবং আমাদের কল্যাণ বিধান, এই দুই উদ্দেশ্যেই ইংরাজ এদেশে য়ূরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

রাজপুরুষদিগের অভিপ্রায় যাহাই হউক না কেন, এদেশে প্রথমে যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন তাঁহারা সকলেই ফরাসী-বিপ্লবের আদর্শের দ্বারা অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা এবং বিশ্বমানবতা, ইঁহাদের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রধান শিক্ষক ছিলেন—ডিরোজিও। ডিরোজিও ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা ও মানবতার ভাবে ভরপুর ছিলেন। যে যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—ইংরাজীতে যাহাকে Rationalism এবং Individualism কহে, ফরাসী বিপ্লবের মূল ভিত্তি ছিল, তাহারই উপরে ডিরোজিওর মানস-জীবন এবং চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। মদ খাইয়া যেমন মানুষ মাতাল হয়, ডিরোজিও সেইরূপ দিবানিশি এ সকল ভাবের ঘোরে যেন মাতোয়ারা হইয়া থাকিতেন। যাঁহারা হিন্দু কলেজে তাঁহার নিকটে লেখাপড়া শিখিতে গেলেন, তাঁহারা অল্পকালের মধ্যেই ডিরোজিওর অসাধারণ প্রতিভা এবং উদার মানবতার প্রভাবে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। এই যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য তাঁহাদের জীবনের মূলমন্ত্র হইয়া উঠিল।

এই নূতন আদর্শের প্রেরণায় ইঁহারা প্রচলিত ধর্ম্মের এবং সমাজের সকল বন্ধনকে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে বাংলায় *ইংরাজী-নবীশদিগের প্রথম দলের মধ্যে একটা তীব্র ধর্ম্মদ্রোহিতা এবং সমাজদ্রোহিতা জাগিয়া উঠিল।*

৬

ডিরোজিও জাতিতে পর্তুগীজ ছিলেন। তাঁহার কোনও পূর্ব্ব-পুরুষ এদেশে আসিয়া এখানেই কোনও বাঙ্গালী মহিলাকে বিবাহ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ডিরোজিও কলিকাতার ইটালী পদ্মপুকুরের নিকট এক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। ডিরোজিও কলিকাতাতে ধর্ম্মতলায় ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। ড্রামণ্ড ইংরাজী সাহিত্যে এবং দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে এরূপ শুনা যায় যে ধর্ম্ম বিষয়ে আত্মীয়-স্বজনের সহিত মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে ড্রামণ্ড চিরদিনের মত তাঁহার জন্মভূমি স্কট্‌ল্যাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। যে স্বাধীন-চিন্তার প্রভাবে ফরাসী বিপ্লবের অভ্যুদয়, সেই স্বাধীন চিন্তা পূর্ণমাত্রায় তাঁহার অন্তরে কার্য্য করিয়াছিল।

ড্রামণ্ডের প্রতিভার সংস্পর্শ পাইয়া ডিরোজিওর প্রতিভা ফুটিয়া উঠিল। ডিরোজিও কবি এবং দার্শনিক হইয়া উঠিলেন। ডিরোজিও ইংরাজী ১৮২৮ সালে হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া ইংরাজী এবং নীতিবিজ্ঞান বা Moral Philosophy পড়াইতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে য়ুরোপীয়, বিশেষতঃ ইংরাজী দার্শনিক চিন্তায় ডেভিড হিউমের খুব প্রভাব ছিল। হিউমের দর্শন অতীন্দ্রিয় জ্ঞান এবং সত্যকে অসিদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিল। হিউমই ইংল্যাণ্ডে আধুনিক

দার্শনিক যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রধান গুরু ছিলেন। হিউমের দার্শনিক চিন্তা ডিরোজিওর শিক্ষার আশ্রয়ে তাঁহার বাঙ্গালী শিষ্যদিগের অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিল। ডিরোজিও কেবল কলেজে পড়াইয়াই ছাত্রদিগের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ শেষ করিতেন না; কলেজের বাহিরে তাহাদিগকে লইয়া সাহিত্য, দর্শনাদির আলোচনা করিতেন। এই সকল আলোচনার জন্য একাডেমিক এসোসিয়েশন নামে একটি সভার প্রতিষ্ঠা হয়। ডিরোজিও এই সভার সভাপতি ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"রসিক-কৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিনারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উক্ত সভার প্রধান বক্তা, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি অপরাপর উৎসাহী সভ্য শ্রোতৃরূপে উপস্থিত থাকিতেন। এই সভা অল্পদিনের মধ্যে লোকের দৃষ্টি এতদূর আকর্ষণ করিয়াছিল যে উহার অধিবেশনে এক এক দিন ডেভিড় হেয়ার, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিকের প্রাইভেট সেক্রেটারী বেনসন্ সাহেব, পরবর্ত্তী সময়ে এডজুটাণ্ট জেনারেল বিটসন সাহেব, বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ মিল্‌স প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিতেন, এবং সভ্যগণের বক্তৃতা শুনিয়া বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন।"

ডিরোজিও যখন হিন্দু কলেজের শিক্ষক ছিলেন, তখন হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলেজের অফিসে কর্ম্ম করিতেন। তিনি এই সভার সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে—

"The principles and practices of Hindu religion were openly ridiculed and condemned, and angry disputes were held on moral subjects, the sentiments of Hume were widely diffused and warmly

patronised....The Hindu religion was denounced as vile and corrupt and unworthy of the regard of rational beings. The degraded state of the Hindus formed the topic of many debates ; their ignorance and superstition were declared to be the causes of such a state ; and it was then resolved that nothing but a liberal education could enfranchise the minds of the people."—(রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ —পৃঃ ১১০)

ডিরোজিওর এই সকল শিক্ষার ফলে প্রাচীন সমাজে এবং পরিবারে জ্যেষ্ঠগণের সঙ্গে নব্য যুবকদিগের বিরোধ বাধিয়া উঠিল। স্বর্গীয় প্যারীচাদ মিত্র মহাশয় বলেন যে—"ছেলেরা উপনয়ন কালে উপবীত লইতে চাহিত না ; অনেকে উপবীত ত্যাগ করিতে চাহিত ; অনেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক ঠাকুর ঘরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহারা বসিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিকের পরিবর্ত্তে হোমরের ইলিয়ড হইতে উদ্ধৃত অংশ সকল আবৃত্তি করিত।" শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কহেন যে,—"সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি যে অনেক বালক ইহা অপেক্ষা অনেক অতিরিক্ত সীমাতে যাইত। তাহারা রাজপথে যাইবার সময় মুণ্ডিত মস্তক, ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলেই তাহাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য—"আমরা গরু খাইগো," "আমরা গরু খাইগো," বলিয়া চীৎকার করিত। কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় ভবনের ছাদের উপরে উঠিয়া প্রতিবেশীগণকে ডাকিয়া বলিত,—এই দেখ, মুসলমানের জল মুখে দিতেছি—এই বলিয়া পিতা পিতৃব্য প্রভৃতির তামাক খাইবার টীকা মুখে দিত।"

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই পুস্তকে এবং স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু

মহাশয়ের 'একাল ও সেকাল' গ্রন্থে এই ধর্ম্মদ্রোহিতা এবং সমাজ-দ্রোহিতার বহুল বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে বাংলাব ইংরাজীনবীশেরা প্রাচীনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া য়ুরোপের ছাঁচে নিজেদের সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য কতটা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, এই দুখানি গ্রন্থে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

(৭)

অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের বা Rationalismএর উপরেই আমাদের প্রথম দলের ইংরাজীনবীশদিগের এই সমাজ-ও-ধর্ম্মদ্রোহিতা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে চাহিয়াছিল। এই যুক্তিবাদের অপূর্ণতা তখনও ভাল করিয়া য়ুরোপীয় চিন্তাতেই ফুটিয়া উঠে নাই। আমাদের নব্যশিক্ষিত ইংরাজনবীশেরা যে এই অপূর্ণতা ধরিতে পারেন নাই, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের কথা নহে। এই যুক্তিবাদ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকেই সত্যের বা বস্তুর একমাত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করে। তখনও এই ইন্দ্রিয় জ্ঞানের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ হয় নাই। যে পথে ভৃগুবারুণী সংবাদে বরুণ-পুত্র ভৃগু অন্ন-ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত হইতে মনোব্রহ্মে এবং মনোব্রহ্ম সিদ্ধান্ত হইতে বিজ্ঞানব্রহ্মে যাইয়া পৌঁছিয়াছিলেন, সে পথের সন্ধান আমাদের ইংরাজীনবীশেরা জানিতেন না। য়ুরোপীয় দার্শনিক চিন্তাতে হিউমের পরে বার্কলে, বার্কলের পরে কাণ্ট, এবং কাণ্টের পরে হেগেল, ও হেগেলের পরে হার্ব্বার্ট স্পেন্সর অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদের অপূর্ণতা দেখিয়া তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন। সেই চিন্তাধারাও য়ুরোপেই তখন ফুটিয়া উঠে নাই, এদেশে আসিয়া পৌঁছিবে কিরূপে? অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় যুক্তিবাদের মূল ভিত্তি প্রত্যক্ষ। আমাদের প্রাচীনেরাও এই সকল যুক্তিবাদীর

মতন প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহারা মানুষের অভিজ্ঞতার সমক্ষে এই শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধময় ইন্দ্রিয় রাজ্য বা বিষয় রাজ্য ছাড়াও আর একটা বিশাল অতীন্দ্রিয় রাজ্য বা অধ্যাত্ম রাজ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ এই বাহিরের বিষয়জগতে বস্তুর বা সত্যের প্রমাণ। আবার ঐ বিষয়-রাজ্যের অতীতে অথচ ইহার সঙ্গেই একরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে অথচ প্রচ্ছন্নরূপে জড়াজড়ি করিয়া যে অতীন্দ্রিয় রাজ্য আছে, সে রাজ্যে বস্তুর বা সত্যের প্রমাণ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ নহে, কতকটা অনুমান বা উপমান—ইংরাজী ন্যায়ের পরিভাষায় যাহাকে Induction কহিতে পারা যায়। কিন্তু এই Induction বস্তুর অস্তিত্বের সম্ভাবনা মাত্রই প্রতিষ্ঠিত করে, তাহার অকাট্য প্রমাণ দান করিতে পারে না। সে প্রমাণ দেয় অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ কিম্বা আমাদের প্রাচীন বেদান্তের পরিভাষায় অপরোক্ষ অনুভূতি। আমাদের প্রাচীনেরা বিশ্বাস করিতেন যে বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা যেমন বহির্বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপই সকল-ইন্দ্রিয়-চেষ্টা নিরোধ করিতে পারিলে আত্মা সমাধি নামক অবস্থা লাভ করে। আর সেই সমাধির অবস্থাতে যোগী বা সাধক অতীন্দ্রিয় সত্যের অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিতে পারেন। সেই জ্ঞানও প্রত্যক্ষ জ্ঞান বটে। আমাদের প্রাচীন প্রমাণ-শাস্ত্রে শব্দ-প্রমাণের যে উল্লেখ আছে তাহা এই অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ অনুভূতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় চিন্তা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের অপূর্ণতা অনুভব করিয়া, ইন্দ্রিয়ের প্রমাণের দ্বারা মানুষের সকল অভিজ্ঞতার মীমাংসা হয় না দেখিয়া, Intuition বা আত্মপ্রত্যয়ের আশ্রয় লইয়াছিল। এই Intuition বা আত্মপ্রত্যয়বাদই অষ্টাদশ শতাব্দীর ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপরে প্রতিষ্ঠিত যুক্তিবাদের সাংঘাতিক

আঘাত হইতে ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও আস্তিক্যকে বাঁচ ইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আমাদের নূতন ইংরাজীনবীশেরাও কেহ কেহ এই পথেই নাস্তিক্যের হাত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপে আমাদের প্রথম দলের ইংরাজীনবীশদিগের মধ্যে মোটের উপরে দুইটা দল গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। একদল প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের উপর আস্থা হারাইয়া নাস্তিক্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ইহারা ঈশ্বর মানিতেন না, পরকাল মানিতেন না, ধর্ম্মের শাসন স্বীকার করিতেন না, কেবল লোকশ্রেয়ঃ অর্থাৎ জনসাধারণের যাহাতে কল্যাণ হয় এবং যাহা তাহাদের সুখসমৃদ্ধি সাধন করে, ইহাকেই সমাজ-নীতির মূলসূত্ররূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাহাতে লোকের সুখসমৃদ্ধি নষ্ট করে, তাহাই অধর্ম্ম, যাহা দ্বারা ইহলৌকিক সুখসমৃদ্ধি হয়, তাহাই ধর্ম্ম, ইহাই ইঁহাদের চরিত্রের বুনীয়াদ হইয়া উঠে। ইহারা প্রচলিত এবং প্রাচীন ধর্ম্মের শাসন না মানিয়াও মোটের উপরে অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ এবং সচ্চরিত্র ছিলেন। ৺হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন যে ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাবে—

"The conduct of the students out of the college was most exemplary and gained them the applause of the outside world, not only in a literary or scientific point of view, but what was of still greater importance, they were all considered men of truth. Indeed, the college boy was a synonym for truth, and it was a general belief and saying amongst our countrymen, which those that remember the time must acknowledge, that 'such a boy is incapable of falsehood because he is a college boy."

(অর্থাৎ, কলেজের ছাত্রদের ব্যবহার সকলের কাছে প্রশংসার বিষয় ছিল। তাহারা সত্যনিষ্ঠ ছিল। এমন কি কলেজের ছাত্র বলিতে সত্যনিষ্ঠ যুবকই বুঝাইত। কলেজের ছাত্র, সুতরাং সে মিথ্যা বলিতে পারে না, ইহা একটা প্রবাদের মত দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।)

আর একদল প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইয়াও সকল ধর্ম্ম-বিশ্বাস হারাইলেন না। ইহাদের প্রকৃতির মধ্যেই একটা বলবতী আস্তিক্যবুদ্ধি বিদ্যমান ছিল। যুক্তি যাহাই বলুক না কেন, ইহাদের মন ঈশ্বর নাই, আত্মা নাই, পরলোক নাই, ধর্ম্ম নাই, এসকল কথা কিছুতেই বেদবাক্যরূপে মানিয়া লইতে পারিত না। ইহাদের প্রকৃতিনিহিত এই আস্তিক্যবুদ্ধি বাহিরের তর্কযুক্তিকে কাটিতে না পারিলেও ঠেকাইয়া রাখিত। ইহারা হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়াও প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মদ্রোহী হইতে পারিলেন না। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন তাঁহাদের সংখ্যা বেশী ছিল না, কিন্তু অনেকেই অন্তরে অন্তরে খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হইয়া পড়িতে লাগিলেন। হিন্দুধর্ম্ম এবং খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ প্রভেদ এই যে খৃষ্টধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের মতন কঠোর আচারবদ্ধ নহে। রোমান ক্যাথলিকদিগের মধ্যে কিছু কিছু আচারবদ্ধতা দেখা যায় বটে, ক্যাথলিক সঙ্ঘে হিন্দুধর্ম্মের মতন ব্রত উপবাসাদির বিধান আছে। প্রটেষ্টেণ্ট খৃষ্টানদিগের মধ্যে এগুলি নাই বলিলেই চলে। আমাদের ইংরাজীনবীশেরা খৃষ্টধর্ম্মের প্রটেষ্টেণ্ট শাখার সঙ্গেই যাহা কিছু পরিচয় লাভ করেন। ক্যাথলিক শাখার সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নাই। আর হইলেও ক্যাথলিক সাধনে প্রটেষ্টেণ্ট সাধনের মতন যুক্তির এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্থান নাই। এ বিষয়ে ক্যাথলিক সমাজ কতকটা আমাদের তদানীন্তন

হিন্দুসমাজের মতনই ছিল। যুক্তি এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নামে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া ক্যাথলিক খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের শাসন গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রটেষ্টেণ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণ যুক্তির এবং বহুল পরিমাণে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বা Individualism-এর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। প্রটেষ্টেণ্ট খৃষ্টীয়ানেরা আপ্তবাক্য বা Revelation স্বীকার করেন বটে। বাইবেলই তাঁহাদের প্রামাণ্য শাস্ত্র। কিন্তু প্রত্যেক সাধক নিজ নিজ যুক্তি এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা এই আপ্তবাক্যের বা শাস্ত্রবাক্যের অর্থ এবং অভিপ্রায় নির্দ্ধারণ করিয়া লইবেন, এ বিষয়ে অন্য কাহারও অধিকার নাই। ইহাকেই মার্টিন লুথার Right of Private Judgment নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই অধিকার প্রত্যেকের যুক্তি ও বুদ্ধিকে শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ের একমাত্র বিচারক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই ভাবে প্রটেস্টেণ্ট খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মে অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের—Rationalism এবং Individualismএর—কতকটা স্থান আছে। ভারতের প্রাচীন সাধনাতেও যুক্তি এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একটা স্থান আছে। গতানুগতিক ধর্ম্মের সাধনে কেহ ইহার সন্ধান লইত না। সুতরাং এসকল কথা তখন লোকে জানিত না এবং বুঝিত না। এইজন্যই আমাদের যে সকল ইংরাজীনবীশেরা এই যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রেরণায় হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজকে অযৌক্তিক এবং মানবের স্বাভাবিক স্বাধীনতার পরিপন্থী বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রটেষ্টেণ্ট খৃষ্টীয় ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণে কুণ্ঠিত হন নাই। ফলতঃ আমাদের প্রথম দলের ইংরাজীনবীশদিগের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ এতটা পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে হিন্দুসমাজ তাহাতে ভীতিগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা রাধাকান্ত দেব তখন কলিকাতার হিন্দুসমাজের অন্যতম প্রধান নায়ক ছিলেন।

একদিকে যখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে তখন রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে কলিকাতার হিন্দুগণ সম্মিলিত হইয়া এই নূতন ভাব-তরঙ্গের মুখে গতানুগতিক হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

কিন্তু সমস্যাটা অত্যন্ত জটিল ছিল। ইহারা বিষয়বুদ্ধির প্রেরণায় নূতন ইংরাজ রাজের সরকারে এবং সওদাগরদিগের আফিসে জীবিকা উপার্জ্জনের লোভে বালকদিগকে ইংরাজী শিখাইতে লাগিলেন। ইংরাজী শিক্ষার স্রোত বন্ধ করিবার সাহস ইহাদের হইল না। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর হিন্দু কলেজের একজন প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সুতরাং এই নূতন বিদ্রোহের বান তিনি নিজে খাল কাটিয়া ঘরে আনিয়াছিলেন, ইহা বলা যাইতে পারে। যখন এই বানচালের মুখে তাঁহার ধর্ম্ম এবং সমাজ ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল, তখনও তিনি ইংরাজী শিক্ষার উচ্ছেদ সাধনে অগ্রসর হইলেন না। কি করিয়া ছেলেরা ইংরাজীও শিখিবে, ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার শাস্ত্র-সাহিত্যও অধ্যয়ন করিবে, অথচ ইহার যে অপরিহার্য্য পরিণাম যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রভাব, তাহার হাতও এড়াইয়া থাকিবে, এই অসাধ্য সাধনায় হিন্দুসমাজের নেতৃগণ প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু তন্ত্রমন্ত্রের দ্বারা, শাস্ত্র ও কিম্বদন্তীর দোহাই দিয়া, কিম্বা সমাজ শাসনের ভয় দেখাইয়া নূতন ভাবের ও আদর্শের মদে মাতোয়ারা যুবকের দলের সমাজ এবং ধর্ম্মদ্রোহিতাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। এ সকল চেষ্টা সত্ত্বেও চারিদিকে খৃষ্টধর্ম্মের বিভীষিকা জাগিয়া হিন্দুসমাজের বিষম আতঙ্ক উপস্থিত করিল। কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশধর সুপণ্ডিত ও সদ্বিদ্বান কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, সেদিন

কলিকাতার হিন্দুসমাজের নেতৃগণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে কৃষ্ণমোহন যে পথ দেখাইয়াছেন, ইংরাজীনবীশ ভদ্রসন্তানেরা দলে দলে সে পথ অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিবে। ভদ্রসমাজের বংশধরেরা যদি এইরূপে খৃষ্টীয়ান হইয়া যায় তবে ক্রমে গোটা দেশটাই খৃষ্টীয়ান হইয়া পড়িবে। ধর্ম্মরক্ষা ও সমাজরক্ষা ক্রমে অসাধ্য হইয়া উঠিবে। এই আসন্ন বিপদে উদ্ধার করিবে কে? ইহা ভাবিয়া তাঁহারা চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এরূপ অবস্থায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহনের আধ্যাত্মিক দায়াধিকারের দাবী করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মুমূর্ষু ব্রহ্মসভাতে নবচেতনা সঞ্চার করিয়া নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের উপরে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব নষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন।

চতুর্থ কথা

ব্রাহ্মসমাজ ও দেবেন্দ্রনাথ

বাংলার নবযুগের ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজ একটা খুব বড় স্থান অধিকার করিয়া আছে। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া এই বড় কথাটা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মসমাজকে দেখিয়া প্রথম যৌবনে অন্তরে স্বাধীনতা আদর্শের প্রেরণায় তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, সে ব্রাহ্মসমাজ এখন আর নাই। থাকিলে বাংলা আজ এতটা আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িত না।

যে স্বাধীনতা এবং মানবতা বাংলার চিন্তার এবং সাধনার সনাতন বৈশিষ্ট্য, যে স্বাধীনতা এবং মানবতার নূতন প্রেরণা লইয়া আসিয়া ইংরাজী শিক্ষা ও আধুনিক ইউরোপীয় সাধনা নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীকে একদিন মাতাইয়া তুলিয়াছিল, যে স্বাধীনতা এবং মানবতার সঞ্জীবনী-মন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে দেশের গতানুগতিক ধর্ম্মে এবং সমাজে পুরাতন সংস্কারের ও রীতিনীতির নিগড় ভাঙ্গিয়া নিজেদের মুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন,—সেই স্বাধীনতার এবং মানবতার আদর্শ বুকে লইয়াই ব্রাহ্মসমাজ ভূমিষ্ঠ হয়। ইংরাজী শিক্ষা এবং ইংরাজের আইন-কানুন দেশমধ্যে সাধারণভাবে একটা স্বাধীনতার প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এই স্বাধীনতার আদর্শ ব্রহ্মসমাজের বাহিরে আংশিকভাবেই ফুটিয়া উঠিতেছিল। ব্রাহ্ম-সমাজই এই স্বাধীনতার পরিপূর্ণ মূর্ত্তিটী প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। এই খানেই বাংলার নবযুগের ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজ একটা অতি উচ্চস্থান অধিকার

করে। এই ব্রাহ্মসমাজ বাংলার নিজস্ব বস্তু। অন্য কোনও প্রদেশে এই বস্তুটি ফুটিয়া উঠে নাই। ইহার কারণ এই যে, বাংলা যে স্বাধীনতা ও মানবতার প্রেরণা পাইয়াছে, অন্য কোনও প্রদেশ তাহা পায় নাই।

বাংলার প্রথম যুগের ইংরাজীনবীশেরা নূতন স্বাধীনতা এবং মানবতার প্রেরণায় সমাজে একটা প্রবল সংশয়বাদ বা নাস্তিক্য আনিয়া ফেলেন; আর ইহারই সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ও প্রচলিত ধর্ম্ম ও সমাজনীতির বেষ্টনী উল্লঙ্ঘন করিয়া একটা স্বেচ্ছাচার ও অনাচারের বন্যায় সমাজকে ভাসাইয়া দিতে উদ্যত হ'ন। কিন্তু ইহারই মধ্যে যাঁহাদের প্রকৃতিগত আস্তিক্য এবং ধর্ম্মবুদ্ধি বলবতী ছিল, তাঁহারা স্বদেশের প্রচলিত ধর্ম্মে শ্রদ্ধা হারাইয়া খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। এই ত্রিবিধ অমঙ্গলের হস্ত হইতেই দেশকে রক্ষা করে ব্রাহ্মসমাজ। বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া এই সত্য কথাটা ভুলিলে চলিবে কেন?

(২)

কেবল ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজ-শাসনের হাতে এই আসন্ন বিপ্লবের আশঙ্কা-নিবারণের ভার ছাড়িয়া দিলে চলিত কি? ইউরোপে ফরাসী-বিপ্লবের মুখে স্বাধীনতার এবং মানবতার যে আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে তাহার ভুল ভ্রান্তি ধরা পড়িয়া সংশোধিত হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই বৈপ্লবিক আদর্শের উদ্দাম আস্ফালন কালক্রমে ইউরোপেও সংযত হইয়া আসিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজ-শাসনের উপরে একান্তভাবে আমাদের বিগত শত বর্ষের সামাজিক অভিব্যক্তি-ধারার পরিচালনার ভার ছাড়িয়া দিলে ইউরোপের মতন এদেশেও প্রথম যুগের স্বাধীনতার এবং মানবতার আদর্শের উদ্দামতা আপনি

সংযত হইয়া আসিত,—এরূপ কল্পনা করা যায় বটে। আর সে অবস্থায় ইংরাজী শিক্ষা এবং ইংরাজ-শাসনই, ব্রাহ্মসমাজ যে কাজটা করিয়াছে, আপনা হইতেই সে কাজটা করিত। ফলতঃ ইংরাজী শিক্ষাকে আশ্রয় করিয়াই ব্রাহ্মসমাজও এ কাজটা করিয়াছে। সে শিক্ষা দেশময় পরিব্যাপ্ত না হইলে ব্রাহ্মসমাজের কোনও দিকেই সফলতার সম্ভাবনা ছিল না। এ কথা যে একেবারে মিথ্যা, এমনও নহে। কিন্তু এ সকল স্বীকার করিলেও বাংলার নবযুগের ইতিহাসের অভিব্যক্তিতে ব্রাহ্মসমাজ যে কাজটা করিয়াছে, তাহার মূল্য হ্রাস হয় না।

প্রথমতঃ, শুধু ইংরাজী শিক্ষাই যদি আমাদের নবযুগের নবীন চিন্তা ও সাধনাকে পরিচালিত করিত, তাহা হইলে এই যুগের উপরে এখনও আমাদের স্বদেশের সনাতন প্রকৃতি ও সাধনার যে ছাপটা অঙ্কিত হইয়া আছে, তাহা একেবারেই ধুইয়া মুছিয়া যাইত। ইউরোপের শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়া এবং ব্রিটিশের শাসনতন্ত্রাধীনে থাকিয়া আমরা ক্রমে ক্রমে ইউরোপের ছাঁচেই গড়িয়া উঠিতাম। জাপানের মত একটা স্বাধীন ও পরাক্রমশালী জাতি যখন নিজের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না, ইউরোপের প্রভাবে, ইউরোপের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে যাইয়াই ইউরোপের মতন হইয়া উঠিতেছে, তখন আমাদের মতন একটা পরাধীন ও আত্মবিস্মৃত জাতির পক্ষে এই অপরিহার্য্য পরিণাম পরিহার করিবার সম্ভাবনা ছিল কি ?

আমাদের এই আত্মবিস্মৃতি দূর করিয়া আত্মজ্ঞানের প্রথম উদ্রেক করেন, ব্রাহ্মসমাজ। আর এই কর্ম্মে প্রথম এবং প্রধান নায়ক ছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। রাজা রামমোহন ইহার সূত্রপাত করিয়া যান, একথা সত্য। কিন্তু রাজা বিলাত চলিয়া গেলে এবং সেখানে দেহরক্ষা করিবার পরে তাঁহার সংস্কার-ব্রত উদ্‌যাপনের সকল সম্ভাবনা একরূপ

লোপ পাইয়া যায়। তিনি যে কাজটা করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার জীবদ্দশায় অতি অল্প লোকই সে কাজের প্রকৃত মর্ম্ম এবং মূল্য ধরিতে পারিয়াছিলেন। অন্য দিকে তিনি যে ইংরাজী শিক্ষার পত্তন করেন, সেই শিক্ষার প্রভাব তাঁহার নিজের কর্ম্মের প্রভাবকেই ছাপাইয়া উঠে। রাজা একটা সমন্বয়ের পথ দেখাইয়াছিলেন। রাজার সাধনাতে শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্তির, গুরুর উপদেশের সঙ্গে স্বানুভূতির, সমাজানুগত্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের, প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের, একটা অপূর্ব্ব সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছিল। এই সমন্বয়ের সূত্রটা যদি দেশের লোকে ভাল করিয়া ধরিতে পারিত, তাহা হইলে ইংরাজী শিক্ষা যে অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলা জাগাইয়া তুলে, তাহা উঠিতে পারিত না। রাজার অভাবেই তাঁহার স্বহস্ত-রোপিত ইংরাজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় সাধনা একটা দেশব্যাপী নাস্তিক্য ও বিপ্লবের আশঙ্কা জাগাইয়া তোলে। এই আশঙ্কা নিবারণ করেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

রাজা রামমোহন রায়ের অবর্ত্তমানে তাঁহার ব্রহ্মসভা মুমূর্ষু হইয়া পড়ে। ধর্ম্মসাধনে রাজার সতীর্থ এবং এবং রাজার সংস্কারকার্য্যে তাঁহার শিষ্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় এই মুমূর্ষু ব্রহ্মসভাকে ধরিয়া পড়িয়াছিলেন। রাজা এদেশে থাকিতে যাঁহারা তাঁহার সহচর এবং অনুচর ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই, তিনি চলিয়া গেলে, এই ব্রহ্মসভা হইতে সরিয়া পড়েন। জোড়াসাঁকোর ব্রহ্মসভার বাড়ীটা এবং বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ই রাজার এই কীর্ত্তির স্মৃতি রক্ষা করিতেছিলেন। এ অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকালে রাজাকে দেখিয়াছিলেন। রাজা আদর করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে "বেরাদর" বলিয়া ডাকিতেন। বিকাল বেলা

বেড়াইতে যাইবার সময় অনেকদিন রাজা আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র রমাপ্রসাদের সঙ্গে রমাপ্রসাদের সতীর্থ দেবেন্দ্রনাথকেও গাড়ীতে তুলিয়া লইতেন। এইরূপে বালক দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজার একটা স্নেহের সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। দেবেন্দ্রনাথের মুখে এ সকল কথা শুনিয়াছি। বিলাত যাইবার সময় রাজা তাঁহার সুহৃদ্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে যাইয়া "বেরাদর" দেবেন্দ্রনাথকেও ডাকাইয়া পাঠান; এবং নীরব করমর্দ্দন করিয়া তাঁহার নিকট হইতেও বিদায় গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ মনে করিতেন যে এই নীরব করমর্দ্দনের দ্বারাই রাজা তাঁহার উপরে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ কর্ম্মভার অর্পণ করিয়া যান। এইভাবে রাজার ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র দেবেন্দ্রনাথের চিত্তকে বাল্যকাল হইতেই অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ রাজার চরিত্রের প্রভাবেই ফুটিয়া উঠেন; রাজার বিশিষ্ট সাধন-পন্থার কিম্বা তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের অনুশীলন করেন নাই। ফলতঃ দেবেন্দ্রনাথ রাজার সিদ্ধান্ত ও সাধন দুইই বর্জ্জন করেন। তত্ত্ব-সিদ্ধান্তে রাজা অদ্বৈতমতাবলম্বী ছিলেন। এ বিষয়ে রাজা শঙ্করের শিষ্য ছিলেন; তবে পরবর্ত্তী অদ্বৈতবাদীরা পঞ্চদশী প্রভৃতি গ্রন্থে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রাজা তাহাকে শঙ্করমতের সত্য অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেন না। পণ্ডিতবর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় কহেন যে রাজা নিজের তত্ত্ব-সিদ্ধান্তে শঙ্কর এবং রামানুজের মধ্যে একটা সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, রাজা যে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাঁহার গ্রন্থাদি পড়িয়া এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। মহর্ষি ভক্তিবাদী ছিলেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদের নামগন্ধমাত্র তিনি সহিতে পারিতেন না। রাজা তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। পরমহংস হরিহরানন্দ স্বামী রাজার গুরু ছিলেন। মহর্ষির

সাধন অন্য পথ ধরিয়া চলিয়াছিল। মহর্ষির ভক্তিসাধনের উপরে হাফেজ, সাদী প্রভৃতি পারসিক ভক্তদিগের খুব প্রভাব পড়িয়াছিল। ভগবদ্-প্রেমের কথা কহিতে কহিতে মহর্ষি সর্ব্বদাই ভাবে গদগদ হইয়া হাফেজ প্রভৃতির কবিতা আবৃত্তি করিতেন। ভক্তি সাধনায় মহর্ষি ইস্লামীয় ভক্তির সখ্যরসের বিশেষ অনুবর্ত্তন করিতেন। রাজার ভক্তি রসের পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছিল কিনা সন্দেহ। রাজার গ্রন্থাদিতে তাঁহার তত্ত্ব-জ্ঞানের দিক্‌টা যে পরিমাণে ফুটিয়াছে, ভক্তিসাধনের দিক্‌টা সে পরিমাণে ফোটে নাই। রাজা শাস্ত্র-প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া কিছুকালের মধ্যেই সরাসরি ভাবে এই প্রামাণ্য বর্জ্জন করেন।

রাজার সময়ে এবং তাঁহার পরেও কিছুদিন পর্য্যন্ত জোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মসমাজে "বেদান্ত-প্রতিপাদ্য" ব্রাহ্মধর্ম্মেরই উপদেশ হইত। তখনকার ব্রাহ্মসমাজ বেদ মানিতেন। ক্রমে বেদে ব্রহ্মোপাসনাই বিহিত হইয়াছে, অথবা বেদ দেববাদ এবং দেবোপাসনাও প্রচার করিয়াছে, মহর্ষির অন্তরে এ সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য মহর্ষি চারিজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বেদ পড়িবার জন্য কাশীতে প্রেরণ করেন। ইঁহারা বেদ পড়িয়া কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন যে বেদে কেবল ব্রহ্মবাদ উপদিষ্ট হয় নাই; দেববাদ ও দেবোপাসনাও উপদিষ্ট হইয়াছে। মানুষের রচিত অপরাপর গ্রন্থে যেমন সত্যের সঙ্গে অসত্য মিশিয়া রহে, বেদেও সেইরূপ সত্যাসত্য মিশিয়া আছে। এই কথা শুনিয়া মহর্ষি বেদের প্রামাণ্য বর্জ্জন করিলেন। আর এখানেও তিনি রাজার পথ ছাড়িয়া যান।

বেদে যে সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়া আছে, রাজা ইহা জানিতেন। শব্দার্থের দ্বারা বিচার করিলে উপনিষদেও যে দেবোপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাও রাজার অবিদিত ছিল না। প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরাও

এ সকল কথা জানিতেন। কিন্তু মীমাংসা-শাস্ত্রে এ সকল সত্ত্বেও যে ভাবে বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে খবরও রাজা রাখিতেন। বেদে যাহা কিছু আছে, তাহারই যে প্রামাণ্য-মর্য্যাদা আছে, এমন নহে। বেদে অনেক ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিষয়ের বর্ণনা আছে, এ সকলের শাস্ত্র-মর্য্যাদা নাই। কারণ শাস্ত্র দৃষ্ট বিষয়ের প্রমাণ দেয় না। যাহা চক্ষে দেখা যায়, চক্ষুই তার প্রমাণ। তাহার সম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন; তাহাতে শাস্ত্রের অধিকারও নাই। এই জন্য মীমাংসা "অদৃষ্টাত্মকং শাস্ত্রং" শাস্ত্রের এই সংজ্ঞা দিয়াছে। কিন্তু অদৃষ্টও ত কল্পিত হইতে পারে। আর সত্য হইলেও যাহা কিছু অদৃষ্ট অথবা ইন্দ্রিয়াতীত, তাহারই সঙ্গে আত্মার যে কোনও সম্বন্ধ থাকিবে, এমন নহে। এই প্রশ্ন উঠিলে শাস্ত্রের দ্বিতীয় সংজ্ঞা হয়—"মোক্ষপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং।" উত্তর-মীমাংসা প্রামাণ্য-শাস্ত্রের এই সংজ্ঞাই গ্রহণ করিয়াছেন। বেদ বা উপনিষদের যে সকল অংশ মুক্তির উপদেশ দেয়, তাহাই কেবল প্রামাণ্য-শাস্ত্র। আর অন্য যাহা কিছু তাহা অর্থবাদ মাত্র; অর্থবাদের শাস্ত্রপ্রামাণ্য নাই। উপনিষদ বারংবার কহিয়াছেন যে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে জীবের মুক্তি হয় না। সুতরাং বেদ এবং উপনিষদের যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার এবং ব্রহ্মোপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই কেবল প্রামাণ্য-শাস্ত্র। গোটা বেদ বা উপনিষদের শাস্ত্র হিসাবে কোনও প্রামাণ্য নাই। রাজা এই পথেই প্রাচীন মীমাংসকদিগের হাত ধরিয়া বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। এ পথে শাস্ত্র-প্রামাণ্যের সঙ্গে স্বানুভূতির প্রাধান্যের কোনও প্রকারের সাংঘাতিক বিরোধ নাই। মহর্ষি এ পথ ধরিলেন না। তিনি আধুনিক ইউরোপীয় যুক্তিবাদের প্রেরণায় সরাসরিভাবেই বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য বর্জ্জন করিলেন।

(৩)

আর এরূপ না করিলে মহর্ষি এ যুগের নাস্তিক্য এবং সন্দেহ-বাদকে ঠেকাইয়া রাখিতেও পারিতেন না। রাজার সিদ্ধান্ত এবং সাধনার বিচার করিতে হইলে, তিনি যে কালে জন্মিয়াছিলেন, সে কালের প্রকৃতি এবং প্রয়োজনের দ্বারাই তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। রাজা দেশের লোকের অন্তরে সন্দেহ জাগাইয়া তাহাদের মানসিক তমোকেই দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। সন্দেহ হইতেই বিচারের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। আর বিচারের মুখেই লোকের স্বাধীন চিন্তা জাগিয়া ওঠে। সন্দেহ—বিচার—সঙ্গতি—এবং সমন্বয়, ইহাই সত্যের প্রতিষ্ঠায় সনাতন পথ। রাজা এই পথটি ধরিয়াছিলেন। কি করিয়া লোকের গতানুগতিক বিশ্বাসটা নাড়িয়া চাড়িয়া দিতে হইবে, রাজার সমক্ষে ইহাই প্রধান সমস্যা ছিল। মহর্ষির সমক্ষে এই সমস্যা ছিল না।

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নাস্তিক্য এবং সন্দেহবাদের বান যখন ডাকিয়া উঠিল, সেই সময়েই মহর্ষি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাকে সন্দেহ এবং বিচার জাগাইবার কোনও চেষ্টা করিতে হইল না। কিন্তু কি করিয়া নিরঙ্কুশ যুক্তি-বাদের আক্রমণ হইতে ধর্ম্মের সত্য প্রাণবস্তুকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায়, মহর্ষির নিকট ইহাই সর্ব্বপ্রধান সমস্যা হইল। শিক্ষিত লোকেরা শাস্ত্র মানিতেন না। শাস্ত্র-প্রামাণ্য ব্যতীত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয় না বা হইতে পারে না, ইহারা এ কথা বিশ্বাস করিতেন না। যুক্তি যদি ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলে ধর্ম্মকে রাখিবার কোনও প্রয়োজনই নাই; ইহাই সে যুগের মূল কথা ছিল। সুতরাং ধর্ম্মসাধনে শাস্ত্রের কোনও স্থান আছে কি না, থাকিলে সে শাস্ত্রের প্রামাণ্য কি বা কতটুকু, শাস্ত্র-প্রামাণ্য বর্জ্জন করিলে ধর্ম্মসাধনের

বা ধর্ম্ম-সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠার কি ব্যাঘাত হয়, এ সকল প্রশ্নের বিচার তখন নিষ্প্রয়োজন ছিল। এ চেষ্টার সময় তখন আসে নাই। অকালে এই চেষ্টা করিতে গেলে, তাহার ফলে গুরুশাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করা দূরে থাকুক, ধর্ম্মের মর্য্যাদা পর্য্যন্ত নষ্ট হইত। এ অবস্থায় মহর্ষি গুরুশাস্ত্র বর্জ্জন করিয়াও শুদ্ধ যুক্তির উপরে ধর্ম্মসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্মসাধনকে গড়িয়া তুলিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত সমীচীন ও সময়োপযোগী হইয়াছিল, এ কথাটা স্বীকার করিতেই হইবে।

আজ এতদিন পরে দেশের নূতন অবস্থাধীনে মহর্ষির প্রথম জীবনের সিদ্ধান্ত ও সাধনের অপূর্ণতা দেখিতে পাইতেছি বটে। কিন্তু সে সময়ে মহর্ষি যদি রাজার মতন শাস্ত্রপ্রামাণ্য স্বীকার করিতেন এবং শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্তির একটা সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে আমাদের প্রথম যুগের ইংরাজীনবীশেরা কেহ বা একান্ত নাস্তিক্যবাদী হইয়া পড়িতেন, আর কেহ বা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতন খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। সে সময়ে মহর্ষি শাস্ত্র ছাড়িয়া কেবল যুক্তির উপরে ধর্ম্মকে গড়িতে যাইয়া এই দুইটা পথই বন্ধ করিয়া দেন। বাংলার নবযুগের নবীন সাধনার ইতিহাসে ইহাই মহর্ষির শ্রেষ্ঠতম কীর্ত্তি।

(৪)

কিন্তু এখানেও মহর্ষি একটা সমন্বয়েরই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি যুক্তি মানিয়াও ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই যে যুক্তির একমাত্র প্রতিষ্ঠা, ইহা স্বীকার করিলেন না। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের অপূর্ণতা দেখাইয়া য়ুরোপের আমদানী নিরঙ্কুশ যুক্তিবাদের হাত হইতে ধর্ম্মকে ও তত্ত্ব-সিদ্ধান্তকে বাঁচাইলেন। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ সম্পূর্ণ বস্তুজ্ঞান দিতে

পারে না। আমাদের মধ্যে জ্ঞাতা যে আত্মা তাহাতে জ্ঞানের কতকগুলি নিত্যসিদ্ধ ছাঁচ আছে। যতক্ষণ না ইন্দ্রিয়ানুভূত বস্তু-সকল আত্মার এই জ্ঞানের ছাঁচে যাইয়া ঢালাই হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় কোনও বস্তুজ্ঞান দিতে পারে না। জ্ঞানের এই ছাঁচগুলি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ধরা যায় না। ইহারা অতীন্দ্রিয় যে আত্মা তাহারই বৃত্তি। এই ছাঁচগুলি নিত্যসিদ্ধ। আত্মার ধর্ম্মরূপে নিত্যকাল এই আত্মাতে আছে। মহর্ষি জ্ঞানের এই নিত্যসিদ্ধ ছাঁচগুলিকে 'আত্মপ্রত্যয়' কহিয়াছেন। আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনে ইহাকে Intuition কহে। এই আত্মপ্রত্যয় বা Intuitionই মহর্ষির সাধনে ও সিদ্ধান্তে প্রচলিত যুক্তিবাদ এবং তাঁহার প্রকৃতিগত ভক্তিবাদের মধ্যে একটা সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় চিন্তা ও ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করিয়াই এই প্রত্যক্ষই যে একটা অতীন্দ্রিয় জগতের আশ্রয়ে কার্য্য করিতেছে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়; এবং এই সিদ্ধান্তের সাহায্যেই বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের দ্বারা অভিভূত মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাসকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। এখানে মহর্ষি আপনার সিদ্ধান্ত ও মতবাদের প্রতিষ্ঠায় ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় তত্ত্ববিদ্যারই আশ্রয় গ্রহণ করেন বলিয়া মনে হয়। আর ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম চিন্তার সঙ্গে তাঁহার যোগ না থাকিলে এবং সে চিন্তার দ্বারা তাঁহার মতবাদ সমর্থিত না হইলে সে সময়ে তিনি আমাদের নূতন ইংরাজী-নবীশদিগের চিত্তকে কিছুতেই ফিরাইতেও পারিতেন না।

বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য বর্জ্জন করিয়াও স্বদেশের প্রাচীন এবং সর্ব্বজনপূজ্য শাস্ত্রের পরিভাষার সাহায্যেই মহর্ষি নিজের স্বানুভূতিলব্ধ ধর্ম্মসিদ্ধান্ত লোকসমাজে প্রচার করেন। তাঁহার 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ উপনিষদের শ্রুতির দ্বারাই রচিত হয়। ইহার ফলে মহর্ষির নব যুগের

নবীন সাধনা প্রাচীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। সে সময়ে এদেশে উপনিষদাদির বহুল প্রচার হয় নাই। সাধারণ লোকের ত কথাই নাই, অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও বেদ-বেদান্তের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন না। সুতরাং মহর্ষির এই নূতন ধর্ম্ম যে প্রাচীন উপনিষদের ধর্ম্ম নহে, অতি অল্প লোকেই ইহা বুঝিয়াছিলেন। অন্যদিকে মহর্ষির সিদ্ধান্তের ও সাধনের সঙ্গে নূতন যুক্তিবাদের কোনও বিশেষ বিরোধও ফুটিয়া ওঠে নাই। এই যুক্তিবাদ যাঁহাদের চিত্তকে অধিকার করিতেছিল, তাঁহারা স্বদেশের প্রাচীন সাধনাতেই এমন একটা ধর্ম্মের সন্ধান পাইলেন, যাহা শুদ্ধ যুক্তি এবং বিচারের দ্বারাই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। এ ধর্ম্মে অতিপ্রাকৃত শাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই। ইহাতে অতিপ্রাকৃত শক্তিসম্পন্ন গুরুরও প্রাধান্য নাই। এখানে পৌরোহিত্য নাই। এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কোনও গ্রন্থে নহে। ইহার প্রামাণ্য কোনও বিশেষ ঈশ্বরাবতারের উপদেশেতেও নহে। এই ধর্ম্মের প্রামাণ্য মানুষের অন্তরে, সাধারণ মানব প্রকৃতির মধ্যে। সাধারণ মানুষে যাহা দ্বারা প্রতিদিন চারিদিকের বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতেছে, সেই জ্ঞানের মূল ভিত্তির উপরেই এই ধর্ম্মসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অথচ ইহা আধুনিক নহে। য়ুরোপীয় সাধনা সবে মাত্র এই পথের সন্ধান পাইয়াছে। কিন্তু এ পথ ভারতের অতি পুরাতন ও পরিচিত পথ। মধ্য-যুগের লোকে এই পথের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। মহর্ষি এই লুপ্ত পথের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। এই ভাবেই আমরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মকে দেখিয়াছিলাম। ইহার উপরে কতটা পরিমাণে যে আধুনিক য়ুরোপীয় চিন্তার ছাপ পড়িয়াছিল, সেকালে ইহা অতি অল্প লোকেই ধরিতে পারিয়াছিলেন। মহর্ষি নিজেই ইহা বুঝিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। মহর্ষির 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' প্রাচীন উপনিষদের শ্রুতির ভাষাতে প্রচারিত

হইয়াছিল বলিয়া যাঁহারা দেশের প্রচলিত পৌরাণিক ধর্ম্মের বাহ্য ক্রিয়াকলাপের বাহুল্য দেখিয়া স্বদেশের সাধনার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন, তাঁহারা মহর্ষির 'ব্রাহ্মধর্ম্মের' কল্যাণে ক্রমে সে শ্রদ্ধা ফিরিয়া পাইতে লাগিলেন। একদিন যাঁহারা নূতন শিক্ষার প্রভাবে ইউরোপের আগন্তুক সাধনাকে নিজেদের স্বদেশের সাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের চিত্ত ক্রমে স্বদেশের দিকে ফিরিতে আরম্ভ করিল। এই ভাবে ব্রাহ্মসমাজ আমাদের বর্ত্তমান স্বদেশাভিমানেরও প্রথম শিক্ষাগুরু হইয়া উঠেন। এই শিক্ষার ফলে যাঁহারা একদিন হিন্দুধর্ম্মকে মিথ্যার ও কুসংস্কারের জঞ্জাল বলিয়া ঘৃণার সঙ্গে বর্জ্জন করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারাই আধুনিক সভ্যতার সমক্ষে এই হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতে লাগিলেন। মহর্ষির সুযোগ্য শিষ্য এবং সহকর্ম্মী ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে কষিয়া হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। এই বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান যুগের যুগ-সাধনার প্রথম গুরু হইয়া আছেন।

বাংলার চিরদিনের বৈশিষ্ট্য স্বাধীনতা এবং মানবতা। বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজ যে পরিমাণে এই স্বাধীনতা এবং মানবতার আদর্শকে একদিন আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন এবং সর্ব্বস্ব পণ করিয়া জীবনে ও চরিত্রে এই আদর্শকে প্রত্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন আর কেহ সেরূপ করেন নাই। ইংরাজী শিক্ষা ভারতের সকল প্রদেশেই স্বল্প-বিস্তর প্রচারিত হইয়াছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনে বাংলা যে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, এ দাবীও করিতে পারা যায় কি না সন্দেহ। কোনও কোনও দিকে বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষা ও সাধনার অনুশীলনে বাংলা অপেক্ষা অধিক সফলতাই লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই শিক্ষা ও সাধনার

প্রাণবস্তু যে স্বাধীনতা এবং মানবতা তাহাকে বাংলা যেমন আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, অন্যান্য প্রদেশ সেরূপ ধরে নাই। ইহাও ব্রাহ্মসমাজেরই কার্য্য।

ব্রাহ্মসমাজ সত্য প্রতিষ্ঠায় শাস্ত্রগুরু বর্জ্জন করিয়া প্রত্যেক মানুষের সহজ বিচারবুদ্ধিকেই একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া প্রচার করিলেন। যাহা আমার বিচার-বুদ্ধিতে সত্য বলিয়া বোধ হয়, কেবল তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব। যাহা নিজের কাছে সত্য বলিয়া বোধ হয় না, তাহাকে কাহারও কথায় সত্য বলিয়া মানিয়া লইব না। শাস্ত্রের কথায়ও নহে ; গুরুর কথায়ও নহে। যাহা নিজের ধর্ম্মবুদ্ধিতে সাধু এবং সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, কেবল তাহারই অনুসরণ করিয়া চলিব। যে পথ নিজের ধর্ম্মবুদ্ধির নিকটে আত্মপ্রকাশ না করে, কল্যাণের পথ বলিয়া তাহাকে কখনই আশ্রয় করিব না। গুরুজনের আদেশেও নহে, সমাজের শাসনের ভয়েও নহে। সত্যাসত্যের এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের কষ্টি-পাথর আমার নিজের ভিতরেই আছে। সত্য এবং ধর্ম্মকে এই কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লইব। কাহারও কথায় না বুঝিয়া সত্য বা ধর্ম্মকে গ্রহণ করিব না। এ সকলই বাংলার প্রথম যুগের ব্রাহ্মসমাজের জীবনের এবং সাধনের মূল সূত্র হইয়াছিল। এই শিক্ষার প্রভাবেই আধুনিক বাংলা দেশে এমন একটা স্বাধীনতার প্রেরণা আসিয়াছিল, যাহা ভারতের আর কুত্রাপি আসে নাই। এই স্বাধীনতার আদর্শের অনুসরণ করিতে যাইয়া বাঙ্গালী যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছে এবং অম্লানবদনে যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, অন্য কোনও প্রদেশের লোকে সেরূপ করে নাই। এবং এই ত্যাগের সাধনায় ব্রাহ্মসমাজই আমাদের প্রথম গুরু হইয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সাধনার প্রথম দীক্ষাগুরু। কিন্তু এ সাধনা অসাধারণ শক্তিলাভ করে, দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের

নেতৃত্বাধীনে। বাংলার নবযুগের নবীন সাধনায় ব্রহ্মাসমাজের কার্য্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক ভাগ দেবেন্দ্রনাথ এবং আদি-ব্রাহ্মসমাজের, অন্য ভাগ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের। দেবেন্দ্রনাথ যে স্রোতকে প্রবর্ত্তিত করিয়া ধীর-গম্ভীরভাবে সুনির্দ্দিষ্ট খাতের ভিতর দিয়া চালাইবার চেস্টা করিতে-ছিলেন, কেশবচন্দ্রের অলোকসামান্য প্রতিভা সকল বাঁধন ভাঙ্গিয়া সেই স্রোতকে চারিদিকে উদ্দাম তরঙ্গভঙ্গ তুলিয়া ছড়াইয়া দিয়াছিল। বাংলার আধুনিক স্বাধীনতার সেই সংযম অসংযমের উন্মাদিনী কাহিনী এক অপূর্ব্ব বস্তু। এই স্বাধীনতার ইতিহাসে কেশবচন্দ্র এক নূতন অধ্যায়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলার নবযুগের কাহিনী বর্ণনা করিতে যাইয়া এ পর্য্যন্ত আমি বহুল পরিমাণে শ্রুতির হাত ধরিয়া চলিয়াছি। রাজাকে ত দেখিই নাই। প্রথম্ যুগের ইংরাজীনবীশদিগের কাহাকেও কাহাকেও দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা অতীতের স্মৃতিরূপেই আমাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। মহর্ষির প্রথম জীবনের কাহিনীও শ্রুত, প্রত্যক্ষ নহে। কেশবচন্দ্রের সময় হইতেই এই যুগস্রোতের মাঝখানে আসিয়া পড়ি। সুতরাং এখন হইতে এই কথা বহুলপরিমাণে আমার প্রত্যক্ষের উপরই গড়িয়া উঠিবে।

পঞ্চম কথা

ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মানন্দ

(১)

বাংলার নবযুগের মূলমন্ত্র স্বাধীনতা ও মানবতা। ব্রাহ্ম-সমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্রেই এই স্বাধীনতার ও মানবতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে চেস্টা করেন, জীবনের সকল বিভাগে সর্ব্বতোভাবে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যান নাই। এ কাজটা করেন কেশবচন্দ্র। এইজন্যই বাংলার নবযুগের ইতিহাসে কেশবচন্দ্র একটা অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

আটত্রিশ বৎসর হইল কেশবচন্দ্র সংসারলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এই আটত্রিশ বৎসরের মধ্যে আমাদের শিক্ষিত সমাজে যাঁহারা জন্মিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা কেশবচন্দ্রকে ভাল করিয়া জানেন না। এই আটত্রিশ বৎসরের মধ্যে এদেশের চিন্তা ও কর্ম্মের উপরে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রত্যক্ষ প্রভাবও অত্যন্ত হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। ইহার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠাও কমিয়াছে। প্রথম যৌবনে কেশবচন্দ্র যে চিন্তা ও সাধনার ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা একরূপ শুকাইয়া গিয়াছে। কেশবচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই শুকাইতে আরম্ভ করে। তাঁহার শেষ জীবনের চিন্তা ও সাধনা অন্য খাতে প্রবাহিত হইয়া নিজেই সেই আদি স্রোতকে ক্ষীণ করিয়া তুলে। কেশবচন্দ্রের জীবদ্দশায়, বিশেষতঃ তাঁহার প্রথম-যৌবনে, যে সকল সমস্যা শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্তকে অভিভূত করিয়াছিল, আজিকার শিক্ষিত সমাজের

সমক্ষে সে সকল সমস্যা নাই। এই সকল কারণে আজিকালিকার লোকের পক্ষে কেশবচন্দ্রের সাধনার যথার্থ মূল্য গ্রহণ অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এখনকার শিক্ষিত লোকে কেশবচন্দ্রের নামমাত্রই জানেন, তাঁহার আলোকসামান্য বাগ্মিতার কথাও লোক-পরম্পরায় শুনিয়াছেন; কিন্তু বাংলার বর্ত্তমান চিন্তা ও সাধনা কতটা পরিমাণে যে কেশবচন্দ্রের কাছে ঋণী, ইহা কল্পনাও করিতে পারেন না।

কেশবচন্দ্রের জন্মকালে এ দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম ও সমাজ মানুষের স্বাধীনতাকে হরণ করিয়া তাহার মনুষ্যত্বকে খাটো করিয়া রাখিয়াছিল। ধর্ম্মের সঙ্গে ধার্ম্মিকের প্রত্যক্ষ অনুভবের কোনও সজীব সম্পর্ক ছিল না। কলের পুতুলের মতন মানুষ ধর্ম্মের আদেশ মানিয়া চলিতেছিল। গীতা কহিয়াছেন :—

চতুর্ব্বিধাঃ ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুনঃ
আর্ত্তঃ জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।

চারি শ্রেণীর সুকৃতিসম্পন্ন লোকে, হে অর্জ্জুন, আমার ভজনা করেন। প্রথম আর্ত্ত, দ্বিতীয় জিজ্ঞাসু, তৃতীয় অর্থার্থী, এবং চতুর্থ জ্ঞানী। এই চারি শ্রেণীর উপাসকের মধ্যে সমাজে সে সময়ে জ্ঞানী এবং জিজ্ঞাসু ছিলেন না, বলিলেই চলে। আর্ত্ত, অর্থাৎ আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় যাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন হন, এবং অর্থার্থী, অর্থাৎ যাঁহারা কোনও ঈপ্সিত লাভের লোভে দেবতার ভজনা করেন, এই দুই শ্রেণীর উপাসকেই তখন যা কিছু আন্তরিক ভক্তিভরে ধর্ম্মাচরণ করিতেন। ধর্ম্ম যেখানে সত্য হয়, সেখানে মানুষকে সৎসাহসী এবং শক্তিশালী করিয়া তুলে। সত্য ধর্ম্ম লাভ করিলে মানুষ ভয় ভাবনার অতীত হইয়া যায়।

স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ

এই সত্য ধর্ম্মের স্বল্পপরিমাণও পাইলে ধার্ম্মিক মহৎ-ভয় হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন। কিন্তু সে সময়ের ধর্ম্ম ভয়ের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। সংসারের ক্ষতির ভয়ই সে ধর্ম্মের প্রেরণা ছিল। মানুষ এইরূপে সর্ব্বদা ভয়ের তাড়নায় চলিতে বাধ্য হইলে তাহার জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভক্তি, সকলই অত্যন্ত পঙ্গু হইয়া পড়ে। ভয়ে মানুষকে তামসিক করিয়া তুলে। কেশবচন্দ্রের জন্মকালে এই তামসিকতাতেই বাংলার সমাজ আচ্ছন্ন ছিল।

ইহার পূর্ব্বেই ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হয়। কেশবচন্দ্রের বাল্যজীবনে সেই শিক্ষার ফলে ইংরাজীনবীশ বাঙ্গালীদিগের মধ্যে চারিদিকে একটা অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত প্রবাহিত হয়। এই স্রোতের মাঝখানেই কেশবচন্দ্রের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। কন্তু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের সাধনের বলে চারিদিকের এই অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা কেশবচন্দ্রকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কেশবচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষেরা বৈষ্ণব ছিলেন। পূর্ব্বপুরুষদিগের ভক্তিসাধনের ফলেই কেশবচন্দ্র প্রথম যৌবনের চারিদিকের স্বেচ্ছাচার এবং অনাচারের মধ্যে নিজেকে সংযম ও সদাচারের বেষ্টনীর ভিতরে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

বাংলার বৈষ্ণব-সাধনার দুইটী ধারা। এক বৈধী ভক্তির ধারা; দ্বিতীয় ধারাকে রাগানুগা বা রাগাত্মিকা ভক্তিধারা কহে। বাংলার ভদ্রসমাজের বৈষ্ণবেরা বৈধী ভক্তির সাধনই করিতেন। বৈধী ভক্তি আচার-বিচার মানিয়া চলে। ভদ্র শ্রেণীর বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা এইজন্য মনু, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতির অনুসরণ করিয়া চলেন। ভক্তিপন্থী হইলেও ইঁহারা প্রচলিত মায়াবাদের প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারেন না। এইজন্য বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও কখনও কখনও কঠোর সংসার-বৈরাগ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বৈজিকগুণে কেশবচন্দ্রও যৌবনে

পদার্পণ করিতে না করিতে অত্যন্ত সংসারবিরাগী হইয়া উঠেন। কেশবচন্দ্র কহিয়াছেন যে এই সময়ে তিনি তাঁহার প্রাণের ভিতরে এই বাণী শুনিতে পাইলেন —"ওরে, তুই সংসারী হ'স না, সংসারের নিকট মাথা বিক্রেয় করিস না ; কলঙ্ক, পাপ এ সকল ভারী কথা ; আপাততঃ আমোদ ছাড় ; আমোদের সূত্র ধরিয়াই অনেকে নরকে যায়।" কেশব তখন আমোদকে বলিলেন,—"তুই শয়তান, তুই পাপ", বিলাসকে বলিলেন,—"তুই নরক, যে তোর আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই মৃত্যুগ্রাসে পড়ে।" এমন কি শরীরকে বলিলেন, "তুই নরকের পথ, তোকে আমি শাসন করিব, তুই মৃত্যুমুখে ফেলিবি।" এই অদ্ভুত বৈরাগ্যই কেশবচন্দ্রকে তাঁর প্রথম যৌবনে বাংলার ইংরাজী-নবীশ সমাজের অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু এইজন্য ইংরাজী শিক্ষা যে প্রবল যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য জাগাইয়াছিল, তাহার প্রভাব হইতে কেশবচন্দ্রকে বাঁচাইতে পারে নাই ; বরঞ্চ তাঁহার মধ্যে এই নূতন স্বাধীনতার আদর্শকে ধর্ম্মের আদর্শের দ্বারা সংযত করিয়া আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল।

ইংরাজী শিক্ষা যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শ জাগাইয়া তুলে, কেশব-চন্দ্র তাহারই মধ্যে একটা প্রবল ধর্ম্মের প্রেরণা সঞ্চারিত করেন। ইতিপূর্ব্বে আমাদের ইংরাজীনবীশেরা নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাকেই তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্যরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই স্বাধীনতার সঙ্গে স্বেচ্ছাচারিতার বিশেষ পার্থক্য ছিল না। ভাঙ্গাই তাঁহাদের জীবনের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। এরূপ ভাঙ্গার কাজ কিছুদিন এবং কিয়দ্দূর পর্য্যন্তই চলিতে পারে ; বেশী দিন বা বেশী দূরে যাইতে পারে না। নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা-লিপ্সা প্রায় কখনই নিষ্কাম হইতে পারে না ; সর্ব্বদাই ফলাপেক্ষী হইয়া থাকে। এইজন্য এই স্বাধীনতার মধ্যে ভাল করিয়া ত্যাগের শক্তি জাগিতে পারে না। রাষ্ট্রীয়

স্বাধীনতার লোভে লোকে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে, বটে। কিন্তু এই স্বাধীনতার সংগ্রামের ভিতরে একটা বলবতী বৈরিতা জাগিয়া রহে। রাজশক্তির অত্যাচারের দ্বারাই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা জাগ্রত হয়। এই স্বাধীনতার সংগ্রামে অত্যাচারী রাজশক্তির উপরে প্রতিহিংসা নিবার আকাঙ্ক্ষা খুব প্রবল হইয়া রহে। এই প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির মাদকতাতেই মানুষকে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রণোদিত করে। যে স্বাধীনতার সংগ্রামের ভিতরে এরূপ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি থাকে না, সে স্বাধীনতার প্রেরণা ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে আসিলেই কেবল মানুষকে ত্যাগের পথে লইয়া যাইতে পারে। অন্যথা এই স্বাধীনতার গতিবেগ সামান্য বাধাবিপত্তি পাইলেই থামিয়া যায়। ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগের মধ্যে যে স্বাধীনতার আদর্শ জাগাইয়াছিল, ধর্ম্মের প্রেরণা না পাইলে তাহাও প্রাচীন সমাজের তাড়নায় অল্পতেই থামিয়া যাইত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ইহা হইয়াছে। যেখানেই এই স্বাধীনতার অন্তরালে ধর্ম্মের প্রেরণা ছিল না, সেইখানেই এই সংগ্রাম বাধিতে না বাধিতেই থামিয়া গিয়াছে; সেইখানেই সমাজশক্তি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষাকে সহজে চাপিয়া মারিয়াছে। বোম্বাই এবং মাদ্রাজের আধুনিক সমাজসংস্কারের ইতিহাসে ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বাংলা দেশেও যে পাওয়া যায় নাই, তাহা নহে। আমাদের মধ্যেও এমন দেখা গিয়াছে যে শুদ্ধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক লোকে প্রাচীন সমাজের সমক্ষে দু'চারদিন বীরদর্পে বাহ্বাস্ফোট করিয়া পরে বৃহৎ ত্যাগের আহ্বান যখন আসিল, তখন রণে ভঙ্গ দিয়া নিঃশেষে সেই সমাজের নিকটেই আত্ম-বিক্রয় করিয়াছেন। ধর্ম্মের প্রেরণা ব্যতীত সচরাচর এই তাগের শক্তি জাগে না। আমাদের নব্যসমাজে ইংরাজী শিক্ষা ও য়ুরোপীয় সাধনার সংস্পর্শে যে স্বাধীনতার আদর্শ ফুটিয়াছিল, তাহার মধ্যে ধর্ম্মের প্রেরণা

সঞ্চার করিয়া কেশবচন্দ্রই বিশেষভাবে একটা অসাধারণ ত্যাগের শক্তি জাগাইয়া তুলেন। এই ত্যাগের দ্বারাই বাংলার নবযুগের সাধনা মহীয়সী হইয়া আছে। কেশবচন্দ্র সমসাময়িক ইংরাজী শিক্ষিত দলের মধ্যে একটা জ্বলন্ত অগ্নিশিক্ষার মত আসিয়া পড়িলেন। সেই আগুনে বাংলার শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী যুবক সম্প্রদায় একেবারে জ্বলিয়া উঠিল, এবং এই অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া বাংলার নবযুগের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল।

(২)

ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী শাসনের ফলে আমাদের প্রথম যুগের ইংরাজীনবীশদিগের মতি-গতি নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে; এবং ইঁহারা স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার প্রতি শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া বিদেশী সভ্যতা ও সাধনার দিকে ছুটিতে আরম্ভ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইঁহাদের মতি-গতিকে সংযত করিয়া কিয়ৎপরিমাণে স্বদেশাভিমুখীন করেন। বাংলার নবযুগের ইতিহাসে ইহাই মহর্ষির প্রধান কীর্ত্তি। মহর্ষির প্রকৃতির মধ্যে একদিকে যেমন একটা বলবতী আস্তিক্যবুদ্ধি ছিল, অন্যদিকে সেইরূপ একটা দুর্জ্জয় রক্ষণশীলতাও ছিল। ইংরাজী শিক্ষাপ্রভাবে দেশে যে বিপ্লবের বাণচাল ডাকিয়া উঠে, তাহাতেও মহর্ষির এই প্রকৃতিগত রক্ষণশীলতাকে নষ্ট করিতে পারে নাই। ধর্ম্ম-বুদ্ধির প্রেরণায় মহর্ষি যখন দেশ-প্রচলিত ধর্ম্ম-সংস্কারকে প্রকাশ্যভাবে বর্জ্জন করিলেন, প্রচলিত প্রতিমা পূজাদিকে অসত্য ও অধর্ম্ম বলিয়া ত্যাগ করিলেন, তখনও এই রক্ষণশীলতা তাঁহাকে ত্যাগ করিল না। যাহা নিতান্ত না ছাড়িলে নয়, তাহাই তিনি ছাড়িলেন। প্রাচীন ও প্রচলিতের যতটুকু রক্ষা করা সম্ভব হয় প্রাণপণে তিনি তাহা রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। তাঁহার চারিদিকের ইংরাজীনবীশেরা যখন

ধর্ম্মে এবং সমাজে প্রাচীন এবং প্রচলিতকে নির্ম্মমভাবে ভাঙিতে চুরিতে আরম্ভ করেন, তখনও মহর্ষি তাঁহার প্রকৃতিনিহিত এই রক্ষণশীলতার প্রেরণায় তাঁহার ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে রক্ষা করিয়া যতটা সম্ভব দেশের প্রাচীন ও প্রচলিত রীতিনীতিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিলেন। মহর্ষি পৌরাণিক দেবদেবীর উপাসনা পরিহার করিয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিলেন বটে, কিন্তু জাতিভেদ একেবারে পরিহার করিলেন না। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে আদি ব্রাহ্ম-সমাজে ব্রাহ্মণেরাই কেবল আচার্য্যের কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। এ সকল ব্রাহ্মণ আচার্য্যদিগের গলায় উপবীত থাকিত। ইঁহারা হিন্দু-সমাজের শাসন মানিয়া চলিতেন। বিবাহাদি সংস্কারে শালগ্রাম এবং ব্রাহ্মণ ডাকিতেন। তথাকথিত পৌত্তলিকতার সঙ্গে ইঁহারা সকল সম্বন্ধ কাটিয়া দেন নাই। এইভাবে সমাজ-সংস্কার এবং ধর্ম্ম-সংস্কারের মধ্যে একটা ব্যবধান জাগিয়া রহিল। এইরূপ ব্যবধান এদেশে চিরদিনই ছিল। সকল হিন্দুই যে দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাহা নহে। পণ্ডিতেরা দেবদেবীর উপাসনা বা প্রতিমা-পূজা যে কেবল নিকৃষ্ট অধিকারীর জন্যই বিহিত হইয়াছে, এবং ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনাই যে শ্রেষ্ঠতম উপাসনা, এ সকল কথা চিরদিনই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। দণ্ডীসন্ন্যাসীরা এ সকল নিকৃষ্ট উপাসনাতে প্রবৃত্ত হন না। ইহাতে তাঁহাদের কোনও প্রত্যবায়ও হয় না। এজন্য লোক-সমাজে তাঁহাদিগকে নিন্দনীয় হইতে হয় না। মহর্ষি যে বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন, হিন্দু-সমাজের সঙ্গে তাহার বিশেষ কোনও বিরোধ ছিল না। নিতান্ত অজপল্লীগ্রামে ও জ্যেষ্ঠদিগের মুখে এই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনার সাধুবাদ শুনিয়াছি। মহর্ষির ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহাদের কোনও বিরোধ ছিল না। তাঁহাদের সঙ্গে বিরোধটা জাগিয়া উঠে ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া নহে, কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের সামাজিক আদর্শ

লইয়া। মহর্ষির সময়ে এ বিরোধটা ভাল করিয়া জাগে নাই। জাগে কেশবচন্দ্রের সময়ে। আর এই বিষয়ে কেশবচন্দ্রের প্রথম বিরোধ হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে।

কেশবচন্দ্র প্রথমে মহর্ষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আদি ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করেন। মহর্ষি নানাদিক দিয়া তাঁহার প্রকৃতিনিহিত রক্ষণশীলতার বাঁধনকে পর্য্যন্ত আল্‌গা করিয়া দেন। তখন পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্ম-সমাজের বেদীতে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাহারও বসিবার অধিকার ছিল না। কেশবচন্দ্রের প্রতিভা ও গুণে মোহিত হইয়া মহর্ষি তাঁহাকে ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যপদে বরণ করেন। ১৭৮৪ শকের ১লা বৈশাখে নববর্ষের উপাসনা উপলক্ষে মহর্ষি কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত করেন। ব্রাহ্ম-সমাজের আয়তন ক্রমশঃই বাড়িতেছিল। বাংলাদেশের নানাস্থানে ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। বাংলার বাহিরে ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্ম উপাসকমণ্ডলী গড়িয়া উঠিতেছিল। এ অবস্থায় মহর্ষি দেখিলেন, তাঁহাকে যদি কেবল কলিকাতায় আবদ্ধ থাকিতে হয়, তাহা হইলে সকল সমাজে সম্যকরূপে তত্ত্বধান হয় না। তিনি বলিলেন,—

"যেখানে যেখানে ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে আমার স্বয়ং যাইবার প্রয়োজন। আমি এখন আর কলিকাতায় বদ্ধ থাকিতে পারি না, সুতরাং এখানে একটী আচার্য্যের প্রয়োজন হইতেছে, অতএব এক্ষণে আমি আহ্লাদপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দকে কলিকাতার ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি।"

ব্রহ্মানন্দকে সম্বোধন করিয়া মহর্ষি বলিলেন,—

"শ্রীমান্ কেশবচন্দ্র! তুমি মহদ্ভার গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমি জানিতেছি যে তাহাতে তোমার দ্বারা এ ধর্ম্মের অশেষ উন্নতি হইবে। তুমি এই গুরুভার অপরাজিতচিত্ত হইয়া অহোরাত্র বহন

করিবে। কিসে কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজ উন্নত হয়, কিসে ব্রাহ্মদিগের মনের মালিন্য দূর হয়, এ প্রকার যত্ন করিবে। অন্য কোনও প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ কি নিন্দাবাদ করিবে না, কিন্তু যাহাতে সকল ব্রাহ্ম-দিগের মধ্যে ঐক্য বন্ধন হয়, এমত উপদেশ দিবে। আপনার আন্তরিক ভাব অকপট হৃদয়ে নির্ভয়ে ব্যক্ত করিবে, সদা নম্র স্বভাব হইবে। বৃদ্ধদিগকে সমাদর করিবে। যাহার যে প্রকার মর্য্যাদা তাহাকে সেই প্রকার মর্য্যাদা দিবে। তুমি যে কর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছ, এ অতি দুরূহ কর্ম্ম। কিন্তু অল্পবয়স্ক মনে করিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিও না। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা রামমোহন রায় ধর্ম্মের জন্য ষোড়শ বৎসরে দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। সেই ষোড়শ বৎসরে তিনি যে ভাব দ্বারা নীয়মান হইয়াছিলেন, সেই ভাব তাঁহার হৃদয়ে চিরদিনই ছিল। প্রথম বয়সে যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তাঁহারা কদাপি অবসন্ন হন না। তুমি আপনার ইচ্ছার সহিত প্রাণ হৃদয় মন সকলি ঈশ্বরেতে সমর্পণ কর। না ধনের দ্বারা, না প্রজার দ্বারা, কিন্তু কেবল ত্যাগের দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে ক্ষুব্ধ হইবে না। কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ প্রাণপণে রোপণ করিবে।

"এক্ষণে তুমি আপনার আত্মাকে সেই অমৃতসাগরে নিমগ্ন কর। সেই জগতপ্রসবিতা পরমদেবতার বরণীয় শক্তি ধ্যান কর, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

"ঈশ্বর তোমাকে এক্ষণে আপনার অমৃতসলিলে অভিষিক্ত করিতেছেন। তাঁহার আদেশে আমিও তোমাকে এই আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিতেছি। তুমি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদ ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে শুভ ফল বিস্তার কর।

"এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মগ্রন্থ গ্রহণ কর। যদিও হিমালয় চূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হয়, তথাপি ইহার একটীমাত্র সত্য বিনষ্ট হইবে না। যদি দক্ষিণ সাগর শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি ইহার একটি সত্যেরও অন্যথা হইবে না। যে প্রকারে পূর্ব্বে অগ্নিহোত্রীরা অগ্নিকে রক্ষা করিতেন, তুমি এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে তদ্রূপ রক্ষা করিবে। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা অধ্যাবধি এই কলিকাতার আচার্য্যের প্রতি অনুকূল হইয়া ইঁহার কথা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অবশ্যই গৌরববৃদ্ধি হইবে।"

(৩)

কিন্তু মহর্ষির সঙ্গে কেশবচন্দ্রের এই প্রগাঢ় স্নেহের সম্বন্ধ সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে ক্রমে গুরুতর মতভেদ দাঁড়াইয়া গেল। মহর্ষি ব্রহ্মসমাজকে কেবল একটা ধর্ম্মসাধনের কেন্দ্র করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সমাজে কোনও প্রকারের সাংঘাতিক বিপ্লব আনয়ন করিতে চাহেন নাই। কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার অনুচরেরা জীবনের সকল বিভাগে এই নূতন সাধনাকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য অগ্রসর হয়েন। ইঁহারা সকলের আগে প্রচলিত জাতিভেদ তুলিয়া দিতে চা'ন। জাতিভেদের চিহ্নস্বরূপ উপবীতধারণ এই সংস্কৃত ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মেরা উপবীত পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৬০ ইংরাজীতে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে "সঙ্গত সভা" নামে একটী নূতন সভার প্রতিষ্ঠা হয়। এই সভাতে ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মজীবন গঠন সম্বন্ধে সকল বিষয়ের আলোচনা হইত। এই আলোচ্য-বিষয়ের তালিকায় "উপাসনা, আত্মপরীক্ষা, আমোদ, নির্ভর, সত্য বাক্য, পৌত্তলিকতা, পবিত্রতা, কর্ত্তব্যশ্রেণী, লোকভয়, ত্যাগস্বীকার" প্রভৃতি একুশটি বিষয়ের উল্লেখ আছে। "সঙ্গতে"র কার্য্যবিবরণে লেখা আছে :—

"যে কর্ম্ম উচিত বলিয়া বোধ হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, সকল আকর্ষণ অতিক্রম করিবে, সকল ত্যাগ স্বীকার করিবে, কোন যন্ত্রণাকে যন্ত্রণা বোধ করিবেনা।" "যে ব্যক্তি এক প্রকার হইয়া আপনাকে অন্যপ্রকার দেখায়, সেই আত্মাপহারী চৌর কর্ত্তৃক কি পাপ কৃত না হয়।" "কেবল বাহ্য পৌত্তলিকতা যে ব্রাহ্মধর্ম্ম নিষেধ করিতেছেন এমত নহে, ইহা পরিত্যাগ করাও সহজ, আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা অতীব ভয়ানক। বিষয় সুখাভিলাষ, মানাকাঙ্ক্ষা, কাম-ক্রোধ-লোভ-দ্বেষ-ঈর্ষা প্রভৃতি প্রবৃত্তিসকলের শরণাগত অনুগত দাস হইয়া তাহাদের সেবা ও উপাসনা করাকে আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা বলে"। "স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত হওয়াই সংসার হইতে মুক্ত হওয়া।"

এই সকল আলোচনার ফলে দলে দলে ব্রাহ্ম যুবকেরা প্রাচীন সমাজের সঙ্গে সকল প্রকারের সম্বন্ধ কাটিতে আরম্ভ করিলেন। অনেকে পরিবার পরিজন এবং বিষয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা অশেষ প্রকারের শারীরিক নির্য্যাতন সহ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ কেবল ব্যক্তিগত ভাবেই ব্রহ্মোপাসনা করিতেছিলেন। এখন অদম্য উৎসাহ সহকারে সমাজ-সংস্কারব্রত গ্রহণ করিলেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রচার, বিধবা বিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। ইহাতে মহর্ষির প্রকৃতিগত রক্ষণশীলতাতে আঘাত পড়িল। প্রথম প্রথম কেশবচন্দ্রের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া তিনি নবীন ব্রাহ্মদিগের এ সকল সংস্কার চেষ্টা সহিয়া যাইতে-ছিলেন, কিন্তু ক্রমে আর সহিতে পারিলেন না। এতদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাদিতে মহর্ষির অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী একাধিপত্য ছিল। নবীন ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকে ব্রাহ্মসাধারণের মতানুযায়ী পরিচালনা করিবার জন্য এক ব্রাহ্ম-প্রতিনিধি সভার প্রতিষ্ঠা

করিলেন। ছোট বড়, যুবক ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য পরিচালনায় প্রত্যেক ব্রাহ্মের সমান অধিকার, এই গণতন্ত্র অদর্শের উপরে ইঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে গড়িয়া তুলিবার জন্য উদ্যত হইলেন। মহর্ষির একাধিপত্য নষ্ট হইবার উপক্রম হইল। যে সকল ব্রাহ্ম কেবল ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে আবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছিলেন, হিন্দুসমাজের সঙ্গে কোনও প্রকারের বিরোধ বাধাইতে চাহেন নাই, তাঁহারা নবীন ব্রাহ্মদিগের উদ্যমে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। মহর্ষির রক্ষণশীলতাকে অশ্রয় করিয়া ইঁহারা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একটা বিরোধের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টি ছিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সকল সম্পত্তি তাঁহার তত্বাবধানেই ন্যস্ত ছিল। ট্রাষ্টিরূপে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও অন্যান্য কর্ম্মচারী নিয়োগের অধিকার তাঁহার হাতেই ছিল। তিনি সে সকল অধিকার মাঝখানে ব্রাহ্ম প্রতিনিধি-সভার হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এখন আবার সে অধিকার নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন। উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য থাকিতে পারিবেন না, নবীন ব্রাহ্মেরা এই প্রস্তাব আনিলেন। মহর্ষি সম্পূর্ণভাবে ইহাতে সায় দিতে পারিলেন না। উপবীতধারী ব্রাহ্মণকে তিনি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে বরণ করিলেন। ইহার ফলে কেশবচন্দ্র প্রমুখ নবীন ব্রাহ্মগণ আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া পড়িয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে এক নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজই বাংলা দেশে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের একটা প্রবল চেষ্টা জাগাইয়া তুলেন।

মহর্ষির নেতৃত্বাধীনে আদি বা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে স্বাধীনতার সংগ্রামটা ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। মহর্ষির চরিত্র, সাধনা এবং বৈষয়িক পদমর্য্যাদার প্রভাবে সেখানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ভাল করিয়া

মাথা তুলিবার অবসর পায় নাই। মহর্ষিই ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতেন। কখনও কখনও বিপন্ন ব্রাহ্মদিগকেও অন্নঋণে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এ সকল কারণে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্যক পরিমাণে আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। এমন কি ধর্ম্মসাধনেও প্রত্যেক সাধকের স্বাধীন যুক্তিই যে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের একমাত্র কষ্টিপাথর, ইহাও ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পায় নাই। বেদাদি প্রাচীন শাস্ত্রের প্রামাণ্য বর্জ্জন করিয়া মহর্ষি তাঁহার রচিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থখানিকে ব্রাহ্ম সাধকদিগের শাস্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য পদে বরণ করিবার সময় মহর্ষি যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহাতে ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

"যদিও হিমালয় চূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হয়, তথাপি ইহার (অর্থাৎ এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের) একটি মাত্র সত্য বিনষ্ট হইবে না। যদি দক্ষিণ সাগর শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি ইহার একটি সত্যেরও অন্যথা হইবে না।"

এখানেই মহর্ষি তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থকে কি চক্ষে দেখিতেন, ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার দ্বারাও ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও বিবেকের স্বাধীনতা অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আতিশয্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সে সময়ের খৃষ্টীয়ান পাদরী ডাইসন (Dyson) সাহেব কহিয়াছিলেন যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম আর কিছুই নহে—কেবল conjugation of the verb to think মাত্র; অর্থাৎ I think, we think, thou thinkest, you think, he thinks, they think—ইহারই নাম ব্রাহ্মধর্ম্ম। এককথায় প্রত্যেক ব্যক্তির বিচার-বুদ্ধি ব্যতীত এই ধর্ম্মের আর কোন প্রামাণ্য নাই।

কথাটা সম্পূর্ণরূপে সত্য ছিল বটে। কিন্তু যে কালে জগতের সকল ধর্ম্মেই মানুষের বিচার বুদ্ধিকে শাস্ত্রের বন্ধনে একেবারে বাঁধিয়া রখিয়াছিল, সে সময়ে ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধির স্বাধীনতা প্রচার করা অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ইহাও মানিতেই হইবে। এদেশে এই শাস্ত্রানুগত্যের ফলে ধর্ম্মসাধনের সঙ্গে সাধকের আন্তরিক অনুভবের একটা বিরাট ব্যবধান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ব্যবধান নিবন্ধন লৌকিক ধর্ম্মের শক্তি ও সজীবতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ধর্ম্ম মানুষকে মনুষ্যত্বের উচ্চতম শিখরে তোলা দূরে থাকুক, নানা দিক দিয়া মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিতই করিতেছিল। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যে কাজটা করিতে উদ্যত হন, তাহা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল, সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নবীন ব্রাহ্মদিগের জীবনে ধর্ম্মকে কেবল একটা খেয়ালরূপেই গড়িয়া তুলে নাই, জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ্যরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইঁহারা নিজে যাহা সত্য বলিয়া মনে করিতেন তাহার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। কত দারিদ্র্য, কত নির্য্যাতন, আত্মীয় স্বজনবর্গের সঙ্গে কি দুর্ব্বিষহ বিচ্ছেদ-যাতনা, ইঁহাদিগকে নিজেদের মতবাদের জন্য সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা মনে করিলে এই সকল স্বাধীনতার সাধকদের প্রতি অন্তর শ্রদ্ধাভরে অবনত হইয়া পড়ে। এ খেলা ছিল না। ইঁহারাই বাংলা দেশে স্বাধীনতার জন্য অসাধারণ ত্যাগের শক্তি জাগাইয়া তুলেন।

ষষ্ঠ কথা

ব্রাহ্মসমাজ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম

প্রথম অধ্যায়

ইংরাজী শিক্ষার ফলে বাংলার নব্যশিক্ষিত সমাজে যে স্বাধীনতার আদর্শ জাগিয়া উঠে, ব্রাহ্মসমাজই সর্ব্বপ্রথমে সেই আদর্শকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। এই কারণেই পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব এতটা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের মতবাদ যে বেশী লোকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন নহে। ব্রাহ্মরা যে পরমার্থ সাধনের চেষ্টা করিতেছিলেন, দেশের শিক্ষিত সাধারণে এই সাধনার মূল্য ও মর্য্যাদা যে ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন, এ কথাও বলা যায় না। ফলতঃ সে সময়ে আমাদের শিক্ষিত সমাজে অসংযত যুক্তিবাদ এবং সন্দেহবাদই বেশী প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন। যাঁহারা এতটা বাড়াবাড়ি করিতেন না, তাঁহারাও উপাসনা ও প্রার্থনাদির আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না। ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক লোকই নিতান্ত উদাসীন ছিলেন। এ অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট মতবাদের উপরে শিক্ষিত জনসাধারণের যে খুব একটা শ্রদ্ধা ছিল, এমন বলা যায় না। অথচ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সাধারণভাবে প্রায় সকল শিক্ষিত লোকেরই গভীর সহানুভূতি দেখা যাইত। আর এই সহানুভূতির মূল কারণ, ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীনতার আদর্শ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়েই এই স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ হয়। সেকালের ইংরাজী-নবীশেরা হিন্দুধর্ম্মের প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডকে কুসংস্কার বলিয়া মনে করিতেন। দেবদেবীর উপাসনাকে এবং বিশেষভাবে প্রচলিত প্রতিমাপূজাকে মিথ্যা এবং মানুষের উন্নতির অন্তরায় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এই সকল কুসংস্কারের জন্যই আমরা য়ুরোপীয়দিগের মতন সাংসারিক অভ্যুদয়সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারিতেছি না, অনেকেরই এই ধারণা ছিল। এই সকল কুসংস্কারের জন্যই আমরা দুনিয়ায় এতটা হেয় হইয়া রহিয়াছি, প্রায় সকল ইংরাজীনবীশই ইহা বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন তথাকথিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন, তখন নব্যশিক্ষিত সমাজের নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই তাঁহার পশ্চাতে যাইয়া দাঁড়াইলেন। মহর্ষি যখন ব্রাহ্মসমাজেব বেদী হইতে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন অন্যদিকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় অসাধারণ দক্ষতা সহকারে সে সময়ের য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ এবং দার্শনিক চিন্তার প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন। অক্ষয়কুমার দত্ত নামে মাত্র ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁহার মনের ঝোঁক বৈজ্ঞানিক অজ্ঞেয়তা-বাদের দিকেই বেশী ছিল। এই ঝোঁকটা ক্রমে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিলে মহর্ষির সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ্য মত-বিরোধ হয়। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধাবলীর জন্যই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সে সময়ে শিক্ষিত ও চিন্তাশীল বাঙ্গালীর নিকটে এতটা আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর, উদারমতি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি সেকালের বাংলার শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যরথী ও চিন্তানায়কেরা প্রায় সকলেই 'তত্ত্ববোধিনী' এবং মহর্ষির ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে স্বল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা

সকলেই প্রায় প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে না দাঁড়াইলেও ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন। আর এই জন্যই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহাদের এতটা সহানুভূতি জন্মিয়াছিল। কিন্তু মহর্ষির নেতৃত্বাধীনে স্বাধীনতার সংগ্রামটা কেবল আরম্ভ হয় মাত্র; এই জন্য যে সকল শিক্ষিত যুবকেরা স্বাধীনতার নামে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন মহর্ষির ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

এই স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিপূর্ণমাত্রায় বাধিয়া উঠে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে। আর এই সংগ্রাম প্রথম বাধে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরেই মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র প্রমুখ নবীন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে। তিন কারণে এই বিরোধটা বাধে। প্রথম, মহর্ষির ধর্ম্মসাধনের সঙ্কীর্ণতা; দ্বিতীয়, মহর্ষির ধর্ম্মমতের একদেশদর্শিতা; তৃতীয়, ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য-পরিচালনায় মহর্ষির একতন্ত্রতা বা autocracy। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মকে কেবল ব্রাহ্মোপাসনার মধ্যেই কার্য্যতঃ আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম মতবাদকে জীবনের সকল কর্মে এবং সকল সম্বন্ধের মধ্যে গড়িয়া তুলিতে হইবে, এ ভাবটা তখনও ব্রাহ্মসমাজে প্রবল হয় নাই। কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ ব্রাহ্ম মতবাদের আদর্শে ব্রাহ্মদিগের জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা কহিলেন, ব্রহ্ম-মন্দিরে আসিয়া ব্রহ্মোপাসনার সময়ে এক কথা কহিব, এক ভাবের অনুশীলন করিব, মনে মনে এক আদর্শের ধ্যান করিব, আর মন্দির হইতে ফিরিয়া বাড়ী যাইয়া পরিবারে এবং সমাজে অন্যরূপ আচার আচরণ করিব, ইহা সঙ্গত নহে। ইহাতে সত্যের প্রতি সম্যক মর্য্যাদা প্রকাশ হয় না। যাহা সত্য বুঝিব তাহা জীবনের সর্ব্ববিধ ব্যাপারে মানিয়া চলিব। অন্তরের ধর্ম্মবুদ্ধি বা বিবেক বা conscience

অনুযায়ী সমগ্র জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য আদর্শ। এই লইয়াই মহর্ষির সঙ্গে তাঁহাদের বিরোধ বাধে। কেশবচন্দ্র এই বিরোধ সম্বন্ধে তাঁহার ইংরাজী পাক্ষিকপত্র 'ইণ্ডিয়ান মিররে' লেখেন যে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম যুদ্ধ হইয়াছিল একেশ্বরবাদের যুদ্ধ। এই সংগ্রামে প্রথমে রামমোহন এবং পরে দেবেন্দ্রনাথই সেনানায়ক ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের "দ্বিতীয় যুদ্ধ বিবেকের যুদ্ধ।" বিবেকের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই—

"সঙ্কীর্ণ ভ্রাতৃমণ্ডলীর মধ্যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। পুরাতন অভ্যস্ত ভাবের সহিত নূতন নূতন ভাবের বিরোধ হইতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র দলের মধ্যে অধিকাংশ কেবল ব্রহ্ম জ্ঞান লইয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন ; কিন্তু কয়েকজন সেই জ্ঞান জীবনে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও ব্যাকুল হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, কেবল সপ্তাহান্তে একবার সামাজিকভাবে উপাসনা করিলে হইবে না; কিন্তু প্রতিদিনের জীবনে আপন বিশ্বাস অনুসারে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় অথবা বিবেকের পরামর্শ ভিন্ন কোনও কার্য্য করা উচিত নহে। জীবনের ক্ষুদ্রতম কার্য্যসকলও বিবেকের অনুমোদিত হওয়া উচিত। প্রথমোক্ত ব্রহ্মবাদিগণ জীবনপথে এতদূর অগ্রসর হইতে সম্মত হইলেন না, তাঁহারা বিবেকবাদীদিগের বিরোধী হইয়া উঠিলেন।"

এই বিরোধের দ্বিতীয় কারণ, মহর্ষির ধর্ম্মের আদর্শের সঙ্কীর্ণতা। মহর্ষি ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোনও বিশেষ ধর্ম্মশাস্ত্রকে ঈশ্বরপ্রণীত কিম্বা ধর্ম্মের একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। সত্য ভিন্ন এই ধর্ম্মের অন্য কোনও প্রামাণ্য নাই। যে শাস্ত্রে যতটুকু সত্য আছে, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। তাহাকেই মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লইতে

হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোনও শাস্ত্র স্পর্শ করে না। নবীন ব্রাহ্মেরা এই সঙ্কীর্ণতারও প্রতিবাদ করেন। ইহাও মহর্ষির সঙ্গে তাঁহাদের বিরোধের একটা কারণ হইয়া উঠে।

বিরোধের তৃতীয় কারণ, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-পরিচালনায় মহর্ষির অনন্যপ্রতিদ্বন্দী একাধিপত্য। মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজের গৃহের ও অন্যান্য সম্পত্তির 'ট্রাষ্টি' ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের 'ট্রাষ্ট'-পত্র অনুসারে 'ট্রাষ্টি' হিসাবে মহর্ষির উপরেই সমাজের কর্ম্মচারী নিয়োগের ভার ন্যস্ত ছিল। ব্রাহ্ম-সাধারণের এ সকল বিষয়ে আইনতঃ কোনও অধিকার ছিল না। কিন্তু বিরোধ বাধিবার পূর্ব্বে কেশবচন্দ্রের প্ররোচনায় মহর্ষি ব্রাহ্মসাধারণের প্রতিনিধি-সভা গঠন করিয়া, তাহারই হস্তে ব্রাহ্মসমাজের সকল কার্য্যভার অর্পণ করেন। বিরোধের সূত্রপাত হইলে তিনি প্রাচীন ব্রাহ্মদিগের পরামর্শে নবীন ব্রাহ্মদিগের এই অধিকার কাড়িয়া ট্রাষ্টিরূপে ব্রাহ্মসমাজের সকল কর্ত্তৃত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করেন। মহর্ষির এই একতন্ত্রতা বিরোধের তৃতীয় কারণ হইয়া উঠে। কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"বাহিরে দেখিতে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সমাজ-গৃহের ট্রাষ্টি মাত্র। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁহারা সমুদয় ব্রহ্মমণ্ডলীর অধ্যক্ষ ও নিয়ামক। মানবাত্মাগুলিকে শাসনাধীন করিবার জন্য তাঁহারা রাজবিধি গঠিত কর্ত্তৃত্ব অবলম্বন করিয়াছেন। এরূপ ব্যাপার আমাদিগের বিবেকের নিকট অতি উদ্বেগকর।.......সাধারণে আর এরূপ ভাব এখন সহ্য করিতে পারেন না। এখন পৃথিবীর সকল লোককে আমাদের বোঝান প্রয়োজন হইয়াছে যে কলিকাতা-সমাজ বর্ত্তমান অবস্থায় মণ্ডলীর মত প্রকাশ করে না। উহা এখন জন-কয়েক ব্যক্তির মাত্র। যে অস্ত্রে উহা আপনাকে গঠন করিয়া

তুলিয়াছে, সেই অস্ত্রেই এখন আমরা উহাকে ভগ্ন করিব।........ একপক্ষের একাধিপত্য অন্য পক্ষের শৃঙ্খলমুক্ত হইবার কারণ হইয়া থাকে।........"

কেশবচন্দ্র এইরূপে তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়া বাংলার শিক্ষিত সাধারণের দরবারে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি কহেন যে "কলিকাতা সমাজ (আমরা এখন যাহাকে আদি সমাজ কহি, আদিতে তাহাই কলিকাতা সমাজ নামে অভিহিত ছিল) মানবের ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে একটা কথার কথায় পরিণত করিয়াছে।"

বিরোধের সকল কারণগুলির সমাহার করিয়া উপসংহারে কেশবচন্দ্র কহেন :—

"কলিকাতা সমাজ এইরূপে ঈশ্বরের ধর্ম্মকে সংসারের ধর্ম্ম করিয়াছেন; সমগ্র মানবজাতির উদার ধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্ম্ম করিয়াছেন; বিবেকের স্থলে ফলাফল চিন্তা, বীরত্ব ও ঐকান্তিকতার স্থলে চাঞ্চল্য, ভীরুতা ও কপটতাকে স্থান দান করিয়াছেন; সত্যকে সংসারের দাস করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের মন্দিরে ঈশ্বরের নামে ধনের সম্মানার্থ বেদী স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতা সমাজের এখনই সাবধান হইয়া এ সকলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা সমুচিত, অন্যথা মহা বিপ্লব ঘটিবে। সত্যকে কখনও কেহ দাসত্বে বদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে না, উহা সমুদয় শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া স্বাধীন হইবেই হইবে।"

কেবল ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মসাধন বা ধর্ম্ম-সিদ্ধান্ত লইয়া এই বিরোধ উপস্থিত হইলে নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই বিরোধের ফলাফলেতে কোনও স্বার্থ থাকিত না। তাঁহারা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎমাত্রও মনোনিবেশ করিতেন না। আর এই সংগ্রামের সেনাপতিরূপে কেশবচন্দ্রও তাঁহাদের চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিতে পারিতেন না।

ক্ষুদ্র সংখ্যক ব্রাহ্মেরা ইহাকে একটা ধর্ম্ম-সংগ্রাম বলিয়া মনে করিলেও, দেশের শিক্ষিত সাধারণে এই বিবাদকে স্বাধীনতার সংগ্রাম বলিয়াই গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র নিজেও ইহাকে স্বাধীনতার সংগ্রাম বলিয়াই প্রচার করেন। মহর্ষির দল ছাড়িয়া যাইয়া কেশবচন্দ্র স্বপক্ষে লোকমত গঠনের জন্য ইংরাজীতে 'ব্রাহ্মসমাজে স্বাধীনতার সংগ্রাম' এই নাম দিয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দান করেন। এই বক্তৃতায় কোনও কোনও খৃষ্টীয়ান পাদরী উপস্থিত ছিলেন। সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের নেতৃস্থানীয় দুইজন প্রধান পুরুষের নামও বক্তৃতার বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের একজন দিগম্বর মিত্র, অপর মহেন্দ্র লাল সরকার। ইঁহারা কেহই ব্রাহ্ম ছিলেন না। ব্রাহ্মসমাজের মত-বিরোধে ইহাঁদের কোনই ইষ্টানিষ্ট ছিল না। কিন্তু সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালীরা সকলেই যেমন দেশপ্রচলিত কুসংস্কার এবং সমাজানুগত্যের বিরোধী ছিলেন, ইঁহারাও সেইরূপ স্বজাতির কল্যাণ কামনায় যাহাতে সত্য ও স্বাধীনতার পরিপন্থী যাবতীয় রীতিনীতি ও কুসংস্কার নষ্ট হয় সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাই চাহিয়াছিলেন। সরকার মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে যোগ না দিয়াও জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত স্বদেশবাসীর চিন্তা ও চরিত্রকে সত্য ও স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন। মিত্র মহাশয়ও অন্য দিকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের অন্যতম অধিনায়করূপে পরজীবনে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বদেশীয়দিগের অধিকার বিস্তারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই নিজ নিজ ভাবে স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন। আর এই জন্যই ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে যখন এই স্বাধীনতার সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল তখন দেশের শিক্ষিত সাধারণের সঙ্গে ইঁহারাও কেশবচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করেন।

(২)

ফলতঃ সে সময়ে কেশবচন্দ্র সর্ব্বতোভাবেই বাঙ্গালীর চিত্ত ও চরিত্রকে স্বাধীন ও উদার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ ইংরাজীর নভেম্বর মাসে নবীন ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নাম দিয়া এক নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজই সে সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালীর স্বাধীনতার আদর্শকে সাকার করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কতকগুলি বিশুদ্ধ মতবাদ গ্রহণ ও প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই; সাধন ভজনকেই ধার্ম্মিকের এক মাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। নিজের মত ও বিশ্বাস অনুযায়ী চরিত্র গড়িয়া তোলা, এবং পরিবারের এবং সমাজের সকল সম্বন্ধকেই নিয়ামিত করা—ইহাই তাঁহারা ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। এই সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্মের মূলসূত্র হইল, সত্য ও স্বাধীনতা। নিজের বিচার বুদ্ধিতে যাহা সত্য বলিয়া মনে হয়, প্রাণপাত করিয়াও তাহার অনুসরণ করিতে হইবে। এ বিষয়ে কোনও গ্রন্থের, কোনও পুরোহিত সম্প্রদায়ের, বা সমাজের অধীনতা স্বীকার করিলে চলিবে না, তাহাতে ধর্ম্মহানি হইবে। ইহাই কেশবচন্দ্রের নূতন ব্রাহ্মসমাজের মূলমন্ত্র হইল। এই মূলমন্ত্র স্বাধীনতার মন্ত্র। এইজন্যই বহুতর শিক্ষিত বাঙ্গালী এবং ভারতবাসী ব্রাহ্ম মতবাদ বা ব্রাহ্ম সাধন গ্রহণ না করিয়াও সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। এইভাবে সেকালের শিক্ষিত লোকমাত্রেই ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন।

(৩)

কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের বাহিরেও এই সংগ্রাম ঘোষণা করেন। প্রকাশ্যভাবে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু নানা দিক দিয়া অপরোক্ষভাবে স্বদেশের আত্মমর্য্যাদা বোধ জাগাইয়া তুলেন। প্রথমতঃ তাঁহার অলোকসামান্য মনীষা এবং বাগ্মিতা দেশের লোকের হীনতা-বোধ নষ্ট করিয়া দেয়। সেকালে ইংরাজী বিদ্যারই একাধিপত্য ছিল। ইংরাজী বিদ্যায় প্রতিষ্ঠালাভ করিলেই বিদ্বান ও জ্ঞানী বলিয়া লোকসমাজে সমাদর পাওয়া যাইত। কেশবচন্দ্র এই বিদ্যায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশ করেন। তাঁহার মনীষা এবং বাগ্মিতা ইংরাজসমাজকে পর্য্যন্ত বিস্মিত করিয়া তুলে। ইংরাজী ভাষার উপরে কেশবচন্দ্রের যে পরিমাণ দখল ছিল, অনেক কৃতবিদ্য ইংরাজেরও সে দখল ছিল না। দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজপুরুষেরা পর্য্যন্ত কেশবচন্দ্রের বিদ্যাবত্তা ও বাগ্মিতায় মন্ত্রমুগ্ধের মতন হইয়া যাইতেন। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া বাঙ্গালীর আত্ম-গৌরব বোধ জাগিয়া উঠিল। এই আত্ম-গৌরব বোধেই দেশাত্মবোধের প্রথম সূচনা হয়। কেশবচন্দ্র রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নায়ক না হইয়াও, এই দেশাত্মবোধকে সে সময়ে বিশেষভাবে জাগাইয়া তুলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার মাস কয়েক পূর্ব্বে কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ-থিয়েটারে কেশবচন্দ্র 'যিশুখৃষ্ট—য়ুরোপ ও এশিয়া' এই নাম দিয়া এক ইংরাজী বক্তৃতা করেন। এই এক বক্তৃতাতেই দেশের চিন্তানায়কত্বে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতার মূলকথা ছিল দুটী। এক, তোমরা যাহারা খৃষ্টান বলিয়া পরিচয় দাও, তাহারা অনেকেই যিশুখৃষ্টের চরিত্রের অনুশীলন কর না। যিশুখৃষ্টের শিক্ষা তোমাদের চরিত্রে

ফলিয়া উঠে নাই। দ্বিতীয় কথা, যিশুখৃষ্ট এশিয়ার লোক ছিলেন। এশিয়ার সাধনা এবং সভ্যতার মূলগত বিনয়, সহিষ্ণুতা, সর্ব্বজীবে মৈত্রী এবং আধ্যাত্মিকতার উপরেই যিশুখৃষ্টের জীবনের ও ধর্ম্মের পুচ্ছপ্রতিষ্ঠা। এই সকল আদর্শ প্রবল পরাক্রান্ত য়ুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে ভাল করিয়া ফুটিবার অবসর পায় নাই। যিশুখৃষ্টকে বুঝিতে হইলে এশিয়ার সভ্যতা ও সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা লাভ করিতে হইবে। এশিয়াকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলে যিশুখৃষ্টের জীবন ও চরিত্রের প্রতি মর্য্যাদা দেখান হয় না। এই বক্তৃতা দিয়া কেশবচন্দ্র কেবল ভারতবাসীদিগের নহে, কিন্তু ইংরাজদিগেরও শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে এভাবে কোনও বাঙ্গালী দেশের রাজপুরুষদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিতে অগ্রসর হন নাই। আর যে ভাবে কেশবচন্দ্র এই বক্তৃতাটি দেন, তাহাতে ইংরাজ খৃষ্টীয়ানেরা ভিতরে ভিতরে বাঙ্গালীর মুখে এ সকল কথা শুনিয়া যতটাই অবমাননা বোধ করুন না কেন, মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার উপায় তাঁহাদের ছিল না।

সমসাময়িক ঘটনার আলোচনা করিলে মনে হয় যে কেশবচন্দ্র স্বজাতির সম্মান রক্ষা করিবার জন্যই এই বক্তৃতা দিতে উদ্যত হন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে আর, স্কট মনক্রীফ্ নামে এক বিলাতী সওদাগর বাঙ্গালী চরিত্রের উপরে অযথা আক্রমণ করিয়া এক বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাতে তিনি বাঙ্গালী পুরুষদিগকেই শঠ, জুয়াচোর ও প্রবঞ্চক বলিয়া ক্ষান্ত রহেন নাই, আমাদের দেশের মহিলাদিগের উপরেও অকথ্য আক্রমণ করেন। ইহার ফলে স্বদেশী ও বিদেশীয়দিগের মধ্যে ঘোরতর বিদ্বেষ জ্বলিয়া ওঠে। উভয়পক্ষের সংবাদপত্রের সাহায্যে এই আগুন দেশময় ছড়াইয়া পড়ে। কেশবচন্দ্র মনক্রীফের বক্তৃতাকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁর এই বক্তৃতা প্রদান করেন।

কিন্তু এমন সুকৌশলে এই কাজটি করেন যে মনক্রীফের পক্ষের লোকেরা তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিবার সূচাগ্র পরিমাণেও অবসর পান নাই। 'তোমরা খৃষ্টীয়ান, যিশুখৃষ্টের আদর্শ অবশ্যই মান; এস তবে যিশুখৃস্টের চরিত্রের ও উপদেশের তৌলদণ্ডে চড়াইয়া তোমাদের ও আমার স্বদেশীয়দিগের চরিত্রের ওজন করি।' কেশবচন্দ্র কার্য্যতঃ এই ভাবেই এই বক্তৃতা প্রদান করেন। এদেশের দেশীয় ও ইংরাজদিগের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, এই কথার অবতারণা করিতে যাইয়া তিনি কহিলেন,—

"In handling this rather delicate part of my subject, I must avoid all party spirit and race antagonism, I stand on the platform of brotherhood and disclaim the remotest intention of offending any particular class or sect of those who constitute my audience, by indulging in rabid and malicious denunciation on the one hand and dishonest flattery on the other."

অর্থাৎ, 'এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমি কোনও সম্প্রদায়ের বা জাতির পক্ষে ওকালতী করিব না। মানবের নিখিল ভ্রাতৃত্বের মঞ্চ হইতেই আমি ইহার বিচার করিব। কোনও জাতির অযথা নিন্দা করিব না, কাহারও তোষামদও করিব না।'

দোষ গুণ উভয় পক্ষেরই আছে; ইংরাজেরও আছে, এদেশীয়দিগেরও আছে। মনক্রীফ্ সাহেবের বক্তৃতার নাম না করিয়া তাঁহার বক্তৃতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন যে, এ দেশের য়ুরোপীয় সমাজে এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা দেশীয় লোকদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে কেবল ঘৃণাই যে করে তাহা নহে, এরূপ ঘৃণা করিতে আনন্দ পায়। ইহারা এদেশের লোককে শৃগালের সঙ্গে তুলনা করে। সে শৃগাল হইয়া জন্মিয়াছে,

শৃগালের শিক্ষাই পাইয়াছে, শৃগালের মতই জীবন যাপন করে এবং মরে। অতএব—As a fox a native should always be distrusted, and treated with contempt and hatred. এদেশের লোকেও ইংরাজকে ছাড়িয়া কথা কহে না। তারা বলে, ইংরাজ নেকড়ে বাঘের মতন হিংস্র, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও ও শোণিতলোলুপ। ইংরাজ নেকড়ে বাঘ হইয়াই জন্মিয়াছে, নেকড়ে বাঘের শিক্ষাই পাইয়াছে, নেকড়ে বাঘের মতই জীবন যাপন করিবে এবং মরিবে। বিনয়, ক্ষমা এবং মৈত্রী-ধর্ম্ম সে জানে না। অল্পেতেই সে ক্রোধে জ্বলিয়া ওঠে এবং—'once out of temper he rants and raves, and inflicts the most cruel and barbarous torture on his enemy to gratify his ire and is even sometimes so far carried away by his passions as to commit the most atrocious murder.' অতএব নেকড়ে বাঘকে যেমন লোকে ভয় করে এবং দূরে পরিহার করে সেইরূপ ইংরাজকেও পরিহার করিতে হয়। এদেশের লোকেরা ইংরাজকে যে ভয় করে তাহা ইংরাজের উন্নত চরিত্রের প্রভাবে নহে, কিন্তু তাহার পশুত্ব দেখিয়া। 'This fear, be it said, is not the fear due to a superior nature but that which brutal ferocity awakes.' তারপর এদেশবাসীর চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া কহিলেন, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, জাল জুয়াচুরী আমাদের মধ্যে আছে সত্য, কিন্তু ইহা আমাদের প্রকৃতিগত নহে, আমরা যে অবস্থায় পড়িয়াছি তাহারই ফল। আমাদের দেশের লোক বড় স্বার্থপর, ক্ষুদ্র স্বার্থের লোভেই তাহাদের জীবন পরিচালিত হয়। এই স্বার্থের প্রেরণাতেই তাহারা মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অবলম্বন করে, আর বহু শতাব্দীর পরাধীনতাই আমাদিগকে এরূপ সঙ্কীর্ণ ও নীচ করিয়া তুলিয়াছে।

'We are a subject race and have been so for centuries. We have too long been under foreign

sway to feel anything like independence in our hearts. Socially and religiously we are little better than slaves.........Under such circumstances all the higher impulses and aspirations of the soul must naturally be smothered, and hence it is that though educated ideas rebel, and organised communities of enlightened men often protest, the general tenor of native life is a dead level of base and unmanly acquiescence in traditional errors."

(৪)

বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী যে স্বাধীনতা-মন্ত্র সাধন করিয়া আসিয়াছে, বলিতে গেলে কেশবচন্দ্রই সেই মন্ত্রের একরূপ প্রথম দীক্ষাগুরু। জাতীয় স্বাধীনতা জগতের সর্ব্বত্রই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিউজিয়নটদের সাধনে ও স্বার্থ-ত্যাগেই ফরাশীসের স্বাধীনতার সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। ইংলণ্ডেও পিউরিটানদিগের সাধনা এবং আত্মবিসর্জ্জনের উপরেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ভিত্তি গড়িয়া উঠে। আমেরিকার স্বাধীনতার মূলেও হিউজিয়নট এবং পিউরিটানদিগের সাধন দেখিতে পাই। আমদের সমকালে রুশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সংগ্রামও বহুলপরিমাণে টলষ্টয়ের শিক্ষা এবং আদর্শকে আশ্রয় করিয়াই জাগিয়া উঠে। যেখানেই জাতীয় স্বাধীনতার প্রচেষ্টা হইয়াছে, সেইখানেই তাহার গোড়ায় একটা ধর্ম্মের প্রেরণা জাগিয়াছে। এবং এই ধর্ম্মের প্রেরণায় মানুষ আগে ভিতরের বাঁধন কাটিয়াছে, নিজের চিন্তা ও চিত্তকে বাহিরের বন্ধনমুক্ত করিয়াছে, পরিবারে ও সমাজে এই স্বাধীনতার আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে গিয়াছে, এবং পরিণামে এই

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই নিজের রাষ্ট্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। ভিতরে যে দাস, বাহিরে সে স্বাধীন হইতে পারে না। পরিবারে এবং সমাজে যে আপনার বিচারবুদ্ধি এবং বিশ্বাস অনুসারে চলিতে ভয় পায়, সে কখনও নির্ভীক হইয়া একতন্ত্র রাজশক্তির সম্মুখীন হইতে পারে না। কেবল সাংসারিক সুখ সুবিধা যেখানে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মূল প্রেরণা হইয়া রহে, সেখানে এই স্বাধীনতা সংগ্রাম কদাপি জয়যুক্ত হইতে পারে না। যেখানে জয়যুক্ত হয়, সেখানে দেশের জনসাধারণে এক অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অপর অধীনতাতে যাইয়া, 'স্ব'য়ের উপর দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রচেষ্টা যে পরিমাণে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শের প্রেরণা লাভ করিয়াছে, সেই পরিমাণেই তাহা বিশুদ্ধ, উদার এবং অপরাজেয় হইয়াছে এবং হইতেছে। এই দিক দিয়া ভারতের বিশেষতঃ বাংলার বর্ত্তমান স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিলে, ইহার মূলে একরূপ প্রথম শিক্ষা ও দীক্ষাগুরুরূপে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে দেখিতে পাই।

(৫)

কেশবচন্দ্র বা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সাক্ষাৎভাবে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে চেষ্টা করেন নাই, একথা সত্য। কিন্তু সে সময়ে রাষ্ট্রীয় বন্ধনের বেদনাও লোকে অনুভব করিতে আরম্ভ করে নাই। বন্ধনের বেদনা যেখানে নাই, মুক্তির বাসনাও সেখানে জাগে না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজের শৃঙ্খল আমাদের গলায় বাধে নাই। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ডের এবং জাতিভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত ও ছোঁৎমার্গচারী সমাজের কঠোর রজ্জুটাই

আমাদিগের গলায় এবং হাতে ও গায়ে বড়ই বাজিয়া উঠিয়াছিল। এইখানেই বন্ধনের বেদনা জাগিয়াছিল। পৌরাণিক দেবদেবীতে বিশ্বাস নাই, অথচ তাঁহাদিগের নিকটে মাথা নোয়াইতে হইত, ব্রাহ্মণের অতিপ্রাকৃত অধিকারে আস্থা ছিল না, অথচ পরিবারের শাসন-ভয়ে পূজাপার্ব্বনে শ্রাদ্ধশান্তিতে বামুন ডাকিয়া মন্ত্র পড়িতে হইত। সংস্কৃত জ্ঞান বা শাস্ত্রজ্ঞান তখনও জন্মে নাই, সুতরাং না পুরোহিতের, না যজমানের, কাহারও মন্ত্রের অর্থবোধ ছিল না, অথচ টিয়াপাখীর মতন এ সকল অর্থশূন্য শব্দ আবৃত্তি করিতে হইত। এই সকল ব্যাপারে বিচার বুদ্ধিতে আঘাত লাগিত। এই আঘাতের তাড়নাতেই মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। যাঁহারা সমাজ-ভয়ে এ সকল অনুষ্ঠান করিতেন, তাঁহারাও মনে মনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সত্যধর্ম্মের প্রেরণা, বিশ্বাস ও ভক্তি। বিশ্বাস বিচার বুদ্ধির দ্বারা সমর্থিত হইলেই সত্য ও শক্তিশালী হয়। এখানে তাহা হইত না। সমাজে জাতিভেদ মানিয়া চলিতে হইত। অথচ নব্যশিক্ষিত লোকেরা কিছুতেই বিচারযুক্তি কিম্বা নিজেদের ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা এই কৃত্রিম সামাজিক ভেদবাদকে সত্য বা কল্যাণকর বলিয়া মানিয়া লইতে পারিতেন না। এই জাতিভেদ মানিতে যাইয়াও তাঁহাদের অন্তরে গুরুতর আঘাত লাগিত। যাঁহারা মানিতেন তাঁহারাও নিজের কাছে নিজে অত্যন্ত খাটো হইয়া থাকিতেন। আর নিজের কাছে নিজে খাটো হইয়া থাকার মতন দুরবস্থা মানুষের আর কিছুতে হয় না। ইহাতে তাহার আত্মসম্মানে যেমন আঘাত লাগে, পরের অপমান বা নির্য্যাতনে তাহার শতাংশের একাংশও আঘাত লাগিতে পারে না। এই বন্ধন-বেদনাটাই তখন আমাদের শিক্ষিত সমাজে অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। এইজন্য স্বাধীনতা এবং মুক্তির সংগ্রাম সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্ম ও সমাজের ক্ষেত্রেই বাধিয়া

উঠিল। মহর্ষি এই সংগ্রামের পূর্ব্বাবস্থাটা মাত্র আনিয়াছিলেন। শিক্ষিত সমাজের চিত্তকে তিনি স্বাধীন করিতে চেষ্টা করেন; তাহাদের ধর্ম্মবুদ্ধিকে জাগাইয়া, ইংরাজী শিক্ষা ও য়ুরোপের সাধনার সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচারিতা জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহাকে সংযত করিয়াছিলেন। এইভাবে স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য তিনি দেশবাসীদিগকে প্রস্তুত করিয়া-ছিলেন। কিন্তু এই সংগ্রাম যখন প্রত্যক্ষভাবে বাধিয়া উঠিল, প্রাচীনে নবীনে যখন মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল, এবং কে কাহাকে বিধ্বস্ত করিবে তাহারই চেষ্টা আরম্ভ হইল, তখন মহর্ষির শান্ত ধীর প্রকৃতি, এবং অস্থিমজ্জাগত রক্ষণশীলতা এই বিপ্লব তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিল না। কেশবচন্দ্র তখন নবীন ব্রাহ্মদিগকে লইয়া এই ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লবের মাঝখানে 'জয় জগদীশ হরে' বলিয়া লাফাইয়া পড়িলেন। এই শৌর্য্য বীর্য্যের বলেই তিনি এবং তাঁহার সহচর এবং অনুচরেরা বাংলার স্বাধীনতা ভিখারী শিক্ষিত সমাজের হৃদয় অধিকার করিয়া তাহাদের চিন্তা ও ভাবরাজ্যের রাজা হইয়া উঠিলেন। তাহাদের অন্তরে যে সকল ভাব মূক হইয়া ছিল, কেশবচন্দ্রের দৈবশক্তিরসায়িত রসনায় তাহাই বাচাল হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের চিত্তে যে আকাঙ্খা ভয়ে ভয়ে নড়িতে চড়িতেছিল, কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সঙ্গীগণের জীবনে তাহাই নির্ভীক হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। যে বন্ধন তাহাদের মর্ম্মে মর্ম্মে বাজিতেছিল অথচ তাহা ছেদন করিবার শক্তির প্রেরণা তাহারা পাইতেছিল না, কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সঙ্গিগণ অবলীলাক্রমে সে সব বন্ধন ছিঁড়িয়া মুক্ত পুরুষের মতন তাহাদের সমক্ষে দাঁড়াইলেন। এই ভাবেই স্বদেশবাসীগণের চিত্ত ও চিন্তাকে অধিকার করিয়া কেশবচন্দ্র নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজের অধিনায়ক

হইয়া উঠিলেন। তিনি যে স্বাধীনতার সংগ্রাম ঘোষনা করিলেন, শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকেরা দলে দলে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাহাতে আসিয়া পড়িলেন। কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের এই সাধনা মহার্ঘ বস্তু। সেই সাধনার উত্তরাধিকারীরূপেই বাংলা আজি পর্য্যন্ত ভারতের স্বাধীনতার সাধনে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু হইয়া আছে।

রাষ্ট্রীয় বন্ধনের বেদনা তখনও জাগে নাই, সুতরাং রাষ্ট্রীয় মুক্তির বাসনাও প্রবল হয় নাই। তবে এই সাধনার পূর্ব্ব অবস্থা কেশবচন্দ্র অনেকটা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। স্বাজাত্যের গৌরববোধ জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম বনিয়াদ। কেশবচন্দ্র এই গৌরববোধ নানাদিক দিয়া জাগাইয়া তুলেন। তাঁহার মনীষা এবং বাগ্মিতা এ বিষয়ে কতটা সাহায্য করিয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে কেশবচন্দ্র ধর্ম্ম প্রচারার্থে বিলাতে যান। সেখানে তাঁহার অলোকসামান্য মনীষা ও বাগ্মিতাতে ইংরাজসমাজ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া যায়। কেশবচন্দ্রের নাম দেশময় ছাইয়া পড়ে। সুরসিক পাঞ্চ (Punch) লিখে :—

Big as a lion or small as a wren
Who is this Chunder Sen ?

মহারাণী ভিক্টোরিয়া কেশবচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং নিজের ফটোগ্রাফ স্মৃতিচিহ্নরূপে তাঁহাকে দান করেন। সামান্য মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী নিজের কেবল মনীষা ও প্রতিভাবলে বিলাতকে কাঁপাইয়া, মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরীর নিকটে রাজযোগ্য সম্মান পাইয়াছিলেন, ইহাতে কেবল বাঙ্গালীর নহে, কিন্তু সমগ্র ভারতবাসীর চিত্ত গৌরবে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। সে সময়ে সকল বিষয়েই আমরা ইংরাজের মুখাপেক্ষী হইয়াছিলাম। ইংরাজের সার্টিফিকেট মাথা পাতিয়া

লইতাম। ইংরাজকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতাম। ইংরাজ আমাদিগের অপেক্ষা কতটা যে উঁচু, ইহা আমরা সকল সময়ে ধারণাও করিতে পারিতাম না। এই ইংরাজ যখন রাজা প্রজা সকলে মিলিয়া কেশবচন্দ্রের প্রতিভার নিকট মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইল, তখন আমরা বাঙ্গালী ও ভারতবাসী বলিয়া অভূতপূর্ব্ব গৌরব অনুভব করিতে লাগিলাম। এই স্বাজাত্যাভিমান সর্ব্বত্রই জাতীয় জীবনের এবং জাতীয় আত্মচৈতন্যের—national life এবং national consciousness-এর সূচনা করে। কেশবচন্দ্র এইরূপেও আমাদের বর্ত্তমান বৃহত্তর জাতীয় প্রচেষ্টার ভূমি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

বিলাতে যাইয়া তিনি যে সকল বক্তৃতা দেন তাহাতে অনেক সময়ই খোলাখুলিভাবে ইংরাজ চরিত্রের বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনের দোষ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই সকল বক্তৃতা পড়িয়াও আমাদের আত্মচৈতন্যের উদয় হয়। দুনিয়াতে আজিও যে আমাদের কিছু দিবার আছে, সভ্য জগতের যে আমাদের নিকটে শিক্ষণীয় বিষয় আছে, কেশবচন্দ্রই প্রথমে শিক্ষিত বাঙ্গালীর অন্তরে এই ভাবটা জাগাইয়া দেন। এই দিক্ দিয়াও আমাদের বর্ত্তমান স্বাদেশিকতার হরিদ্বারে কেশবচন্দ্রকে দেখিতে পাই।

প্রথম যুগের স্বাধীনতার সংগ্রামে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার অনুগত নবীন ব্রাহ্ম যুবকেরাই সেনানী হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে স্বাধীনতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন তাহারই উপরে আমাদের বর্ত্তমান স্বাধীনতার বৃহত্তর প্রচেষ্টা গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলার নবযুগের ইতিহাসে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের ইহাই প্রধান কীর্ত্তি।

সপ্তম কথা

ব্রাহ্মসমাজ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতার নামেই কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সঙ্গিগণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দল ছাড়িয়া চলিয়া আসেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে মহর্ষি নিতান্ত স্বাদেশিক ছিলেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে সার্ব্বজনীন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ বেদ ও উপনিষদ হইতেই সংগৃহীত হয়। কেশবচন্দ্র জগতের সকল ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে একেশ্বরবাদ-প্রতিপাদক উপদেশ সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতন গ্রন্থ প্রচার করিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ অপেক্ষা বেশী উদার করিবার চেষ্টা হয়। রাজা রামমোহন জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের পরস্পরের বৈরিতা নষ্ট করিয়া একটা উদার মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র রাজার সেই ভাবেরই অনুবর্ত্তন করিয়া জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসকলের মধ্যে একটা সমন্বয়-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। রাজা এই বিভিন্ন ধর্ম্মসকলের বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়া তাহাদের মধ্যে যে মিলটুকু ছিল, তাহারই উপরে তাঁর ব্রাহ্মসমাজকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এরূপভাবে একপ্রকারের মিলনক্ষেত্র গড়িয়া তোলা সম্ভব। কিন্তু এপথে সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। রাজা সে চেষ্টা করেন নাই; সে চেষ্টা করিবার সময়ও তখন আসে নাই। কেশবচন্দ্র এই সমন্বয়ের চেষ্টাই করিয়াছেন। যে পথে কেশবচন্দ্র এই সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা

করিতে গিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে সমীচীন হইয়াছিল কিনা, সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। বাংলার নবযুগের ইতিহাসে এই ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা ঠিক প্রাসঙ্গিকও হইবে না। তবে কেশবচন্দ্র এই সমন্বয় করিতে যাইয়া ভারতবর্ষের এবং জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়কে একটা অতি বড় স্বাধীনতার সনন্দ দিয়াছিলেন, একথাটা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে বলা নিতান্তই প্রয়োজন। ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইহা অতি বড় কথা। প্রথম কথা ছিল, আমার ধর্ম্মই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম, অন্য ধর্ম্মসকল মিথ্যা। দ্বিতীয় কথা হইল, আমার ধর্ম্ম সত্য, অন্য ধর্ম্মসকল একেবারে মিথ্যা নহে, তাহাতেও সত্য আছে; জগতের সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে। ইহাই ব্রাহ্ম-সমাজের প্রথম কথা ছিল। এই সূত্র ধরিয়াই বেদ ও উপনিষদাদি ছাঁকিয়া তাহার সত্য সংগ্রহ করিয়া মহর্ষি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ রচনা করেন। এই সূত্র অবলম্বনেই কেশবচন্দ্রও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের "শ্লোকসংগ্রহ" রচনা করেন। সত্য ও অসত্য মিশ্রিত শাস্ত্র হইতে সত্যগুলিকে বাছিয়া লইতে হইলে সত্যের একটা কষ্টিপাথর আবশ্যক হয়। মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই নিজের বিচার-বুদ্ধিকে এই কষ্টিপাথররূপে ব্যবহার করেন। সকলে এ কষ্টিপাথর গ্রহণ করিবে না, করিতে পারেও না। এইজন্যই জগতে এত মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেশবচন্দ্র পরজীবনে সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে, এই মতকেও ছাড়াইয়া যান। নববিধান প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া তিনি কহেন, জগতের সকল ধর্ম্মে কেবল সত্য আছে, তাহা নহে, জগতের সকল ধর্ম্মই সত্য; নিজ নিজ অধিকারে, নিজ নিজ দেশকাল-পাত্র-বিবেচনায় সকল ধর্ম্মই সত্য। সকল ধর্ম্মই ভগবদ্‌প্রতিষ্ঠিত; সকল ধর্ম্মই ঈশ্বরের বিধান। এইরূপে কেশবচন্দ্র জগতের সকল ধর্ম্মকেই একটা অতি বড় স্বাধীনতার সনন্দ প্রদান করেন। যতক্ষণ

না জগতের ধার্ম্মিকেরা এই সূত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ কিছুতেই নষ্ট হইবে না। সত্য অসাম্প্রদায়িকতা এইভাবেই কেবল প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। আধুনিক ভারতের জাতীয় একতা ও জাতীয় জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন যে ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা কেবল ভিত খুঁড়িয়াছিল মাত্র; কেশবচন্দ্র 'সকল ধর্ম্মই সত্য' এই সূত্র প্রচার করিয়া সেই পবিত্র মিলনমন্দিরকেই গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। হিন্দু যেদিন বুঝিবে, তার নিজের ধর্ম্ম তার নিজের নিকটে যেমন সত্য, বৈজিক নিয়মাধীনে, ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ধারাতে তাহার ব্যক্তিগত সাধন ও সিদ্ধির সঙ্গে এই ধর্ম্মের যেমন অতি ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেইরূপ মুসলমানের নিকটে মুসলমান ধর্ম্ম, খৃষ্টীয়ানের নিকট খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ও জৈনের নিকটে তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম্ম সম্পূর্ণ সত্য, ঐ সকল ধর্ম্মের আশ্রয়েই তাহারা নিজেদের জীবনে ধর্ম্ম সাধন করিয়া পরমার্থ লাভ করিবে; সেইদিন ভারতবর্ষে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ নিরস্ত হইয়া আধুনিক ধর্ম্মবিজ্ঞান ও ধর্ম্মতত্ত্বের একটা বিরাট স্বাধীনতার ভূমিতে আমাদের জাতীয় একতা গড়িয়া উঠিবে। ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির সূত্র অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ অধিকারে নিজ নিজ দেশকালপাত্রভেদে সকল ধর্ম্মই সত্য, এই উদার ভূমিতেই সমুদয় সাম্প্রদায়িক বিরোধ নষ্ট হইতে পারে। কেশবচন্দ্র এই সূত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া সত্য ভাবেই সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের পথ খোলসা করিয়া গিয়াছেন।

(২)

কিন্তু কেশবচন্দ্র মহর্ষির সঙ্গে বিরোধ বাধাইয়া যে স্বাধীনতার আদর্শকে ধরিয়াছিলেন, ক্রমে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজেও গুরুতর বিরোধ প্রকাশিত হইয়া পড়িতে লাগিল। কেশবচন্দ্র অল্পদিন মধ্যেই "প্রেরিত মহাপুরুষ-বাদ" প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। "যীশুখৃষ্ট—য়ুরোপ ও এসিয়া" এই বক্তৃতা দিবার পরে অনেকে ভাবিলেন কেশবচন্দ্র খৃষ্টীয়ান হইয়া যাইতেছেন। লোকের এই ভ্রান্তি নিরসনের জন্য তিনি ইহার কিছুদিন পরে "মহাপুরুষ" বা "Great Men" এই বিষয়ে এক বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাতে তিনি কহেন যে জগতে পরিত্রাণের সংবাদ প্রচারের জন্য মাঝে মাঝে মহাপুরুষেরা প্রেরিত হন। ইঁহাদের দ্বারাই জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইঁহারা ঈশ্বরের অবতার নহেন, কিন্তু ঈশ্বরের আদেশে তাঁহার নিকট হইতে সনন্দ লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। যীশু যেমন একজন এই শ্রেণীর প্রেরিত মহাপুরুষ ছিলেন, সেইরূপ আরও অনেকে ছিলেন। সক্রেটিশ, বুদ্ধ, মহম্মদ সকলেই 'প্রেরিত মহাপুরুষ' ছিলেন। এই বক্তৃতার দ্বারা কেশবচন্দ্র খৃষ্টীয়ান হইয়া যাইতেছেন এই আশঙ্কা দূর হইল বটে, কিন্তু ইহার দ্বারাই ভিতরেই আবার ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভবিষ্যৎ বিরোধের বীজ রোপিত হইল। কেশবচন্দ্র ক্রমে নিজেকে 'ঈশ্বর-প্রেরিত' বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রচারকদল প্রকাশ্যভাবেই এই মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। স্বাধীনচেতা ব্রাহ্মেরা দেখিলেন যে ব্রাহ্মসমাজেও ব্যক্তিগত চিন্তার স্বাধীনতা নষ্ট করিবার জন্য আবার একটা নূতন আয়োজন হইতেছে। ইহা দেখিয়া তাঁহারা ভীত হইয়া উঠিলেন। কেশবচন্দ্র ক্রমে 'আদেশবাদ' অর্থাৎ সাধকেরা ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হন, এবং ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া তাঁহারা যে কর্ম্ম করেন, তাহা সর্ব্বতোভাবেই ধর্ম্মসঙ্গত, এ বিষয়ে প্রাকৃত বিচার-বুদ্ধির সমালোচনার অধিকার নাই,—এই মতবাদও প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইহার সঙ্গে

সঙ্গে মানুষের জীবনের প্রবৃত্তিমূলক সহজ কর্ম্মচেষ্টাকে ধর্ম্মের নামে সঙ্কুচিত করিয়া প্রচীন বৈরাগ্যের আদর্শও প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাও আর একটা বিরোধের কারণ হইয়া উঠিল। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া কেশবচন্দ্র নানাদিকে সমাজসংস্কারের চেষ্টা করেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠাই এই সংস্কারের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল। স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার, বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন —এ সকলের চেষ্টা হয়। ক্রমে এখানেও বিরোধ বাধিয়া উঠিল। একদল ব্রাহ্ম স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীস্বাধীনতাও প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ইঁহারা সর্ব্বতোভাবে দেশ-প্রচলিত অবরোধ-প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। মহর্ষির কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে মহিলাদিগের যাইবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। কেশবচন্দ্র ভারত-বর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে পর্দ্দার আড়ালে মহিলাদিগের জন্য স্বতন্ত্র বসিবার স্থান করিয়া দিলেন। ক্রমে একদল ব্রাহ্ম নিজেদের পরিবারের মহিলাদিগকে এইরূপ পর্দ্দানসীন করিয়া রাখিতে রাজী হইলেন না। যাহাতে ইঁহারা পর্দ্দার বাহিরে বসিতে পারেন, ব্রহ্মমন্দিরে তাহার ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন। এই লইয়া কেশবচন্দ্র ও তাঁহার প্রচারকদিগের সঙ্গে ইঁহাদের বিষম বিরোধ বাধিয়া উঠিল। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি এই সংগ্রামের অধিনায়ক ছিলেন। স্বাধীনতাবাদীরা জয়লাভ করিলেন বটে; ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদের জন্য প্রকাশ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল; কিন্তু এ বিরোধের বীজ নষ্ট হইল না। ফলতঃ এই সংগ্রামটা কেবল স্ত্রী-স্বাধীনতা লইয়াই ছিল না। ইহার মূল কারণ ছিল, কেশবচন্দ্রের একনায়কত্ব বা একাধিপত্য। মহর্ষিকে ছাড়িয়া আসিবার সময় কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-পরিচালনায় একরূপ গণতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা সময়ে ব্রাহ্ম সাধারণের প্রকাশ্য সভায় কেশবচন্দ্রের নিজের রচিত এই মন্তব্যটী গৃহীত হয়।

"Whereas the trustees of the Calcutta Brahmo Samaj have taken over to themselves the charge of the whole property of the said Samaj and the connections of the public with the said property have ceased, and whereas the money subscribed by the public should be spent with the consent of the public, it is resolved at this meeting that the subscribers or members of the Brahmo Samaj be formally organised into a Society, and that subscriptions be spent in accordance to their wishes for the propagation of Brahmoism."

এই আদর্শ অনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য ব্রাহ্মসাধারণের এক প্রতিনিধি সভাও গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু কাজে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপরিচালনায় এই গণতন্ত্র আদর্শ গড়িয়া উঠিতে পারিল না। কলিকাতা সমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যেরূপ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজেও সেইরূপ কেশবচন্দ্রের একতন্ত্র-শাসন বা অটোক্র্যাসি (autocracy) প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বাধীনচেতা ব্রাহ্মেরা এই জন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত "সমদর্শী" নামক বাঙ্গলা পত্র এই প্রতিবাদী দলের মুখপত্র হইল। যে যুক্তির ও ব্যক্তিগত ধর্ম্মবুদ্ধির বা conscience এর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইয়াছিল, "সমদর্শী" সেই আদর্শেরই প্রচার করিতে লাগিল। এই পত্রের লেখকেরা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সকল

মতবাদের উপরে প্রখর যুক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার সত্যাসত্যের বিচার করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর আছেন কি না, ঈশ্বরের উপাসনার আবশ্যকতা কি, প্রার্থনার যুক্তিযুক্ততা এবং উপকারিতা, পরলোক আছে কি নাই, ধর্ম্মের এই সকল মূল প্রশ্ন লইয়া ইঁহারা নির্ভীকভাবে সর্ব্ব সংস্কার বর্জিত হইয়া বিচার করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে কেশবচন্দ্র যে বৈরাগ্যের সাধন করিতেছিলেন এবং যে ভাবুকতাপ্রবণ ভক্তিবাদ ব্রাহ্মসমাজে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহারাও তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র যে নিরঙ্কুশ যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে সংযত করিয়া আনিবার চেস্টা করিতেছিলেন এবং এই জন্য 'প্রেরিত মহাপুরুষবাদ' ও 'ঈশ্বর আদেশবাদ' প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মমতের আশ্রয় লইয়াছিলেন, "সমদর্শীর" দল সেই নিরঙ্কুশ যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শকেই ব্রাহ্মসমাজে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেস্টা করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের প্রকৃতির মধ্যেও একটা রক্ষণশীলতা ছিল। এই রক্ষণশীলতার প্রেরণায় তিনি ধর্ম্মনীতির নামে মানবপ্রকৃতির সহজ স্বাধীনতাকে কোনও কোনও দিকে আটকাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। এই জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজেও একটা স্বাধীনতার সংগ্রাম বাধিয়া উঠে। কুচবেহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইলে এই বিরোধটা ফুটিয়া উঠে; এবং মহর্ষির নেতৃত্বাধীনে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ একদিন যেমন ভাঙিয়া দুইভাগ হইয়াছিল, কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজও সেইরূপ ভাঙিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল। কেশবচন্দ্র স্বাধীনতার সংগ্রামের সেনানায়করূপেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠায় দেশের শিক্ষিত সাধারণের সহানুভূতি পাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিলে,

বিশেষতঃ তিনি যে পরিমাণে ধর্ম্মসাধনে ও ধর্ম্মজীবন-গঠনে যুক্তিকে বর্জন করিয়া বিশ্বাসকে আশ্রয় করিতেছিলেন, সেই কারণে ও সেই পরিমাণে দেশের শিক্ষিত সাধারণের উপরে তাঁহার প্রভাব হ্রাস হইতেছিল। ব্রাহ্ম মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ না করিয়াও সেকালে নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে স্বাধীনতার সাধকরূপে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। ক্রমে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সে শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলেন। এই জন্য কুচবেহার বিবাহের পরে ব্রাহ্মসমাজে যখন আবার একটা স্বাধীনতার সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল, তখন দেশের শিক্ষিত লোকমত স্বাধীনতার পক্ষপাতী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দিকে ঝুকিয়া পড়িল। এই নূতন ব্রাহ্মসমাজে পুনরায় যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতে লাগিল।

(৩)

ব্রাহ্মসমাজে যখন এইরূপে ভাঙ্গাভাঙ্গি ও ভাগাভাগি হইতেছিল, তখন ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে দেশের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও চারিদিকে একটা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠিতেছিল। ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্ম এবং সমাজ-সংস্কার লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। এই সংস্কার-কার্য্যে ব্রাহ্মেরা দেশের রাজপুরুষদিগের সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দু-সমাজের সঙ্গেই এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ ছিল। হিন্দুসমাজ যথাসাধ্য ব্রাহ্মদিগকে নির্য্যাতনও করিতে ছাড়েন নাই। ব্রাহ্মেরা দেখিলেন যে হিন্দু যদি দেশের রাজা থাকিতেন, তাহা হইলে খৃষ্ট-ধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে রোমক সাম্রাজ্যে খৃষ্টীয়ানদিগের যে দশা হইয়াছিল, এই হিন্দুরাজ্যে ব্রাহ্মদিগেরও সেই দশাই হইত। ইংরাজরাজ এ দেশে প্রত্যেক প্রজাকে তাহার

ধর্ম্মসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা দিয়াছে বলিয়াই ব্রাহ্মেরা নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী চলিতে পারিতেছেন। ইংরাজ-রাজপুরুষেরা প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদের এই সংস্কার-ব্রতের প্রশংসা করিতেন। এই সকল কারণে ব্রাহ্মসমাজে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা প্রথম প্রথম ভাল করিয়া জাগিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ যখন কেবল ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, সে সময়ে দেশের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে অল্পে অল্পে একটা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণাও জাগিয়া উঠিতেছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের একনায়কত্বের প্রতিবাদিগণ অনেকেই একটা সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার আদর্শের প্রেরণায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাঁদের কেহ কেহ সেকালের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেরও নায়কত্বলাভ করেন। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় ভারতসভার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়েন। কুচবেহার বিবাহের প্রায় একসময়ে ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা হয়। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ভারত-সভার সহকারী-সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ভারত-সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ইঁহারা সকলেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের একনায়কত্বের বিরোধী ছিলেন। যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন, ইঁহারা তাহাদের অগ্রণী ছিলেন। সুতরাং কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে নূতন স্বাধীনতার আদর্শ যতটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে তাহা তদপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিতে লাগিল। আনন্দমোহন বসু এবং শিবনাথ শাস্ত্রী উভয়ের মধ্যেই একটা গভীর স্বদেশ-প্রেমেরও প্রেরণা ছিল। শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে সর্ব্বপ্রথমে স্বদেশের স্বাধীনতার আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। কেশবচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত উপাসনা প্রণালীতে জগতের

কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যরূপে প্রথম প্রথম সামাজিক উপাসনাতে স্বদেশের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত করেন। এ সময়ে তিনি স্বদেশের মুক্তি-কামনায় যে সঙ্গীত রচনা করেন, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত পুস্তকে বোধ হয় সেইটীই একমাত্র স্বদেশী সঙ্গীত। এখনকার ব্রাহ্মেরা সেই সঙ্গীতটী প্রায় ব্যবহার করেন না বলিয়া লোকে তার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। এইজন্য সেই সঙ্গীতটী তুলিয়া দিলাম।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

তব পদে লই শরণ, প্রার্থনা কর গ্রহণ।
আর্য্যদের প্রিয় ভূমি সাধের ভারত ভূমি
অবসন্ন আছে অচেতন হে;
একবার দয়া করি, তোল করে ধরি,
দুর্দ্দশা-আঁধার তার করহ মোচন।
কোটি কোটি নরনারী, ফেলিছে নয়নবারি
অন্তর্যামি জানিছ সে সব হে;
তাই প্রাণ কাঁদে, ক্ষম অপরাধে
অসাড় শরীরে পুন দেও হে চেতন।
কত জাতি ছিল হীন অচেতন পরাধীন
কৃপা করি আনিলে সুদিন হে;
সেই কৃপাগুণে . দেখি শুভক্ষণে
সাধের ভারতে পুন আন হে জীবন ॥

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার কালে তাহার নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবার সময়ে আমরা কেবল ব্রাহ্মসমাজের কথাই ভাবি

নাই কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের ছবিটাই আমাদিগের চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল। নূতন ব্রাহ্মসমাজে আমরা আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নমুনা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলাম। ইংলণ্ডের, আমেরিকার এবং ফরাসীদের রাষ্ট্রীয় শাসন-তন্ত্রের পরীক্ষা করিয়া তাহারই ছাঁচে আমাদিগের অবস্থার উপযোগী করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের Constitution (কনষ্টিটিউসন) গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমরা কেবল একটা সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মসমাজই গড়িয়া তুলিতে চাহি নাই। আমাদের ব্রাহ্মসমাজ যে ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রশক্তির বা Stateএর আসনে যাইয়া বসিবে গোটা দেশটা ব্রাহ্ম হইয়া যাইবে এবং তাহার ফলে রাষ্ট্র ও ধর্ম্মসমাজ এক হইয়া উঠিবে এরূপ অদ্ভুত কল্পনাও করি নাই। কিন্তু স্বাধীনতার এবং মানবতার সাধকরূপে ব্রাহ্মসমাজ যেমন একটা আদর্শ-পরিবার ও একটা আদর্শ-সমাজের প্রতিচ্ছবি গড়িয়া তুলিবার উচ্চ আকাঙ্খা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিল, সেই স্বাধীনতার ও মানবতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিয়া একটা আদর্শ রাষ্ট্রযন্ত্র বা রাষ্ট্রতন্ত্রও গড়িয়া তুলিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিল। এই ভাবের প্রেরণাতেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কনষ্টিটিউসনের মধ্যে আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের কনষ্টিটিউসনের একটা ছোট খাট নমুনা দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমরা ভাবিয়াছিলাম যে এই ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মেরা গণতন্ত্রতা মক্স করিবেন। দেশের লোকেও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপ্রণালীর ভিতর এই গণতন্ত্রতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন। এইভাবে ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে অতি উচ্চ অঙ্গের রাষ্ট্রীয় শিক্ষাও বিস্তার করিতে পারিবেন। নিজেদের

কর্ম্মদোষে এ আশা ফলবতী হয় নাই। কিন্তু এইজন্য চেষ্টার মূল্যও নষ্ট হয় নাই

(৪)

ফলতঃ ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মাচার্য্যদিগের মধ্যে শাস্ত্রী মহাশয়ের ভিতরে স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শ যতটা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আর কাহারও মধ্যে ততটা ফোটে নাই। প্রথম যৌবনাবধি এই স্বাধীনতা এবং মানবতাই তাঁহার ধর্ম্মের মূল উপাদান হইয়া ছিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গৃহে জন্মিয়া, পরানুগ্রহে উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিয়া, শিবনাথ শাস্ত্রী সেই শিক্ষাকে কোনও দিন নিজের সাংসারিক উন্নতিসাধনে নিযুক্ত করেন নাই। মহর্ষি এবং ব্রহ্মানন্দ উভয়েই ধনসমৃদ্ধির মধ্যে জন্মিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন, জীবনে 'গুণরাশি-নাশী' দারিদ্র্য-দুঃখ যে কি ইহা ভোগ করেন নাই। শিবনাথ শাস্ত্রী ইচ্ছা করিলে ধনকুবের না হউন কিন্তু সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দতার মধ্যে অনায়াসে দিন কাটাইয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু সেদিকে কোনও দিন তাঁহার লোভ ছিল না। তাঁহার নিকটে সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় বস্তু ছিল স্বাধীনতা। তাঁহার নিকটে এই স্বাধীনতাই ধর্ম্ম ছিল। প্রথম বয়সে তিনি সরকারী শিক্ষা-বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন; হেয়ার স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু বেশীদিন তাঁহাকে হেয়ার স্কুলে পড়িয়া থাকিতে হইত না। প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার অবসর লইবার কথা। তিনি অবসর লইলে প্রেসিডেন্সি কলেজের সহকারী সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে শিবনাথ শাস্ত্রীই প্রতিষ্ঠিত হইতেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। আর সেখান হইতে ক্রমে তিনি যে সংস্কৃত কলেজের

অধ্যক্ষের পদে যাইয়া বসিতেন, একথাও ঠিক। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী এই লোভে পড়িলেন না।

স্বদেশের সেবাতে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্যই তিনি ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন। সে সময়ে আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতায়, শিশিরকুমারের 'অমৃতবাজার', বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ,' এবং অক্ষয়-চন্দ্রের 'সাধারণী'র লেখায়, 'বঙ্গদর্শনের' ও 'আর্য্যদর্শনের' আলোচনায়, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রের কবিতায়, দীনবন্ধু এবং উপেন্দ্রনাথ ও মনোমোহনের নাটকে এবং কলিকাতার ন্যাশন্যাল্ থিয়েটার ও বেঙ্গল থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে একটা প্রবল স্বদেশপ্রেমের বন্যা ছুটিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ যে স্বাধীনতার আদর্শকে ধর্ম্মসাধনে ও পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহাকেই রাষ্ট্রীয় শাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দেশের শিক্ষিত লোকেরা লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীনতার সাধকেরা এই স্বদেশপ্রেমকে তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের আদর্শের অঙ্গীভূত করিয়া নিজেদের স্বাধীনতার আদর্শকে পরিপূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গীণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজের এই স্বাধীনতার সাধকদিগের অগ্রণী হইয়া উঠেন।

এই সময়েই শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনিই আমাদের স্বাধীনতার সাধনার ও স্বদেশ-চর্য্যার প্রথম দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। তাঁহার নায়কত্বে আমরা ক'জন মিলিয়া একটা ছোট দল গড়িবার চেষ্টা করি। আমাদের প্রতিজ্ঞা-পত্রের প্রথম কথা ছিল—"স্বায়ত্ব-শাসনই (তখনও স্বরাজ-শব্দের প্রচার হয় নাই) আমরা একমাত্র বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি।" অর্থাৎ যে শাসন স্বায়ত্ব-শাসন নহে, শাসিতের উপরে ধর্ম্মতঃ তাহার কোনও অধিকার আছে বলিয়া আমরা মানি না। "তবে দেশের বর্ত্তমান

অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের আইন-কানুন মানিয়া চলিব—কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দ্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও এই গভর্ণমেণ্টের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিব না।"

এই প্রতিজ্ঞা-পত্রের দ্বিতীয় কথা ছিল—"আমরা জাতিভেদ মানিব না; পুরুষের পক্ষে একুশ বৎসরের পূর্ব্বে এবং রমণীর পক্ষে ষোল বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করিব না, বিবাহ দিব না এবং বিবাহে সাহায্য করিব না।" তৃতীয় কথা ছিল—"লোকশিক্ষা প্রচারে প্রাণপণ যত্ন করিব।" চতুর্থ কথা ছিল—"অশ্বারোহণ, বন্দুক ছোড়া (তখনও অস্ত্র-আইন প্রচলিত হয় নাই) প্রভৃতি নিজেরা অভ্যাস করিব এবং অপরকে অভ্যাস করিতে প্রণোদিত করিব।" পঞ্চম কথা ছিল—"আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জ্জন বা রক্ষা করিব না, যে যাহা অর্জ্জন করিবে তাহাতে সকলের সমান অধিকার থাকিবে, এবং সেই সাধারণ ভাণ্ডার হইতে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিয়া স্বদেশের হিতকর কর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিব।"

শাস্ত্রী মহাশয় তখনও হেয়ার স্কুলে পণ্ডিতী করেন। এইজন্য প্রথম দীক্ষার দিনে তিনি এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইহার ছয়মাস পরে সরকারের কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া তিনি নিয়মমত দীক্ষা লইয়া এই দলভুক্ত হয়েন। দলটা যে খুব বড় ছিল তাহা নহে। স্বর্গীয় কালীশঙ্কর সুকুল, হেলেনা কাব্য, মিত্র কাব্য, ভারত-মঙ্গল প্রভৃতি রচয়িতা স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র মিত্র, সেকালের ব্রাহ্মসমাজের সুপরিচিত এবং সকলের শ্রদ্ধাভাজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায়, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী, (ইনি পরে ব্রজবিদেহী সন্ত দাস নামে ভারতবর্ষের বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত), শ্রীযুক্ত ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস এবং আমি—আমরা এই

কয়জনই প্রথমদিন এই দীক্ষা গ্রহণ করি। ইহার পরে শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোম ও শ্রীযুক্ত উমাপদ রায়, ইঁহারা এই দলভুক্ত হয়েন। ইহা ১৮৭৬-৭৭ ইংরাজীর কথা। আমরা এই প্রতিজ্ঞার সকলগুলিই যে রক্ষা করিতে পারিয়াছি, একথা বলিতে পারি না। যে কমিউনিজিমের (Communism) আদর্শে আমরা এই দলটা বাঁধিতে গিয়াছিলাম, অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে না, সাধারণ অর্থভাণ্ডারে নিজ নিজ উপার্জ্জিত অর্থ দান করিব, এবং সেই ভাণ্ডার হইতে প্রয়োজনপোযোগী বৃত্তি লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিব,—এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই, কিন্তু অন্যান্য প্রতিজ্ঞাগুলি সকলেই রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের দীক্ষা গ্রহণের কিছুদিন পরেই ব্রাহ্মসমাজে কুচবেহার বিবাহ লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেরও প্রতিষ্ঠা হয়। শাস্ত্রী মহাশয় সমাজের আচার্য্য ও প্রচারক নিযুক্ত হন। সমাজের কর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াতে আমাদের এই দল-গঠনের প্রতি তিনি আর মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। আমরাও অনেকে অপরিণত বয়স্ক শিক্ষার্থী যুবকমাত্র ছিলাম। সুতরাং এই দলটী আর গড়িয়া উঠিল না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের ইতিহাসের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ এক সময় যে সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার আদর্শের পানে ছুটিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মসমাজের সে মুক্তধারা আজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই জন্যই দেশের উপরে তাহার প্রভাবও কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজ একদিন এদেশে এই যুগে স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শকে ফুঠাইয়া তুলিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিল, ইতিহাস কখনই তাহা ভুলিতে পারিবে না।

অষ্টম কথা

রাজনারায়ণ বসু ও স্বাদেশিকতার উন্মেষ

বাংলার নবযুগের কথায় স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জীবন ও সাধন উপেক্ষা করা সম্ভব নহে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কিম্বা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, এমন কি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও দেশবিদেশে যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, রাজনারায়ণ বসুর সে প্রতিষ্ঠা ছিল না। মহর্ষি, ব্রহ্মানন্দ এবং শাস্ত্রী মহাশয়, তিনজনই এক একটা সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পিছনে এরূপ কোনও দল ছিল না। সুতরাং তাঁহার যশ ও খ্যাতি ততটা পরিমাণে চারিদিকে ছড়াইয়াও পড়ে নাই।

রাজনারায়ণ বসুর বিশেষ প্রতিষ্ঠা বাংলা সাহিত্যে। আর এ ক্ষেত্রেও তিনি যে অনেক বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। তবে যে দু'তিন খানা বই লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই সে সময়ের বাংলা সাহিত্যে তাঁহার একটা প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাঁর "একাল ও সেকাল" বাংলা সাহিত্যে একখানা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বসু মহাশয় আদি ব্রাহ্মসমাজের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার'ও একজন লেখক ছিলেন। আধুনিকভাবে বাংলাভাষায় তিনিই প্রথমে ধর্ম্মবিজ্ঞানের বা Science of Religionএর আলোচনা করেন। তাঁহার "ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা" বাংলা ভাষায় ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় প্রথম গ্রন্থ। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" রাজ নারায়ণ বসুর আর একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থে বসু মহাশয়ের মনীষা এবং স্বদেশ-প্রীতির বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু বাংলার নবযুগের ইতিহাসে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রতিষ্ঠা এই সকল গ্রন্থ দ্বারা হয় নাই। তাঁহার "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব"—বিষয়ক বক্তৃতা এবং বাংলাদেশের ইংরাজীনবীশদিগের মধ্যে স্বজাত্যাভিমানের অনুশীলন করিবার জন্য তিনি যে চেষ্টা করেন, তাহার দ্বারাই বাংলার নবযুগের ইতিহাসে রাজনারায়ণ বসুর নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ তাঁহার দৌহিত্র। এই প্রসঙ্গে আমাদের গত স্বদেশী আন্দোলনের সময় কেহ কেহ রাজনারায়ণ বসুকে Grand-father of Indian Nationalism বা ভারতের জাতীয়তার পিতামহ এই উপাধি দিয়াছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ তাঁহার দৌহিত্র না হইলেও এই কথাটা সর্ব্বতোভাবে সত্য হইত। কারণ এই বাংলাদেশে রাজনারায়ণ বসুর শিক্ষাদীক্ষাই সর্ব্বপ্রথমে স্বাদেশিকতার স্রোত আনিয়াছিল। আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বেই বসু মহাশয় স্বর্গারোহণ করেন। কিন্তু তিনি 'আত্মচরিতে' লিখিয়াছেন যে একজন তাঁহাকে Grand-father of Nationalism এই উপাধি দিয়াছিলেন।

সে কালের ইংরাজী নবীশদিগের মতন প্রথম যৌবনে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও পাশ্চাত্য সাধনার প্রভাবে সংশয়বাদী হইয়া উঠেন। তিনি নিজেই কহিয়াছেন,--

"কলেজ পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে আমি সংশয়বাদী হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রীর ও আমার পিতার মৃত্যু আমাকে প্রকৃতিস্থ করিল। পুনরায় ধর্ম্মে আমার বিশ্বাস হইল; কিন্তু এবার আমার পৈতৃক ও সে সময়ের তত্ত্ববোধিনী সভার প্রচারিত বৈদান্তিক ধর্ম্মে বিশ্বাস হইল। লালা হাজারীলাল প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন। ইঁহার বাটী ইন্দোরে ছিল, ইঁহার একটি প্রণবাঙ্কিত স্বর্ণাঙ্গুরী ছিল।

তখন যে ব্রাহ্ম হইত তাহাকে একটী ঐরূপ স্বর্ণাঙ্গুরী দেওয়া হইত। প্রণবের নীচে পারস্য ভাষায় 'ইঁ হাম্ নমাহদ্ মান্দ্'—'এইরূপ রহিবে না', এই বাক্য অঙ্কিত ছিল। এই বাক্য দেখিতে পাইলে বিপদের সময় সম্পদের অবস্থা মনে পড়িবে, এবং সম্পদের সময় বিপদের অবস্থা মনে পড়িবে—এই জন্য ঐ বাক্য অঙ্গুরীতে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। লালাসাহেব প্রতিদিন প্রাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞা পত্র অনেক-গুলি সঙ্গে করিয়া লইয়া বাহির হইতেন, দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে সেগুলি স্বাক্ষর করাইয়া আনিয়া হাজির করিতেন।

"যেদিন প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করিয়া (ইংরাজী ১৮৪৬ সালের প্রারম্ভে) ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি, সেদিন আমি স্বগ্রামের দু একজন বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সহিত তাহা করি। যেদিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি সেদিন বিস্কুট ও শেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করা হয়। জাতি বিভেদ আমরা মানি না, উহা দেখাইবার জন্য উহা করা হয়। খানা খাওয়া ও মদ্যপান করা রীতির জের রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদিগের সময় পর্য্যন্ত টানিয়াছিল, কিন্তু সকলেই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের দিন ঐরূপ করিতেন এমন নহে।.........ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাতে আমার কলেজের সমাধ্যায়ীরা আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে এক অদ্ভুত জীব মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই সংশয়বাদী অথবা ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন ছিলেন। কলেজের উত্তম ছোকরা যে ব্রাহ্ম হইতে পারে ইহা তাঁহাদিগের স্বপ্নের অগোচর ছিল।"

কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বোধ হয় কোনও দিনই জাতীয়তা বা Nationality র আদর্শ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে তিনি এক পত্র লেখেন। এই পত্রে তিনি মহর্ষিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে অনুরোধ করেন। ঐ

গ্রন্থের প্রথম ভাগে বেদের, দ্বিতীয় ভাগে স্মৃতির ও তৃতীয় ভাগে ইতিহাস, পুরাণ ও তন্ত্রের বাছা বাছা শ্লোক সকল থাকিবে। তখনও মহর্ষি তাঁহার 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ রচনা করেন নাই। এই সূত্রেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পরিচয় ও আত্মীয়তা আরম্ভ হয় এবং রাজনারায়ণ বসু তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনে উপনিষদের ইরাজী অনুবাদকের কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন।

(২)

রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু মহাশয় রামমোহন রায়ের স্কুলে ইংরাজী পড়িয়াছিলেন। বর্ত্তমান হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে এক স্কুল ছিল। নন্দকিশোর বসু মহাশয় স্কুল ছাড়িয়া কিছুদিন রামমোহন রায়ের সেক্রেটারীর কাজ করেন। ব্রহ্ম-সভা সংস্থাপনের পরে যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে রামমোহন রায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, নন্দকিশোর বসু মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। নন্দকিশোর রামমোহন রায়ের শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়া একদিকে যেমন বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানের এবং নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার অনুরাগী হয়েন, সেইরূপ অন্যদিকে স্বদেশের প্রতিও অত্যন্ত অনুরাগী হইয়া উঠেন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় পিতার নিকট হইতেই অজ্ঞাতসারে বৈজিক নিয়মাধীনে তাঁহার আমরণসাধ্য সরল ও সতেজ স্বাদেশিক-তার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই জন্যই তাঁহার সমসাময়িক বাঙ্গালীরা ইংরাজী পড়িয়া যতটা পরিমাণে ইংরাজের অনুকরণের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, রাজনারায়ণ বসু সেরূপ ব্যগ্র হন নাই।

মহর্ষির সঙ্গে বন্ধুতাও বসু মহাশয়ের এই স্বাদেশিকতাকে বিশেষ-ভাবে পরিপুষ্ট করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ ইংরাজদিগের সঙ্গে কিছুতেই

মেশামেশি করিতে চাহিতেন না। মিস্ কার্পেন্টার এদেশে আসিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। মিস্ কার্পেন্টারের পরিবারবর্গের সঙ্গে বিলাতে রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। সেই সূত্রেই তিনি কলিকাতায় আসিয়া মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে আলাপ-পরিচয় করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠেন। একথা শুনিয়া মহর্ষি কলিকাতা ছাড়িয়া তাঁহার জমিদারীর নিকটস্থ কুষ্টিয়া উপনগরে পলাইয়া যান। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার "আত্মচরিতে" লিখিয়াছেন :—

"দেবেন্দ্রবাবু স্বভাবতঃ ইংরাজের সঙ্গে আলাপ করিতে অনিচ্ছুক। যেহেতু ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বিষয়ে তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার মতের মিল হয় না। ইংরাজের মতানুমোদন করিয়া চলিলে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়, কিন্তু দেবেন্দ্রবাবু ইংরাজদিগের নিকট প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য আদবে ব্যগ্র নহেন। কৃষ্ণনগরের প্রিন্সিপ্যাল লব (Lobb) সাহেব কোনও সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন—"The proud old man does not condescend to accept the praise of Europeans."

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এই প্রকৃতিগত স্বাজাত্যাভিমানও বোধ হয় বসুজ মহাশয়ের প্রকৃতিগত স্বাজাত্যাভিমানকে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। পানাহার বিষয়ে রাজনারায়ণ বসু হিন্দু সমাজের কোন আচার বিচারই মানিতেন না। সমাজ-সংস্কার কার্য্যে তিনি কখনই পেছ্‌পাও হন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ সংস্কারের তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং বিধবাবিবাহ আইন পাশ হইবার পরে নিজের পরিবারে ইহা অকুতোভয়ে প্রচলিত করেন। এই আইন অনুসারে প্রথম বিবাহ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের। বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রথমে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন, পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েন।

রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন :—

"যে দিন তাঁহার বিবাহ হয় সে দিন কলিকাতার লোক এমন চমকিত হইয়াছিল যে যুগ উল্টানের ন্যায় একটা কি ভয়ানক ঘটনা হইতেছে। মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ কলিকাতার অধিকাংশ ইংরাজীতে কৃতবিদ্য লোক বরের পাল্কীর সঙ্গে পদব্রজে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিধবাবিবাহ পাণিহাটীর মধুসূদন ঘোষ করেন। তৃতীয় বিধবা-বিবাহ ও চতুর্থ বিধবাবিবাহ আমার জেঠতুত ভাই দুর্গানারায়ণ ও আমার সহোদর মদনমোহন বসু করেন। এই বিধবাবিবাহ দেওয়াতে আমার খুড়া মহাশয় বোড়াল হইতে আমাকে লেখেন যে তোমার দ্বারা আমরা কায়স্থকুল হইতে বহিষ্কৃত হইলাম। দুর্গানারায়ণ বসু যখন বিধবাবিবাহ করিতে যাইতেছিলেন, তখন গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মুখুজ্যে তাঁহার পাল্কীর ভিতর মুখ দিয়া বলিলেন—'দুর্গা, তোর মনে এই ছিল, একেবারে মজালি'। বোড়ালের লোকে বলিয়াছিল যে 'রাজনারায়ণ বসু গ্রামে আসিলে আমরা ইট মারিব'। তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম, 'তাহাতে আমি খুসী হইব, আমি বাঙ্গালীকে উদাসীন জাতি বলিয়া জানি। এইরূপ ঘটনা হইলে আমি স্থির করিব যে তাঁহাদিগের বিধবাবিবাহের প্রতি বিদ্বেষ যেমন প্রবল, তেমনি বিধবাবিবাহ যখন ভাল মনে করিবেন, তখন উহার প্রতি তাঁহাদিগের অনুরাগ এইরূপ প্রবল হইবে'।"

রাজনারায়ণ বসু তখন মেদিনীপুর স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। মেদিনীপুরেও এই লইয়া কম আন্দোলন হয় নাই। মেদিনীপুরের তখনকার উকীল-সরকার হরনারায়ণ দত্ত বলিয়াছিলেন যে 'রাজনারায়ণ বসু জানেন না কি তিনি বাংলা ঘরে বাস করেন, অর্থাৎ আমরা ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে তাহা পুড়াইয়া দিতে পারি।' সে সময় এই লইয়া একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হইতে পারে, এই আশঙ্কাও হইয়াছিল। রাজ-

নারায়ণ বসু লিখিয়াছেন যে এইজন্য তিনি ও তাঁহার স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক উত্তরপাড়াবাসী বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (যিনি পরে সংস্কৃত কলেজের হেড্‌-মাষ্টার হইয়াছিলেন) ইঁহারা দুজনে মেদিনীপুরের নিকটে জঙ্গলে যাইয়া দুইটা মোটা লাঠি কাটিয়া লইয়া আসেন। 'যদি দাঙ্গা হয়, সেই সময় আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করা যাইবে।' রাজনারায়ণ বসুর এই ক্ষাত্রভাবটা বোধ হয় জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রবল ছিল। আমি যখন তাঁহার প্রথম দর্শনলাভ করি, তখন রাজনারায়ণ বসুর বয়স ষাটের কাছাকাছি গিয়াছে, দাড়ি ও চুল সাদা হইয়া উঠিয়াছে। শরীরটাও যে খুব দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ছিল এমন নহে। কিন্তু সেই বয়সে, সেই শরীর লইয়া, সেই প্রথম দেখার দিনেই কথা-প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন :—"আমি বেশী দিন বাঁচব এমন আশা ত করি না। কিন্তু মরিবার আগে আমার দেশের একটা শত্রুকেও যদি নিজের হাতে নিপাত করিয়া যাইতে পারি, তবে জন্মটা সার্থক হইল মনে করিব।" •

(৩)

রাজনারায়ণ বসু সেকালের ইংরাজী-নবীশদিগের মতন প্রখর যুক্তিবাদী ছিলেন। এই যুক্তিবাদই তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজে টানিয়া আনে। কিন্তু এই যুক্তিবাদ তাঁহাকে নাস্তিকও করিতে পারে নাই বা বিদেশের অনুচীকির্ষাতে প্রণোদিত করিতেও সমর্থ হয় নাই। ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারে সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের অগ্রণীদল-গণ্য হইলেও রাজনারায়ণ বসু স্বদেশের সভ্যতা এবং সাধনার প্রতি কখনও শ্রদ্ধাহীন হয়েন নাই। দেশ-প্রচলিত প্রতিমা-পূজা বর্জ্জন করিয়াও তিনি বেদ ও উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান যে জগতের সকল ধর্ম্মতত্ত্বের অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠতর, একথা সর্ব্বদাই প্রচার

করিতেন। কিন্তু স্বদেশের ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতি এই অকৃত্রিম অনুরাগ তাঁহাকে অন্যান্য দেশের ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাহীন করে নাই। রাজনারায়ণ বসু ইংরাজীতে বিশেষ কৃতবিদ্য ছিলেন। সুতরাং খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল্ প্রভৃতি খুব ভাল করিয়াই পড়িয়াছিলেন। রামমোহন রায় যেমন বাইবেলের সার-সংগ্রহ করিয়া Precepts of Jesus প্রচার করিয়াছিলেন, রাজনারায়ণ বসুও সেইরূপ একখানি সার-সংগ্রহ করেন, এবং Hindu Theist's Brotherly Gift to English Theists এই নামে উহা ছাপাইয়া প্রচার করিবার ভার তাঁহার জামাতা 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের উপরে অর্পণ করেন। রাজনারায়ণ বসু খুব ভাল ফার্শী জানিতেন। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র হইতেও একখানি অনুরূপ গ্রন্থ সংকলন করিয়াছিলেন। সেখানি মুদ্রিত হইয়াছিল কিনা জানি না। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা সত্ত্বেও রাজনারায়ণ বসু এদেশে হিন্দুর পক্ষে "সুমহৎ বেদ-বেদান্ত অবলম্বন" করিয়াই ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মপ্রচার করা উচিত, ইহা মনে করিতেন; এবং ব্রহ্মযোগ ও ব্রহ্মসাধন বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মই জগতের সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা বিশ্বাস করিতেন। সেই জন্য রাজনারায়ণ বসু কখনই নিজেকে কেবল Theist বা একেশ্বরবাদী কহিতেন না; বিদেশীয়দিগের সঙ্গে পত্র-ব্যবহারে সর্ব্বদাই নিজেকে Hindu Theist বলিয়া বর্ণনা করিতেন। রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াও একদিনের জন্য নিজের হিন্দুত্বের গৌরব বিস্মৃত হন নাই।

তাঁহার স্বর্গারোহণের পূর্ব্ব বৎসর ১৮৯৮ ইংরাজীতে আমি বিলাতের ব্রিটিশ এবং ফরেন য়ুনিটেরিয়ান এসোসিয়েসনের (British & Foreign Unitarian Association) বৃত্তি লইয়া অক্সফোর্ডে য়ুনিটেরিয়ানদিগের নিউ ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজে তত্ত্ববিদ্যা ও

খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িতে যাই। বিলাত যাত্রা করিবার পূর্ব্বে দেওঘরে যাইয়া রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে দেখা করিয়া আসি। একদিন মাত্র তাঁহার বাড়ীতে ছিলাম। কিন্তু সেদিনের কথা জীবনে ভুলিতে পারিব না। সেই দিন সর্ব্বপ্রথমে বসু মহাশয়ের জীবনব্যাপী ব্রহ্মসাধনের সঙ্কেতটী ধরিতে পারিয়াছিলাম। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন ধর্ম্মপ্রচার ব্রত গ্রহণেচ্ছু ব্রাহ্ম যুবক তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। বসু মহাশয় তাঁহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে কি ?" প্রশ্নটা শুনিয়াই বেচারী থতমত খাইয়া যান। বসু মহাশয় তখন কহেন, "ব্রহ্মদর্শন লাভ যাহার হয় নাই, সে আবার ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবে কি করিয়া ?" কথাটা শুনিয়া আমিও চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, রাজনারায়ণ বসুর ধর্ম্মপ্রচারের আদর্শ কতটা উচু। যে নিজে সিদ্ধি লাভ করে নাই, সে অপরকে সিদ্ধির পথে পরিচালিত করিবে কিরূপে ? কথাপ্রসঙ্গে বসু মহাশয় আবার কহিলেন যে ব্রাহ্মসমাজে সচরাচর যেভাবে ব্রহ্মোপসনা হয়, তাহা সত্য উপাসনা নহে। একটী ব্রাহ্ম বন্ধুর নাম করিয়া কহিলেন, "অমুককে জান ত ? তিনি আমার এখানে আসিয়া কিছুদিন ছিলেন। আর প্রতিদিন দুবেলা চোক বুজিয়া কত কি বিড়বিড় করিয়া বকিতেন। এই তাঁহার ব্রহ্মোপাসনা ছিল। আমি একদিন বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কহিয়াছিলাম, "এই বিড়বিড় করিয়া কি কেবল ব'ক ? ইহাতে কি ব্রহ্মের উপাসনা হয় ? ব্রহ্মের উপাসনা যদি করিতে চাও তাহা হইলে ওই বাহিরে যাও, আর চোখ মেলিয়া একবার এই আকাশপানে তাকাইয়া দেখ।" বুঝিলাম, এই বৃদ্ধ সাধক কোন্ পথে ব্রহ্মজ্ঞান সাধন করিয়াছিলেন। আমার বিলাত যাইবার প্রসঙ্গ উঠিলে রাজনারায়ণ বসু কহিলেন, "দেখ, আমি বিলাত গিয়া ধর্ম্মশিক্ষার পক্ষপাতী নহি। তোমাদের শিবনাথের

মতন আমি বিলাতী শাস্ত্রী নহি। ইংরাজেরা ধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু শিখাইতে পারে এ বিশ্বাস আমি করি না। লাভের মধ্যে তাহাদের সংসর্গে আমাদের প্রকৃতি বিগড়াইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। তাদের যদি আমাদের ধর্ম্মকথা কিছু শুনাইয়া আসিতে পার, তাহা হইলে যাও। নতুবা তত্ত্বজ্ঞান বা ধর্ম্মলাভের আশায় সে দেশে যাইও না।"

আমরা ভারতবর্ষের লোক, বর্ত্তমানে যতই অধঃপতিত হই না কেন, জগতের একটা শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা ও সাধনার উত্তরাধিকারী বলিয়া মানবসমাজে আচার্য্যের আসনে আমাদের অধিকার আছে, চিরদিন রাজনারায়ণ বসুর এই বিশ্বাস ও অভিমান ছিল। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক বক্তৃতা প্রদান করেন। রাজনারায়ণ বসু নিজে কহিয়াছেন যে এই বক্তৃতাতেই পরবর্ত্তী হিন্দু পুনরুত্থানের বা Hindu Revivalএর ভিত্তির প্রতিষ্ঠা হয়। যেকালে এদেশের ইংরাজী-নবীশেরা হিন্দুধর্ম্মকে ভ্রম ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া ঘৃণা করিতেন, নূতন কৃতবিদ্য সমাজে হিন্দুর যাহা কিছু তাহাই উপেক্ষার বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে একজন ইংরাজী-নবীশের পক্ষে একদিকে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপাদি প্রকাশ্যভাবে বর্জ্জন করিয়াও অন্যদিকে হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করাতে কতটা সৎসাহস এবং স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আর এই স্বাজাত্যাভিমানের প্রথম পুরোহিত ও প্রচারকরূপেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বাংলার নবযুগের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবেন।

এখন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যকে এই বিদ্যা-মন্দিরের ভিতরে বরণ করিয়া তুলিয়া লইয়াছেন। কিন্তু একদিন ছিল যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য সন্তানেরা

বাংলা ভাষায় পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তাও কহিতেন না, পত্রব্যবহারও করিতেন না। অথচ সেই যুগেই কৃতবিদ্য রাজনারায়ণ বসু শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে বাংলা ভাষাটা চালাইবার জন্য ব্রতী হইয়াছিলেন। মেদিনীপুরে তাঁহাদের এক সভা ছিল। এই সভার মজলিসে সভ্যদিগকে খাঁটি বাঙ্গালাতে কথাবার্ত্তা কহিতে হইত। এসকল কথোপকথনে ইংরাজী শব্দের বুক্‌নী দেওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। যদি কোনও সভ্য কোনও ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিতেন, তাহার জন্য তাঁহার অর্থদণ্ড হইত। প্রত্যেক ইংরাজী শব্দের জন্য বোধহয় এক পয়সা করিয়া জরিমানা দিতে হইত। এই উপায়ে সভার অর্থাধারে বেশ দু'পয়সা সঞ্চিত হইত। এই সকলই রাজনারায়াণ বসুর আযৌবনসিদ্ধ স্বাদেশিকতার প্রমাণ।

(৪)

রাজনারায়ণ বসু কেবল ধর্ম্মে বা তত্ত্বজ্ঞানেই নিজের দেশকে জগতে বরেণ্য করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু যে সকল শক্তি এবং সাধনা থাকিলে একটা জাতি সর্ব্বতোভাবে মানবমণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠের পদবী প্রাপ্ত হয়, নিজের দেশবাসীদিগকে সে সকল শক্তি ও সাধনাসম্পন্ন করিবার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে স্বাজাত্যাভিমান ছিল না বলিলেই চলে। কৃতবিদ্যেরা নিজেদের হীনতাবোধে সর্ব্বদাই অবনত হইয়া থাকিতেন। বিদেশীয়েরা তাঁহাদের অপেক্ষা যে কত বড় ইহা ভাবিয়া তাঁহাদের মুখে স্বদেশের গৌরবের কথা ফুটিবার অবসর পাইত না। জনসাধারণও গতানুগতিকভাবে দেশে যাহা চলিয়া আসিয়াছিল তাহারই অনুবর্ত্তন করিলেও জ্ঞানের দ্বারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের বা গৌরবের কোনও হেতু আছে ইহা ধরিতে পারিত না। কৃতবিদ্যেরা

ইংরাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন। জনসাধারণে ইংরাজের অভ্যুদয় ও প্রবল প্রতাপের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত কাহারও মধ্যে ঈষৎ পরিমাণেও স্বাজাত্যাভিমান অঙ্কুরিত হয় নাই। সমাজের এই অবস্থায় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় একদিকে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া বক্তৃতা করেন, এবং অন্যদিকে "জাতীয় গৌরব সম্পাদনী" সভার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তিনি "আত্মচরিতে" লিখিয়াছেন :—

"এই সভার কার্য্যবিবরণ হইতে "Prospectus of a Society for the promotion of National Feeling among the educated natives of Bengal" রচিত হয়। হাইকোর্টের জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে যদি উক্ত সভা সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে তিনি তাহার সভাপতি হইবেন। ঐ পুস্তিকা হইতে বান্ধববর নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলার ভাব পান। তিনি ঐ মেলা ও তৎপরে জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন। "জাতীয় গৌরব সম্পাদনী" সভার সভ্যেরা 'good night' না বলিয়া 'সু-রজনী' বলিতেন। ১লা জানুয়ারী দিবসে পরস্পর অভিনন্দন না করিয়া ১লা বৈশাখ করিতেন ; আর ইংরাজী বাঙ্গলা না মিশাইয়া কেবল বিশুদ্ধ বাঙ্গালাতে কথা কহিতে চেষ্টা করিতেন।"

রাজনারায়ণ বসু বলিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার সমাধির উপরে তাঁহার বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত এই কথাগুলি যেন অঙ্কিত থাকে।

"প্রীতি অধ্যাত্মযোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্য্যের জীবন, প্রীতি ধর্ম্মপ্রচারের একমাত্র উপায়।

"স্বদেশীয় লোকের মন বিদ্যা দ্বারা আলোকিত ও সুশোভিত হইবে, অজ্ঞান ও অধর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, জ্ঞানামৃত পান ও যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে এবং জাতীয় ভাব রক্ষাপূর্ব্বক সভ্য ও সংস্কৃত

হইয়া মনুষ্যজাতি সমূহের মধ্যে গণ্য জাতি হইবে। এই মহৎ কল্পনা সুসিদ্ধ করিবার চেষ্টায় যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করতঃ সেই ব্যক্তি কি আনন্দিত থাকেন!"

এই কয়টি কথার ভিতরেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের চরিত্রের ও সাধনার মূল প্রকৃতিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানেই আমরা তাঁহার গভীর এবং আমরণসাধ্য স্বজাতিপ্রীতির এবং স্বাজাত্যাভিমানের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হই। আমাদের আধুনিক কৃতবিদ্যসমাজে এ বিষয়ে তিনিই প্রথম গুরু ছিলেন। তাঁহার Grand-father of Indian Nationalism উপাধি সর্ব্বতোভাবে সার্থক ছিল।

নবম কথা

হিন্দু মেলা ও নবগোপাল মিত্র

আজিকালিকার বাঙ্গালী বোধ হয় অনেকেই নবগোপাল মিত্রের নাম জানেন না, কিন্তু বাংলার নবযুগের কথায় তাঁহার জীবন ও কর্ম্ম উপেক্ষা করা সম্ভব নহে; করিলে এই যুগের একটা প্রধান অধ্যায় অপূর্ণ থাকিয়া যায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে নবগোপাল মিত্র কলিকাতা সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ও ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল। কলিকাতা বা আদি-ব্রাহ্মসাজের সঙ্গেও তাঁহার ঘনিষ্ট যোগ ছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন মহর্ষিকে ছাড়িয়া আসিয়া নূতন ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হন, সে সময়ে মহর্ষির ও কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়া নবগোপাল মিত্র মহাশয় তাঁহার কর্ম্মের তীব্র প্রতিবাদ করেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার মানসে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মদিগের যে সাধারণ সভা আহ্বান করেন, সে সভায় নবগোপাল মিত্র মহাশয় উপস্থিত হইয়া কেশবচন্দ্রকে পদে পদে বাধা দিবার চেষ্টা করেন। এই সময়েই সর্ব্বপ্রথমে নবগোপালবাবু সেকালের শিক্ষিত সমাজের নিকটে সুপরিচিত হ'ন। ইহার দুই তিন বৎসর পরে কেশবচন্দ্রের প্ররোচনায় ভারত গভর্ণমেণ্ট যখন ব্রাহ্ম বিবাহ আইন করিতে উদ্যত হয়েন, তখনও নবগোপাল মিত্র মহাশয় কেশবচন্দ্রের প্রতিপক্ষরূপে এই আইন যাহাতে পাশ না হয় তাঁহার জন্য বিশেষ আন্দোলন করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রচলিত হিন্দু

বিবাহের পৌত্তলিক অনুষ্ঠান বর্জ্জন করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শালগ্রাম-বর্জ্জিত অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম-বিবাহ-পদ্ধতি নিজের পরিবারে প্রবর্ত্তিত করেন। এই পদ্ধতি শাস্ত্রানুমোদিত, মহর্ষি ইহাই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। শালগ্রাম হিন্দু বিবাহ অনুষ্ঠানের মুখ্য অঙ্গ নহেন। বিবাহ-কালে শালগ্রাম সাক্ষীগোপালের মতন উপস্থিত থাকেন বটে, কিন্তু পূজা অর্চ্চনা প্রাপ্ত হ'ন না। হিন্দু বিবাহের মুখ্য অঙ্গ হোম বা কুশণ্ডিকা এবং সপ্তপদীগমন। মহর্ষি তাঁহার বিবাহ-পদ্ধতিতে এই দুইটি অঙ্গকেই রক্ষা করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার ব্রাহ্ম-বিবাহ-পদ্ধতিকে তিনি সুসংস্কৃত এবং পৌত্তলিকতাবর্জ্জিত সত্য হিন্দু-বিবাহ-পদ্ধতিরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। এইরূপ বিবাহ যে সর্ব্বতোভাবেই আইন-সঙ্গত নহে, মহর্ষি একথা স্বীকার করেন নাই। এইজন্য পৌত্তলিকতাবর্জ্জিত ব্রাহ্মবিবাহকে আইন-সিদ্ধ করিবার জন্য মহর্ষি ইংরাজের দ্বারে উপস্থিত হন নাই। ইংরাজ বিদেশী রাজা। ইংরাজ রাষ্ট্রপতি হইয়াছে বটে, কিন্তু সমাজ-পতি হয় নাই; কখনও হইতেও পারিবে না। ধর্ম্ম-সাধনে ও সামাজিক জীবনে বিদেশী ইংরাজ-রাজের কোনও প্রকারের অধিকার ঘুণাক্ষরেও প্রবেশ করিতে দিলে, ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ত গিয়াছে বটেই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মজীবনের ও সামাজিক শাসনের স্বাধীনতাটুকুও লোপ পাইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইবে। এইজন্য মহর্ষি এবং কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যগণ কেশবচন্দ্রের নূতন আইনের ঘোরতর বিরোধী হইয়া উঠেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে এই বিরোধে নবগোপাল মিত্র মহাশয় একজন অগ্রণী পুরুষ ছিলেন। আর যদিও একটা বিশেষ আইন লইয়া এই বিরোধের উৎপত্তি হয়, ইহার মূলে একদিকে স্বাদেশিকতা ও অন্যদিকে স্বদেশের বৈশিষ্ট্য ও জ্ঞানগরিমার প্রতি উপেক্ষা, এই দুইটী ভাব লুকাইয়া ছিল। মহর্ষি এবং তাঁহার সঙ্গীগণ স্বাদেশিকতার

প্রেরণাতেই কেশবচন্দ্রের এই প্রয়াসের প্রতিবাদী হন। এই প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে মহর্ষির কলিকাতা-ব্রাহ্মসমাজ গভর্ণর জেনারেলের নিকটে এক আবেদন প্রেরণ করেন। এই আবেদনে তাঁহারা বলেন যে—(১) ব্রাহ্মগণ হিন্দুসমাজের বহির্ভূত নহেন; এই আইন পাশ হইলে তাঁহাদিগকে হিন্দু-সমাজ-বহির্ভূত হইতে হইবে, এবং এইরূপে বহির্ভূত হইলে তাঁহাদের অধোগতি অবশ্যম্ভাবী; (২) হিন্দুসমাজের অন্তর্গত অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদিগের বিবাহ-প্রণালী স্বতন্ত্র, অথচ তাহাদিগের জন্য রাজ-ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। এরূপস্থলে ব্রাহ্মসমাজ পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া যে প্রণালী নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বিধিসিদ্ধ করিবার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন কি? (৩) নূতন ব্যবস্থাতে ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম না থাকাতে উহা ব্রাহ্মগণের হৃদয়ব্যথা উৎপাদন করিয়াছে। এই আবেদনে আরও অনেক কথা ছিল। কিন্তু উপরিউক্ত তিনটী আপত্তি হইতেই মহর্ষি এবং তাঁহার অনুচরেরা যে স্বাদেশিকতার প্রেরণাতেই বিশেষভাবে কেশবচন্দ্রের এই চেষ্টার প্রতিবাদ করেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। নবগোপাল মিত্র মহাশয় সেকালের এই স্বাদেশিকতার একজন প্রধান পুরোহিত ছিলেন। আর এই জন্যই তিনি কেশবচন্দ্রের সঙ্গে এই বিরোধে প্রবৃত্ত হ'ন।

(২)

আজিকালি আমরা স্বাদেশিকতা বলিতে কেবল হিন্দুয়ানী বুঝি না। কিন্তু চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এদেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এভাবটা ফুটিয়া উঠে নাই। সেকালে এই ভারতবর্ষটা কেবল হিন্দুরই দেশ, মুসলমান খৃষ্টিয়ান প্রভৃতির এদেশের উপরে কোনও বিশেষ দাওয়াদাবী আছে, ইহা শিক্ষিত-সমাজের মনে উদয় হয় নাই।

ইংরাজ যেমন পরদেশী, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এদেশের নব্যশিক্ষিত লোকেরা এদেশের মুসলমান এবং খৃষ্টিয়ানকেও সেইরূপ পরদেশী বলিয়া মনে করিতেন। সেকালের বাংলা সাহিত্য ইহার বিশেষ প্রমাণ। সে কথা ভগবদ্‌কৃপায় সময় ও শক্তি পাইলে ক্রমে খুলিয়া বলিব। আর এই সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতার প্রেরণাতেই স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক বক্তৃতা লিপিবদ্ধ হয়। সেই সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতার প্রেরণাতেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং তাহারই জন্য কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম বিবাহ-বিধির প্রতিবাদ করেন। আর সেই স্বাদেশিকতার আদর্শের প্রেরণাতেই নবগোপাল মিত্র মহাশয় হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। এই নামের দ্বারাই তাঁহার স্বাদেশিকতার আদর্শের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

সে সময়ে অন্য আদর্শের অনুসরণ একরূপ অসম্ভব ছিল বলিলেও হয়। ইংরাজেরা এদেশে যে নূতন শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন, তাহারই ফলে আমরা বহু শতাব্দীর ঘোর নিদ্রার অবসানে আধুনিক চিন্তা ও কর্ম্ম জগতে জাগিয়া উঠিয়াছি। ইংরাজী শিক্ষার শত প্রকারের ত্রুটী ও অপূর্ণতা সত্বেও এ কথাটা স্বীকার করিতেই হইবে। আর হিন্দুরাই সর্ব্বপ্রথমে এই নূতন শিক্ষালাভের জন্য অগ্রসর হয়েন। মুসলমানেরা বহুদিন পর্য্যন্ত এই নূতন শিক্ষা গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের লুপ্ত গৌরবের ও হৃত তক্তখানির স্মৃতি বুকে ধরিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত নিজেদের আত্ম-মর্য্যাদার অনুশীলন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা প্রথম হইতে ভারতের এই নব-জাগরণের মাঝখানে আসিয়া পড়িতে পারেন নাই; শিক্ষিত হিন্দুদিগের সঙ্গেও সাধারণ স্বদেশাভিমানের ভূমিতে আসিয়া মিলিত হন নাই। এই সকল কারণে আমাদের প্রথম যুগের স্বাদেশিকতা

যে হিন্দুত্বের অভিমানকেই আশ্রয় করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। এই জন্যই আধুনিক বাংলার প্রথম স্বাদেশিক প্রতিষ্ঠান জাতীয় মহামেলা নামে অভিহিত না হইয়া হিন্দু মেলা নামে অভিহিত হয়।

(যেমন নামে সেইরূপ ভাবে ও কাজেও ইহা হিন্দু মেলাই হইয়াছিল। ইহার অনুষ্ঠাতৃগণ সকলেই হিন্দু ছিলেন। এই মেলাতে যে সকল বক্তৃতাদি প্রদত্ত হয়, তাহা সকলই হিন্দু ভাবের দ্বারা প্রণোদিত ও হিন্দুর গুণ-গরিমায় পরিপুষ্ট ছিল।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুপ্রসিদ্ধ ভারত-গাথা—

জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়—

নবগোপাল বাবুর প্রথম হিন্দু মেলার জন্য রচিত হয় এবং মেলার উদ্বোধনের দিনে গীত হইয়াছিল। স্বর্গীয় মনোমোহন বসু মহাশয়ের—

দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ,
অনশনে তনু ক্ষীণ।
তাঁতি, কর্ম্মকার করে হাহাকার,
সূতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী অস্ত্র শস্ত্র বিকায় নাকো আর,
হায়রে দেশের কি দুর্দ্দিন!
ছুঁচ সূতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে
দিয়াশলাই কাটি তাও আসে পোতে
খেতে শুতে যেতে প্রদীপটী জ্বালিতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।

আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ
ধরবে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ
বাকল-টেনা ডোর-কোপীন।

সত্যেন্দ্রবাবুর "গাও ভারতের জয়" এবং ৺মনোমোহন বসুর "দিনের দিন সবে দীন" এই দুইটি সঙ্গীতের মধ্যেই নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত হিন্দু মেলার অন্তরঙ্গ ভাবের ও আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়।

জ্যোতিবাবু ভারতে প্রাচীন শৌর্য্য বীর্য্যের স্মৃতি জাগাইয়া স্বদেশবাসীদিগকে এই নবযুগের নূতন শৌর্য্য বীর্য্য সাধনায় প্রবৃত্ত করেন। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই সাধনার একটা নূতন পাঠশালা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। এই সময়ে স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বাংলার ছোট লাট ছিলেন। তাঁহার শাসন কালেই আমাদের স্কুল-কলেজে ব্যায়ামচর্চ্চা প্রবর্ত্তিত হয়। ইংরাজী রকমের ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইত, এবং বড় বড় স্কুলে এক একজন জিমন্যাষ্টিক মাষ্টারও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা প্যারেলাল বার (parallel bar), হরাইজণ্টাল বার (horizontal bar), ট্রেপিজ প্রভৃতি বিলাতী ব্যায়ামের উপকরণ লইয়া বাঙ্গালী বালক ও যুবকদিগকে ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন। নবগোপালবাবু একটি ব্যায়াম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে শঙ্কর ঘোষের লেনের মোড়ে নবগোপাল বাবুর পৈতৃক ভদ্রাসন ছিল। ইহারই অব্যবহিত পূর্ব্বদিকে শঙ্কর ঘোষের লেনের ভিতরে ১নং বাড়ীতে নবগোপালবাবুর এই "আখড়া" ছিল। এই আখড়াতে বিলাতী ব্যায়ামের সকল সরঞ্জামই ছিল, কিন্তু নবগোপাল বাবু কেবল বিলাতী ব্যায়াম শিখাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। আখড়ার বিশিষ্ট ছাত্রদিগকে লাঠি

খেলা, তরোয়াল-খেলা, গুলেল-খেলা এবং বন্দুক-ছোঁড়া পর্য্যন্ত শেখান হইত। নবগোপালবাবু ঘোরতর ব্রিটিশ-বিদ্বেষী ছিলেন, এবং কি উপায়ে ভারতবর্ষ অনতিবিলম্বে ব্রিটিশের শৃঙ্খল-মুক্ত হয়, অহর্নিশ তাহারই ধ্যান করিতেন। ভারতবর্ষ বাহুবলে ইংরাজের নিকট হটিয়া গিয়াছে, তাঁহার এই ধারণা ছিল। সুতরাং ইংরাজ তাড়াইতে হইলে এই বাহুবলেরই ভজনা করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার স্বাদেশিকতার মূলমন্ত্র ছিল। কিন্তু অন্নবল ব্যতিরেকে বাহুবল লাভ সম্ভব নহে। আবার ইংরাজ আপনার ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার করিয়া ভারতবর্ষকে নিরন্ন ও বিবস্ত্র করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং ইংরাজের কবল হইতে স্বদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে উদ্ধার করিতে না পারিলে দেশের লোকে পেট ভরিয়া খাইতে পারিবে না, অন্নবস্ত্রের অভাবে অনশনে ও রোগে শীর্ণ এবং নিদারুণ চিন্তাজ্বরে জীর্ণ হইয়া রহিবে। স্বজাতির বাহুবলের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে নিজেদের আয়ত্তে আনিতে হইবে! স্বদেশের বিপণি হইতে বিদেশের পণ্যকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইবে। দেশের কৃষি ও শিল্পের চরম উন্নতি সাধন করিতে হইবে। এই সকলই—ব্যায়াম-চর্চা, অস্ত্রশস্ত্র-ব্যবহারশিক্ষা, স্বদেশের পণ্যজাতের পুনরুদ্ধার—নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের স্বদেশ-পূজার মুখ্য উপকরণ হইয়াছিল। এই সকল ভাব ও আদর্শ প্রচারের জন্যই তিনি হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা করেন।

(৩)

হিন্দু মেলাতে স্বদেশী পণ্য প্রদর্শিত হইত। ব্যায়ামাদির পরীক্ষা হইত, এবং স্বাদেশিকতা উদ্বুদ্ধ করিবার উপযোগী সঙ্গীত ও বক্তৃতাদি হইত; পণ্য ও ব্যায়াম প্রদর্শকদিগকে প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত করা হইত এবং যথাযোগ্য মূল্যবান পুরস্কারও দেওয়া হইত। বৎসরে

একবার করিয়া মেলা বসিত। কিন্তু বৎসর ধরিয়া নবগোপালবাবু এবং তাঁহার সহকর্মীরা ইহার আয়োজন করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। শঙ্কর ঘোষের লেনের আখড়ায় ব্যায়াম-চর্চা হইত। তখনও অস্ত্র-আইন লিপিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং বন্দুক-ছোঁড়া বা তরোয়াল-খেলা অভ্যাস করা কঠিন ছিল না। ধাপার মাঠে যাইয়া হিন্দু মেলার বিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তারা পাখী শিকারের ভান করিয়া বন্দুক-ছোঁড়া অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতেন। এই হিন্দু মেলাতেই প্রথম নূতন রকমের তাঁত প্রদর্শিত হইয়াছিল এরূপ মনে পড়ে। ত্রিপুরা জেলার সরাইল পরগণার অন্তর্গত কালীকচ্ছের খ্যাতনামা ডাঃ মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় তখন কলিকাতায় ছিলেন। মেডিক্যাল কলেজ ছাড়িয়া —অথবা কলেজ হইতে বিতাড়িত হইয়া—মহেন্দ্রবাবু তখন পটুয়াটুলি লেনে থাকিয়া একটা নূতন কলের তাঁত উদ্ভাবন করিবার চেষ্টায় ছিলেন। একটা তাঁত তিনি প্রস্তুত পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। আমার মনে পড়ে যেন মহেন্দ্র বাবুর এই নূতন তাঁত হিন্দু মেলাতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। সঠিক কহিতে পারি না; কিন্তু এরূপ শুনিয়াছি যে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় এই তাঁতে তৈয়ারী গামছা মাথায় বাঁধিয়া হিন্দু মেলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন—লোকে বলে নাচিয়াছিলেন। তাহা অসম্ভব নহে; কারণ তখন নবগোপাল বাবু ও তাঁহার সঙ্গীরা নূতন স্বদেশীভাবে একেবারে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহেন্দ্র বাবুর মুখে শুনিয়াছি যে এই সময়েই জ্যোতি বাবুরা নন্দী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া রবিবারে রবিবারে ধাপার মাঠে 'শিকার' করিতে যাইতেন।

(৪)

কয়বার এই মেলাটা বসিয়াছিল, ঠিক মনে নাই। শেষবারের মেলাতে একটা জাঁকালো রকমের মারামারি হয়। তার পর হইতেই

হিন্দু-মেলা বন্ধ হইয়া যায়। এই মেলাতে আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম। টালায় রাজা বদনচাঁদের বাগানে এই মেলা বসে। আমি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন দ্বিতীয়বার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ৺আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের সহযোগে কলিকাতার ছাত্রমহলে একটা নূতন স্বদেশ-প্রেমের বন্যা আনিয়াছিলেন। সে কথা সবিস্তারে আর একদিন কহিব। আমরা কেবল সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনিয়াই ক্ষান্ত রহি নাই। স্বদেশের উদ্ধারের জন্য যৌবন-সুলভ উৎসাহ ও কল্পনার প্রেরণায় যথাসম্ভব আয়োজন এবং উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম। এই ভাবের প্রেরণাতেই নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের "আখড়া"য় যাইয়া ভর্ত্তি হই। এই সূত্রেই সেবারকার হিন্দু মেলাতেও আগ্রহসহকারে যোগদান করি। মনে পড়ে যেন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই মেলায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু এবারে বোধ হয় তিনি কোনও বক্তৃতা করেন নাই। কে কি বিষয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সে সকল কথা কিছুই মনে নাই। মনে আছে কেবল মারামারির কথা। আর একরূপ আমা হইতেই এই মারামারি হয় বলিয়া তাহার ইতিহাসটা আমার জীবনের স্মৃতির সঙ্গে গাঁথা রহিয়াছে। দ্বিপ্রহরের পরে ব্যায়াম-প্রদর্শনের আয়োজন হয়। বাগানটা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল বাঙ্গালীরাই যে মেলা দেখিতে গিয়াছিলেন, তাহা নহে; দু'দশজন ইংরাজ দর্শকও উপস্থিত ছিলেন। ইংরাজ দর্শকদিগের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের কেমিষ্ট্রীর অধ্যাপক পেড্‌লার সাহেব এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব-সচিব স্যার জন ষ্ট্রাচি, এই দুই জনের নাম মনে আছে। বক্তৃতাদি ঘরের ভিতরে হইয়াছিল। বাহিরের ময়দানে ব্যায়াম-প্রদর্শনের আয়োজন হয়। আমি একখানা চৌকি লইয়া ব্যায়াম দেখিবার জন্য

বাহিরে যাইয়া এক যায়গায় বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে একজন হ্যাটকোটধারী পুরুষ একটি মেমকে সঙ্গে লইয়া আমার পিছনে দাঁড়াইলেন। ইঁহারা ইংরাজ কি ইউরেষিয়ান ছিলেন, ঠিক বলিতে পারি না। পুরুষটি অতি রূঢ়ভাবে আমাকে চেয়ারটি ছাড়িয়া দিতে হুকুম করিলেন। আমি সে কথায় কর্ণপাত করিলাম না, যেমন বসিয়াছিলাম তেমনই বসিয়া রহিলাম। তখন সাহেবটি আমাকে চৌকি হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে চাহিলেন। আমি তখন উঠিয়া চৌকিখানার সামনের পা দু'খানি শক্ত করিয়া ধরিলাম ও নীরবে চেয়ারখানিকে তাঁহার হাতছাড়া করিবার জন্য শরীরের সকল বল প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। আমরা দু'জনে চেয়ার লইয়া টানাটানি করিতেছি দেখিয়া দু'একটি বাঙ্গালী যুবক আমার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইঁহাদের একজন সাহেবের হাতে প্রবল মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। সাহেব তখন চেয়ারখানি ছাড়িয়া দিয়া ছেলেদের সঙ্গে ঘুষাঘুষি আরম্ভ করিলেন। আমি তখন চেয়ারখানি লইয়া জনতার বাহিরে আসিয়া একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াইলাম। তখন সাহেব-বাঙ্গালীতে পুরাদস্তুর মারামারি সুরু হইয়াছে। তারপর পুলিশ আসিয়া হাজির হইল। লাইন্যাম নামে একজন ইংরাজ চিৎপুর অঞ্চলের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি মেলাতে উপস্থিতও ছিলেন। মারামারি আরম্ভ হইলে সেখানে ছুটিয়া যান। ইহাতে কিছু আসিয়া যাইত না। কিন্তু তিনি সেখানে যাইয়াই সাহেবদের পক্ষ অবলম্বন করেন; এবং শুনিয়াছি যথাসাধ্য বাঙ্গালীদিগকে মারিয়া তাড়াইবার চেষ্টা করেন। বাঙ্গালীরা তখন লাইন্যাম সাহেবকেও শিক্ষা দিতে অগ্রসর হয়। সে সময়ে কলিকাতার বাঙ্গালী পড়ুয়ার দলে একজন অসাধারণ শক্তিশালী পালোয়ান ছিলেন। তাঁহার হাতে লাইন্যাম নিরতিশয় লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হন; শুনিয়াছি তিনি লাইন্যামের

দুটা হাতে ধরিয়া কাঠুরিয়ারা যেমন করাত দিয়া কাঠ চিরে, সেইরূপ ভাবে একটা আমগাছে ঘষিয়াছিলেন। সামান্য মারামারির জন্য যতটা না হউক, স্থানীয় পুলিস সাহেবের এই লাঞ্ছনার দরুণই পুলিসের হল্লা হয়। হনুমান সিংএর দল খালি গায়ে মালকোচা মারিয়া, কোমরে চাপরাশ বাঁধিয়া বাগানে যাইয়া উপস্থিত হন। শত্রুপক্ষের এই নূতন শক্তি সংগ্রহ দেখিয়া বাঙ্গালী যোদ্ধবর্গ একটা ইটের ঢিবির উপর যাইয়া দাঁড়াইলেন, এবং সেই ইট ছুড়িয়া পুলিসের দলকে আটকাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাগানের ফটকের কাছে কোনও ইট পাট্‌কেল ছিল না। ফটকের সামনেই পুকুর। পুকুরের ওপারে বাঙ্গালী যোদ্ধাদিগের ব্যূহ। পুলিসেরা বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ ধরিয়া লড়াইটা চলিল। শুনিয়াছি সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত নাকি ইহা চলিয়াছিল। শুনিয়াছি বলিতেছি এইজন্য যে আমি এই যুদ্ধের প্রথমেই পুলিসের হাতে বন্দী হই। আমা হইতেই মারামারির সূত্রপাত; মারামারির মূল কারণ চেয়ারখানি আমি হল্লার বাহিরে আসিয়াও প্রাণ দিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। এমন সময় দেখিলাম যে একজন পুলিসের জমাদার ও দুইজন কনষ্টেবল একটী যুবকের পিছনে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে মাটিতে পাড়িয়া বেদম মুষ্ট্যাঘাত করিতেছে। আমার মনে হইল যে ঐ যুবকটী আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস। আমি অমনি সেই চেয়ার লইয়া যাইয়া সেই জমাদার ও কনষ্টেবলদের আক্রমণ করিলাম। তাহারা তখন সেই যুবকটিকে ছাড়িয়া দিয়া আমাকে ধরিল; আর অমনি আরও পাঁচ ছয়জন পুলিস আসিয়া আমাকে ঘেরাও করিল। যে যুবকটিকে পুলিস মারিতেছে দেখিয়া আমি তাহার সাহায্যার্থ ছুটিয়া গিয়াছিলাম, পরে দেখিলাম সে সুন্দরীমোহন নহে। সুন্দরীমোহন তখন অন্যত্র মারামারির বাহিরেই দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু আমাকে পুলিস

ঘেরাও করিয়া মারিতেছে দেখিয়া তিনি ছুটিয়া আসিয়া নিজের শরীর দিয়া আমার শরীরকে রক্ষা করিতে গেলেন। তখন পুলিস তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করিল। এইরূপে আমরা দু'জনে সকলের আগে বন্দী হই। আমাদের দু'জনকে যখন পুলিস থানায় লইয়া যায়, তখনও দলে দলে হনুমান সিংএর দল বদনচাঁদের বাগানের দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল। তাহার পরেই লড়াইটা ভাল করিয়া জমাট বাধে। কাজেই সকল ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখি নাই। লাইন্যামের লাঞ্ছনাও দেখি নাই; বাঙ্গালী যুবকদিগের রণনীতিও দেখি নাই। কি করিয়া যে তাহারা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অব্যর্থ সন্ধান ইট ছুঁড়িয়া পুলিসের কটককে ফটকের মুখে আটকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহাও দেখি নাই। এ সকল পরে শুনিয়াছি।

এই মারামারির সংস্রবে সুন্দরীমোহন এবং আমি ছাড়া আরও দুইজন গ্রেপ্তার হন। তাঁহাদের একজন নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের কুটুম্ব; তাঁহার জামাতার সহোদর। ইনি হাওড়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষক বা জিমন্যাষ্টিক মাষ্টার ছিলেন। শিয়ালদহ পুলিশ আদালতে আমাদের বিচার হয়। শোভাবাজারের রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তখন শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। নবগোপাল বাবুর কুটুম্বের পঞ্চাশ টাকা ও আমার কুড়ি টাকা জরিমানা হয়। সুবিচার হইয়াছিল কিনা সে কথা তুলিতে চাহিনা।

(৫)

নবগোপাল বাবুর একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক কাগজ ছিল; নাম—National Paper (ন্যাসনাল পেপার)। কাগজখানির ইংরাজী প্রায় আগাগোড়াই ভুল থাকিত। ইহাও তাঁহার স্বাদেশিকতার একটা লক্ষণ ছিল। বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য তাঁহার বিন্দুমাত্র

অনুরাগ ছিল না। এই স্বাদেশিকতাই নবগোপাল মিত্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। আর সে যুগের বাঙ্গালীদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে হাতে কলমে এই স্বাদেশিকতার আদর্শটাকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। এইজন্য বাংলার নবযুগের ইতিহাসে নবগোপাল মিত্র মহাশয় এবং তাঁহার হিন্দু মেলাকে কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না।

দশম কথা

সাহিত্যে নবযুগ—বঙ্গদর্শন ও বঙ্কিমচন্দ্র

কোনও সমাজে নূতন চিন্তা ও ভাবের প্রেরণায় যখন একটা নূতন জীবনের সাড়া পড়ে, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম, দর্শন, ইতিহাস, সঙ্গীত, কবিতা, নাট্যকলা প্রভৃতি সাহিত্যের সকল বিভাগেই এই নূতন জীবন আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতে আরম্ভ করে। এ সকলের দ্বারাই সেই সমাজের নবচেতনা ও নূতন প্রাণতার প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। ব্যাপক অর্থে সাহিত্য বলিতে ধর্ম্মতত্ত্ব, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং আলোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাম্য-গাথা পর্য্যন্ত জাতির ভাব ও চিন্তা যে দিকেই নিজেকে ভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, তার সাকুল্যটা বুঝায়। বাংলার নবযুগের সাহিত্য বলিতে এইরূপ সাকুল্যটাই বুঝি। অক্ষয়কুমার দত্তের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, দ্বিজেন্দ্রনাথের তত্ত্ববিদ্যা, কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতুম পেঁচার নক্সা," প্যারীচাঁদের "আলালের ঘরের দুলাল," ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা, মাইকেলের মহাকাব্য ও গীতিকাব্য, এসকলের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের মাঝিদিগের আধুনিক গান পর্য্যন্ত সকলেই বাংলার নবযুগের নূতন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে এ সকল নূতন সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে এই নবযুগের প্রাণ-বস্তুর নিগূঢ় সাড়া থাকিলেও, ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য সৃষ্টিতে এই প্রাণ-বস্তুর প্রকাশের তারতম্য আছে। কোনও সাহিত্য সৃষ্টিতে এই প্রাণবস্তু বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে; কোথাও বা আত্মপ্রকাশের অবসর পায় নাই। আর এই তারতম্য আছে বলিয়াই যে সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে এই প্রাণবস্তু বিশেষভাবে ফুটিয়াছে, তাহাকে বিশিষ্ট অর্থে বাংলার নবযুগের সাহিত্য কহিতে পারা যায়। এই অর্থেই

বাংলার নবযুগের সাহিত্যে বঙ্গদর্শন ও বঙ্কিমচন্দ্র একটা বিশেষ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। এই কারণেই বাংলার বর্ত্তমান নবযুগের সাহিত্যের কথা কহিতে যাইয়া বিশেষভাবে প্রথমে বঙ্গদর্শনের কথাই কহিতে হয়।

(২)

কিন্তু বঙ্গদর্শন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে। সাহিত্য মাত্রেই চিন্তা ও ভাবের বাহন। বাংলার বর্ত্তমান নবযুগের ইতিহাসে প্রথমে যুগপ্রবর্ত্তকরূপে রাজা রামমোহনকে দেখিয়াছি। সুতরাং রাজা রামমোহনই বাংলার নবযুগের সাহিত্যেরও প্রথম প্রবর্ত্তক, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। রাজা রামমোহন যে চিন্তা ও সাধনার ধারা প্রবর্ত্তিত করেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দেশ, কাল এবং পাত্রের উপযোগী করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে সেই ধারাকেই স্বল্পবিস্তর রক্ষা করেন; এবং কোনও কোনও দিকে তাহাকে নূতন খাতে চালাইয়া গভীর এবং প্রশস্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। বাংলার নবযুগের সাহিত্যের ইতিহাসে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজেরও একটা বিশিষ্ট স্থান এবং মর্য্যাদা আছে। সে কালের সাহিত্যিকদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই তাঁহার ব্রাহ্মসমাজ কিম্বা তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে স্বল্পবিস্তর ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অক্ষয়কুমারের ত কথাই নাই, তাঁহারই হাতে তত্ত্ব-বোধিনীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গেও একসময় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ও তত্ত্ববোধিনী সভার নিকট সম্বন্ধ ছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং প্যারীচাঁদ মিত্র, ইঁহাদেরও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান এবং তত্ত্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাদি দ্বারা বাংলার নবযুগের সাহিত্যে যে

অসাধারণ শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন, লোকে একথা এখন মনে না করিলেও ইতিহাস একথা কখনই ভুলিতে পারিবে না। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় একদিকে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন, অন্যদিকে সাহিত্যেও বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমসময়ে বাংলার নবযুগের সাহিত্যকে ব্রাহ্মসমাজের চিন্তা এবং আদর্শ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। তার পর কেশবচন্দ্রও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার অলোক-সামান্য বাগ্মিতাপ্রভাবে অসাধারণ শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন। এইরূপে রাজা রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গ বাংলার নবযুগের সাহিত্যে একটা উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। যে স্বাধীনতা ও মানবতা এই যুগের মূল সূত্র হইয়া আছে, সেই স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শ প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্যের ভিতর দিয়াই বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহা সমগ্র জাতির চিন্তা ও ভাবকে ভাল করিয়া অধিকার করিতে পারিতেছিল না। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এই আদর্শ অনেকটা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ভিতরে বাঁধা পড়িয়াছিল। যাঁহাদের অন্তরে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল, তাঁহারাই কেবল এই আদর্শের প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। যাঁহাদের অন্তরে এই ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হয় নাই, তাঁহারা ইহার সাড়া পাইলেও ভাল করিয়া এই আদর্শটাকে ধরিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীনতার আদর্শ দেশের সাধারণ লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস এবং সামাজিক রীতিনীতির সংস্কার সাধনেই বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যাঁহারা এই ধর্ম্ম বা সমাজ সংস্কারের আন্দোলনে যোগ দিলেন না বা দিতে পারিলেন না, তাঁহারা বাংলার নবযুগের নূতন সাধনা হইতে স্বল্পবিস্তর বঞ্চিত রহিয়া গেলেন। নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহাদের সংখ্যা

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। আর এই সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকটে 'বঙ্গদর্শন'ই সর্ব্বপ্রথমে বাংলার নবযুগের নবীন সাধনার পুরোহিতরূপে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়।

(৩)

'বঙ্গদর্শন' ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে এক যুগান্তর প্রবর্ত্তিত করে। 'বঙ্গদর্শন' প্রচারের পূর্ব্বে নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী বাংলা বই পড়িতেন না বলিলেও চলে। অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থাবলী স্কুলে পড়া হইত। রঙ্গলালের কবিতাও স্কুলপাঠ্য কবিতাবলীতে কিছু কিছু সংগৃহীত হইয়াছিল। এ সকল স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ ব্যতীত শিক্ষিত বাঙ্গালীর বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ কোনও পরিচয় ছিল না। বালকেরা স্কুল বুক সোসাইটীর প্রচারিত "চীনদেশীয় রাজকন্যার কথা" প্রভৃতি "গার্হস্থ্য গ্রন্থাবলী"র দু'পাঁচখানা কখনও কখনও পড়িত। যারা গল্প পড়িতে ভালবাসিত তাহারা "গুলে বকওয়ালী", "কামিনীকুমার" প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জাতীয় উপন্যাস আগ্রহ সহকারে গিলিত। আরব্য উপন্যাসের বাংলা অনুবাদও তখন হইয়াছে। অনেকে এখানিও আদর করিয়া পড়িতেন। মাইকেলের কবিপ্রতিভা তখন বাংলা সাহিত্যের মধ্যাহ্নগগনে যাইয়া উঠিয়াছে। "মেঘনাদ বধ" এবং "ব্রজাঙ্গনা" গ্রন্থখানিই সেকালের বাংলা সাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রত্নরূপে শিক্ষিত সমাজের অতিশয় আদরের বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। তবে সকলে মেঘনাদবধের গুণকীর্ত্তন করিলেও ততটা পঠনপাঠন করিতেন না। সেকালের সাধারণ ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর পড়া সোজা ছিল না, বুঝা কঠিনই ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও মাইকেলের প্রভাব শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজকে অত্যন্ত অভিভূত করিয়াছিল।

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই 'হুতুমপেঁচা' ও 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়। এবং এ দু'খানাও শিক্ষিত সমাজের আদরের বস্তু হইয়া উঠে। এছাড়া দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ", "নবীন তপস্বিনী", "জামাই বারিক" এবং "সধবার একাদশী"ও প্রকাশিত হইয়াছিল। দীনবন্ধুর নাটকে সেকালের সমাজ-চিত্র বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষিত সমাজের উপরে তখনকার ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব কতটা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলীতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'বঙ্গদর্শনের' পূর্ব্বকার আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে মোটের উপরে ব্রাহ্মযুগের সাহিত্য বলিতে পারা যায়। ব্যক্তিগত চরিত্রে শুদ্ধতা সাধন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রেরণায় সমাজ-সংস্কার, ইহাই আধুনিক বাংলার ব্রাহ্মযুগের প্রধান লক্ষণ ছিল। এই দুইটী লক্ষণই এই যুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মোটামুটী দুইভাগে বিভক্ত। এক ব্রাহ্ম-যুগ, আর এক বঙ্কিম-যুগ। 'বঙ্গদর্শন' এই বঙ্কিম-যুগের সূচনা করে।

রাজা রামমোহনের পরে ব্রাহ্মসমাজ য়ুরোপীয় চিন্তার প্রভাবে অনেকটা বদলাইয়া যায়। সুতরাং রাজার পরবর্ত্তী ব্রাহ্মসাহিত্যও য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভাবেই বিশেষভাবে গড়িয়া উঠে। অক্ষয়-কুমারের ত কথাই নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যেও বিদেশের প্রভাব অন্তঃসলিলের মত প্রবাহিত। ব্রাহ্মযুগের বাংলা সাহিত্যে কাজেই তেমন একটা মৌলিকতা ফুটিয়া উঠে নাই। বর্ত্তমান নবযুগের বাংলা সাহিত্যে এই মৌলিকতাটা প্রথম ফুটিতে আরম্ভ করে 'বঙ্গদর্শনে'। এই জন্যই 'বঙ্গদর্শন' আধুনিক বাংলার চিন্তায় এবং ভাবে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইলে সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী আগ্রহসহকারে বাংলা সাহিত্য পড়িতে আরম্ভ

করেন। 'বঙ্গদর্শন' বাংলা সাহিত্যে একটা নূতন ও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলরূপে উদিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সূর্য্যস্বরূপ; আর তাঁহাকে ঘিরিয়া অক্ষয়চন্দ্র, তারাপ্রসাদ, হেমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, রাজকৃষ্ণ প্রভৃতি নবীন সাহিত্যরথী সকল 'বঙ্গদর্শনকে' আশ্রয় করিয়া বাংলার বর্ত্তমান নবযুগের সাহিত্যে এক নূতন অভিব্যক্তিধারার সূচনা করেন।

(৪)

অষ্টাদশ খৃষ্ট শতাব্দীর ফরাসীস্ চিন্তার এবং সাধনার ইতিহাসে Encyclopædistsদের যে স্থান, আধুনিক বাংলার সাধনা এবং চিন্তার ইতিহাসে 'বঙ্গদর্শন' কতকটা সেই স্থান অধিকার করিয়াছিল। আজি কালি বাংলার ইতিহাসের চর্চ্চা অনেকেই করিতেছেন। অনেক চিন্তাশীল পণ্ডিত বাংলার বৈশিষ্ট্যের খোঁজ আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও অনেক সন্ধান হইতেছে। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজেরা বাংলার এবং ভারতবর্ষের যে কল্পিত ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, আমরা তাহাকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া-ছিলাম; এবং সেই ইতিহাসের আলো লইয়াই নিজেদের জাতীয় জীবনের ও জাতীয় চরিত্রের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের চেষ্টা করিতে-ছিলাম। 'বঙ্গদর্শন'ই সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজ বাংলার যে ইতিহাস গড়িয়া-ছেন, তাহা ছাড়া বাঙ্গালীর একটা সত্য ইতিহাস আছে, এবং সেই ইতিহাসে বাংলার চরিত্র ও সাধনার যে ছবি ফুটিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর গৌরবের ও শ্লাঘার বিষয় বিস্তর আছে, একথাটা প্রচার করে। এইরূপে বাংলার আধুনিক স্বাদেশিকতাকে 'বঙ্গদর্শন'ই সর্ব্ব-প্রথমে ঐতিহাসিক সত্যের উপরে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে। এই কাজটা আরম্ভ করেন, স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহশয়। তাঁহার

অকাল-মৃত্যুতে 'বঙ্গদর্শনের' একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ নষ্ট হয়; এবং তিনি যে গবেষণার সূচনা করিয়াছিলেন, তাহাও নিজের সিদ্ধিপথে যথাসম্ভব অগ্রসর হইতে পারে নাই। তবে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যথাসাধ্য একরূপ জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই কাজটা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধে ইহার কতকটা প্রমাণ পরিচয় পাওয়া যায়।

(৫)

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গোটা ভারতবর্ষই অত্যন্ত নির্জীব অবস্থায় পড়িয়াছিল। জনসাধারণে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে একটা স্বাদেশিক শক্তির সামান্য সাড়া পাইয়া, সেই গোলমালের নিঃশেষ হইলে পরদেশী প্রভুশক্তির অদ্ভুত প্রতাপে একান্তভাবে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরাজের দুর্দ্ধর্ষ শক্তির ভয়ে দেশটা একেবারে জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল। বাংলা দেশে সিপাহী বিদ্রোহের প্রকোপ বেশী দেখা যায় নাই। সুতরাং এই বিপ্লবের অবসানে ইংরাজ যে নৃশংস মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, বাংলার লোকে তাহা দেখে নাই। বিহার, প্রয়াগ, অযোধ্যা অঞ্চলেই এই মূর্ত্তিটা বিকট ভাবে প্রকট হইয়াছিল। একটু শক্তিশালী লোক দেখিলেই, এরূপ শুনা যায়, ইংরাজ তাহাকে পলাতক বিদ্রোহী বলিয়া গুলি করিয়া মারিয়াছে, পথের লোক ধরিয়া গাছের ডালে ফাঁসী দিয়াছে, এবং এইরূপে তাহার লোক-সংহারের অপরিসীম ক্ষমতা জাহির করিয়া, দেশের লোককে একেবারে দমাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বেও বিহার, কাশী, প্রয়াগ এবং অযোধ্যা অঞ্চলে ইংরাজী শিক্ষিত লোকেরা পর্য্যন্ত এ সকল কাহিনী স্মরণ করিয়া একেবারে কাঁপিয়া উঠিতেন। বিগত স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে আমরা যখন এই দেশব্যাপী জুজুর

ভয়টা নষ্ট করিয়া দিবার জন্য ইংরাজের পণ্য এবং ইংরাজের স্কুল কলেজ, আইন-আদালত এবং ব্যবস্থাপক সভাদি বয়কট করিবার প্রস্তাব করি, তখন কংগ্রেসের বিহার ও অযোধ্যার প্রতিনিধিরা বারম্বার একথা কহিয়াছিলেন যে ইংরাজ কি বস্তু বাঙ্গালী তাহা জানে না। ইংরাজের ভীষণ মূর্ত্তি ও ক্রূর প্রকৃতির যে পরিচয় সিপাহী বিদ্রোহের পরে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা পাইয়াছিল, তাহা চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর কালের মধ্যেও তাহারা ভুলিয়া উঠিতে পারে নাই। সেই স্মৃতি যাহাদের অন্তরে এখনও জাগিয়া আছে, তাহারা কিছুতেই ইংরাজকে আর ঘাটাইতে রাজী হইবে না। সুতরাং বাংলার স্বদেশী ও বয়কটের কথা সে সকল অঞ্চলে চালান অসম্ভব। বিশ বৎসর পূর্ব্বেও যখন দেশের লোকের মনোগতি এরূপ ছিল, তখন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের অবস্থা কি ছিল, ইহা অনুমান করা কঠিন নহে।

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে জনসাধারণে যেরূপ ইংরাজের ভয়ে অভিভূত হইয়াছিল, বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় সেইরূপ ইংরাজ-ভক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী ইংরাজকে তেমন ভয় করিত না, কিন্তু সত্যই ইংরাজকে ভালবাসিত এবং ভক্তি করিত। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে পল্লীবাসী নিরক্ষর বাঙ্গালীরা প্রবলের দ্বারা প্রপীড়িত হইলে ‘কোম্পানী বাহাদুরের’ দোহাই দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিত। ইংরাজ দেশে শান্তি আনিয়াছে। চোর ডাকাতের ভয় নষ্ট করিয়াছে, ধর্ম্মাধিকরণের সমক্ষে ধনী ও নির্ধন, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, প্রবল ও দুর্ব্বল—সকলকে এক করিয়াছে। এই সকল দেখিয়া বাঙ্গালী ইংরাজকে ভালবাসিতে ও ভক্তি করিতে শিখিয়াছিল। দেবতার প্রতি ভক্তির সঙ্গে যতটুকু ভয় মিশিয়া থাকে, বাঙ্গালীও ইংরাজকে ততটুকু ভয় করিত বটে, কিন্তু দেবতার ভয় ভক্তকে পঙ্গু করে না। ইংরাজ-

রাজের ভয়েও বাঙ্গালী জড়সড় হইয়া যায় নাই। এ গেল জনসাধারণের কথা।

দেশের নূতন ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরাজের ভাবের ভাবুক হইয়া, ইংরাজের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাবশতঃ তাহার নিকট স্বল্পবিস্তর আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ইংরাজ সত্যকাম ও সত্যবাক, এ ধারণাটা তাহাদের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। ইংরাজ যে মিছাকথা কহিতে পারে, পঞ্চাশ ষাঠ বৎসর পূর্ব্বেকার শিক্ষিত বাঙ্গালী ইহা কল্পনাও করিতে পারিতেন না। এইজন্য ইংরাজ এদেশের সম্বন্ধে যখন যাহা কহিত, তাহাকেই তাহারা বেদবাক্যরূপে মানিয়া লইতেন। সম্মোহন শক্তি (hypnotism) দ্বারা অবিভূত হইয়া, সম্মোহন-কর্ত্তার আদেশে মূঢ় মানুষ যেমন মুখে নুন লইয়া কহে চিনি খাইতেছি, সেইরূপ নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীও তাহার সম্বন্ধে ইংরাজ যাহা কহিত তাহাই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেন। ইংরাজ কহিল, ভারতবর্ষটা একটা মহাপ্রদেশ মাত্র, কখনও ভারতবর্ষে একটা জাতি বা নেশন গড়িয়া উঠে নাই। ভারতবর্ষে কখনও জাতীয় একতা বা ন্যাসান্যাল ইউনিটি (national unity) ছিল না, এখনও নাই। ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহাই মানিয়া লইলেন। জাতি বা নেশন গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া ভারতবর্ষীয়েরা কখনও কোন প্রকারের স্বাধীন রাষ্ট্র-শক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। ভারতবাসীর দেশ আছে কিন্তু রাষ্ট্র নাই, সমাজ ছিল কিন্তু কখনও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। যে সকল গুণে য়ুরোপের শক্তিশালী জাতিসকল গড়িয়া উঠিয়াছে, ভারতবর্ষে কদাপি সে সকল গুণের অনুশীলন হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয়েরা কখনও য়ুরোপের সমকক্ষ ছিল না, এখনও নাই, কোন দিনই হইতে পারিবে কিনা কে জানে?

এইরূপে ইংরাজ পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগকে অদ্ভুত সম্মোহন মন্ত্রের দ্বারা মূঢ় করিয়া রাখিয়াছিল।

(৬)

এই সাংখাতিক মোহটা প্রথমে ভাঙ্গাইতে আরম্ভ করে, 'বঙ্গদর্শন'। বঙ্কিমচন্দ্রই বর্ত্তমান যুগের ইংরাজী-নবীশদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে 'বঙ্গদর্শনের' সাহায্যে বাঙ্গালীর অন্তরে একটা স্বাজাত্যাভিমান জাগাইবার চেষ্টা করেন। আর বঙ্কিমচন্দ্রের চেষ্টার বিশেষত্ব এই যে বঙ্কিমচন্দ্র মিথ্যা কল্পনার উপরে নহে, কিন্তু সত্যের উপরে স্বজাতির এই আত্ম-শ্লাঘাকে তিনি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এ সকল বিষয়ের আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বদাই যুক্তি ও বিজ্ঞানের হাত ধরিয়া চলিতেন। অযৌক্তিক বা আধুনিক বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্তের বিরোধী কোনও হেতু বা মতবাদ অবলম্বন করিয়া নিজের ঈপ্সিত মতের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে এখানে তাঁহার "বিবিধ প্রবন্ধের" "বাঙ্গালীর বাহুবল" শীর্ষক প্রস্তাবের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র গোড়াতেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন—বাঙ্গালীর কোনও উন্নতির ভরসা আছে কিনা? অনেকে এবিষয়ে সন্দিহান। কেন না বাঙ্গালীর বাহুবল নাই। বাহুবল ভিন্ন উন্নতি নাই, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস। বঙ্কিমচন্দ্র গোড়াতেই মানিয়া লইয়াছেন, যে বাঙ্গালীর বাহুবল নাই, ইহা সত্য কথা। বাঙ্গালীর বাহুবল কখনও ছিল না। তদানীন্তন কালের ইতিহাসের যতটা খোঁজ পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা বাঙ্গালীরা বহুকাল হইতেই যে খর্ব্বাকৃত ও দুর্ব্বল-গঠন ছিল, ইহা প্রমাণিত হয়। বাংলার জলবায়ু প্রভৃতিই বাঙ্গালীর এই দুর্ব্বলতার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। বাঙ্গালীর আহার-বিহারের ব্যবস্থা এবং

বাল্য-বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক রীতি এই দুর্ব্বলতাকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। এ সকল আলোচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কহিতেছেন যে "বাঙ্গালীর শারীরিক বল চিরকাল এইরূপ থাকিবে, ইহা একরূপ সিদ্ধ। কেন না, দুর্ব্বলতার নিবার্য্য কারণ কিছু দেখা যায় না।" তবে কি বাঙ্গালীর ভরসা নাই? এই প্রশ্নের উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র যাহা কহিয়াছেন তাহা আজিকালকার শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষেও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রশ্নের দুই উত্তর দিয়াছেন। প্রথম উত্তর ঃ—

"শারীরিক বলই অদ্যাপি পৃথিবী শাসন করিতেছে বটে; কিন্তু শারীরিক বল পশুর গুণ; মনুষ্য অদ্যাপি অনেক অংশে পশু-প্রকৃতি সম্পন্ন; এজন্য শারীরিক বলের আজিও এতটা প্রাদুর্ভাব। শারীরিক বল উন্নতি নহে......."

কিন্তু তাই বলিয়া শারীরিক বলকে উপেক্ষা করিলেও চলিবেনা। কারণ শারীরিক বল মানুষের উন্নতির মূল না হইলেও যে সকল কারণে উন্নতির হানি হয়, সে সকল উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য শারীরিক বলের প্রয়োজন। যেখানে সে প্রয়োজন নাই, সেখানে অনন্যসাধারণ শারীরিক বল ব্যতীত উন্নতি ঘটে।

তারপর বঙ্কিমচন্দ্র যাহা কহিতেছেন তাহার সাকুল্যটাই এখানে তুলিয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"দ্বিতীয় উত্তরে, আমরা যাহা বলিতেছি, বাংলার সর্ব্বত্র, সর্ব্বনগরে, সর্ব্বগ্রামে, সকল বাঙ্গালীর হৃদয়ে তাহা লিখিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালী শারীরিক বলে দুর্ব্বল—তাহাদের বাহুবল হইবার সম্ভাবনা নাই, তবে কি বাঙ্গালীর ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদের উত্তর এই যে, শারীরিক বল বাহুবল নহে। মনুষ্যের শারীরিক বল অতি তুচ্ছ, তথাপি হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি মনুষ্যের বাহুবলে শাসিত হইতেছে। মনুষ্যে

মনুষ্যে তুলনা করিয়া দেখ। যে সকল পার্ব্বত্য বন্য-জাতি হিমালয়ের পশ্চিমভাগে বাস করে, পৃথিবীতে তাহাদের ন্যায় শারীরিক বলে বলবান কে? এক একজন মেওয়াওয়ালার চপেটাঘাতে অনেক সেলর-গোরাকে ঘূর্ণমান হইয়া আঙ্গুর পেস্তার আশা পরিত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছে। তবে গোরা সমুদ্রপার হইয়া আসিয়া ভারত অধিকার করিল,—কাবুলীর সঙ্গে ভারতের কেবল ফল-বিক্রয়ের সম্বন্ধ রহিল কেন? অনেক ভারতীয় জাতি হইতে ইংরাজেরা শারীরিক বলে লঘু। শারীরিক বলে শিখেরা ইংরাজ অপেক্ষা বলিষ্ঠ। তথাপি শিখ ইংরাজের পদানত। শারীরিক বল বাহুবল নহে।"

তারপর বঙ্কিমচন্দ্র কহিতেছেন যে বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক অপ্রতিষ্ঠার মূল কারণ বাঙ্গালীর উদ্যম নাই, ঐক্য নাই, সাহস নাই এবং অধ্যবসায় নাই। বাঙ্গালী যদি এই সাধন-চতুষ্টয় অবলম্বন করিতে পারে তাহা হইলে বাঙ্গালী জগতের ইতিহাসে অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে। এই সাধনার ভিত্তি উন্নতির অভিলাষ।

"বেগবৎ অভিলাষ হৃদয়মধ্যে থাকিলে উদ্যম জন্মে। অভিলাষ মাত্রেই কখন উদ্যম জন্মে না। যখন অভিলাষ এরূপ বেগ লাভ করে যে, তাহার অপূর্ণাবস্থা বিশেষ ক্লেশকর হয়, তখন অভিলষিতের প্রাপ্তির জন্য উদ্যম জন্মে। অভিলাষের অপূর্ত্তি জন্য যে ক্লেশ, তাহার এমন প্রবলতা চাই যে, নিশ্চেষ্টতা এবং আলস্যের যে সুখ, তাহা তদভাবে সুখ বলিয়া বোধ হয় না। এরূপ বেগযুক্ত কোন অভিলাষ বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্থান পাইলে উদ্যম জন্মিবে। ঐতিহাসিক কালমধ্যে এরূপ কোন বেগযুক্ত অভিলাষ বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্থান পায় নাই।"

"যখন বাঙ্গালীর হৃদয়ে সেই এক অভিলাষ জাগরিত হইতে থাকিবে, যখন বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষের বেগ এরূপ

গুরুতর হইবে যে, সকল বাঙ্গালীই তজ্জন্য আলস্য সুখ তুচ্ছ বোধ করিবে, তখন উদ্যমের সঙ্গে ঐক্য মিলিত হইবে।"

"সাহসের জন্য আর একটু চাই। চাই যে, সেই জাতীয় সুখের অভিলাষ আরও প্রবলতর হইবে। এত প্রবল হইবে যে, তজ্জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনও শ্রেয়ঃ বোধ হইবে। তখন সাহস হইবে।"

"যদি এই বেগবৎ অভিলাষ কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্যবসায়

"অতএব যদি কখনও (১) বাঙ্গালীর কোনও জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয়, (২) যদি বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে, তদর্থে লোক প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি এই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালীর অবশ্য বাহুবল হইবে।"

"বাঙ্গালীর এইরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, একথা বলিতে পারা যায় না। যে কোন সময় ঘটিতে পারে।"

সতের বৎসর পূর্বে* বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথাগুলি সফল হইয়াছিল। সকল বাঙ্গালীর অন্তরে না হউক, কতকগুলি বাঙ্গালীর প্রাণে স্বাধীনতা সুখের অভিলাষ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আর এই অভিলাষ এত প্রবল হইয়াছিল যে ইহার জন্য কতকগুলি বাঙ্গালী প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। তখন বাঙালীর সাহস এবং বাহুবলেরও কতকটা পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। আধুনিক বাংলার ইতিহাসের এই অধ্যবসায়ের দোষ-গুণের কথা আর যাহাই বলা হউক না কেন, ইহা দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের পূর্বকার সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণরূপেই সপ্রমাণ হইয়াছিল, একথা অস্বীকার করা অসম্ভব। আর যে স্বাধীনতা সুখের অভিলাষের প্রেরণায় বাংলার

* এই প্রবন্ধ বাংলা ১৩২৯, ইং ১৯২২ সালে লিখিত।

আধুনিক ইতিহাসের এ অধ্যায়টি রচিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বাঙ্গালীর অন্তরে নানাদিক দিয়া সেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে জাগাইয়াছিলেন।

(৭)

প্রথমতঃ বঙ্কিমচন্দ্রই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথমে এদেশের লোকের মনে ইংরাজের প্রভুত্ব, প্রতাপ ও জ্ঞান-গৌরব যে একটা গভীর হীনতা বোধ জন্মাইয়াছিল, তাহা দূর করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই চেষ্টা করিতে যাইয়া তিনি কখনও মিথ্যা বা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোন প্রকারের শূন্যগর্ভ আত্মাভিমান বা স্বাজাত্যাভিমান জাগাইতে চেষ্টা করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারের একটা অপূর্ব্ব ভঙ্গী এই ছিল যে তিনি বিপক্ষের কথার মধ্যে যেটুকু অতি অপ্রীতিকর সত্য থাকিত, তাহা অম্লান বদনে মানিয়া লইতেন। বাঙ্গালী শারীরিক বল সম্বন্ধে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা হীন, বাঙ্গালীর বাহুবলের বিচার করিতে যাইয়া একথাটা অস্বীকার করেন নাই। এই সত্য কথাটা মানিয়া লইয়া তিনি কহিলেন—

শারীরিক বল বাহুবল নহে।

"ভারত কলঙ্ক" শীর্ষক প্রবন্ধে, ভারতবর্ষ পরাধীন কেন, এই প্রশ্নের আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি সত্য যুক্তির ধারাল অস্ত্রে প্রথমে এই সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত করিলেন যে, ভারতবর্ষীয়েরা বহুকাল পরাধীন হইয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের শক্তি ও শৌর্য্যের অভাব বা হীনতা এই পরাধীনতার কারণ নহে। হিন্দুরা কাপুরুষ, য়ুরোপীয়দিগের মুখাগ্রে সর্ব্বদাই একথাটা আছে। ইহাই ভারতের কলঙ্ক। কিন্তু আবার য়ুরোপীয়দিগের মুখেই ভারতবর্ষীয় সিপাহীদিগের বল ও সাহসের প্রশংসা শুনা যায়। সেই স্ত্রী-স্বভাব হিন্দুদিগের বাহুবলেই কাবুল

জিত হইল। বলিতে গেলে সেই স্ত্রী-স্বভাব হিন্দুদিগের সাহায্যেই তাঁহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন। তাঁহারা স্বীকার করুন আর নাই করুন, সেই স্ত্রী-স্বভাব হিন্দুদিগের কাছে, মহারাষ্ট্র এবং শিখের কাছে, অনেক রণক্ষেত্রে তাঁহারা পরাজিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের হিন্দুরা চিরকাল রণে অপারগ, বিদেশীয়দিগের মুখে যে সভ্যজগতে এই কলঙ্কের কাহিনী প্রচারিত হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র ইহার তিনটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম, হিন্দুদিগের ইতিবৃত্ত নাই। "আপনার গুণগান আপনি না গাহিলে কে গায়........রোমদিগের রণ-পাণ্ডিত্যের প্রমাণ রোমক-লিখিত ইতিহাস। গ্রীকদিগের যোদ্ধৃ-গুণের পরিচয় গ্রীক-লিখিত গ্রন্থ। মুসলমানেরা যে মহারণ-কুশল, ইহাও কেবল মুসলমানের কথাতে বিশ্বাস করিয়া জানিতে পারিয়াছি। কেবল সে গুণে হিন্দুদিগের গৌরব নাই। কেন না সে কথার হিন্দু সাক্ষী নাই।" হিন্দুদিগের এই কলঙ্কের দ্বিতীয় কারণ, হিন্দুরা মোটের উপর পররাজ্যাপহারী ছিল না। "যে সকল জাতি পররাজ্যা-পহারী, প্রায় তাহারাই রণপণ্ডিত বলিয়া অপর জাতির নিকট পরিচিত হইয়াছে। যাহারা কেবল আত্মরক্ষামাত্রে সন্তুষ্ট হইয়া, পররাজ্য লাভে কখনই ইচ্ছা করে নাই, তাহারা কখনই বীর গৌরব লাভ করে নাই।" আর এই কলঙ্কের তৃতীয় কারণ, হিন্দুরা বহুদিন হইতে পরাধীন। পরাধীন কেন? এই জিজ্ঞাসার মীমাংসা করিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রথম, ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতঃই প্রাচীন কাল হইতে স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষা রহিত ছিল। স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা হিন্দুজাতির চির স্বভাব।

"সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে কোথাও এমন কিছু পাওয়া যায় নাই যে, তাহা হইতে পূর্ব্বতন হিন্দুগণকে স্বাধীনতা-প্রয়াসী বলিয়া সিদ্ধ করা যাইতে পারে। পুরাণোপপুরাণ, কাব্য, নাটকাদিতে কোথাও স্বাধীনতার

গুণগান নাই। মীবার ভিন্ন কোথাও দেখা যায় না যে, কোন হিন্দুসমাজ স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাজার রাজ্য-সম্পত্তি রক্ষায় যত্ন, বীরের বীরদর্প, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধপ্রয়াস, এ সকলের ভূরিভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য লাভাকাঙ্খা সে সকলের মধ্যগত নহে। স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা এ সকল নূতন কথা।”

“কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে স্বজাতি-প্রতিষ্ঠার ভাব, ভালই হউক বা মন্দই হউক, কোনও দিন প্রবল হইয়া উঠে নাই। ইহাই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার মূল কারণ। কিন্তু ভগবানের বিধানে ইংরাজ আমাদিগের এই উপকার করিতেছে যে, যাহা আমরা কখনও জানিতাম না তাহা জানাইতেছে ; যাহা কখনও দেখি নাই, শুনি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শোনাইতেছে, বুঝাইতেছে। যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরাজের চিত্ত-ভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটি আমার এই প্রবন্ধে (“ভারত কলঙ্ক”) উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা এবং জাতি-প্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না। এই প্রবন্ধে জাতি শব্দে nationality বা nation বুঝিতে হইবে।”

বাংলার নবযুগের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রই এই জাতি-প্রতিষ্ঠা ব্রতের একরূপ প্রথম ও প্রধান পুরোহিত। ব্রাহ্ম-সমাজ প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শকে গড়িয়া তোলেন। বঙ্কিমচন্দ্র জাতি-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শের দিকে বাঙ্গালীর চিত্তকে বিশেষ ভাবে প্রেরিত করেন। তাঁহার অপূর্ব্ব সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে এই কথাটাই সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই বঙ্কিম-যুগের বাংলা সাহিত্যের মূল কথা।

একাদশ কথা

বঙ্কিম-সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী এখনও বাংলার শিক্ষিত লোকেরা পাঠ করিয়া থাকেন। রসসৃষ্টির হিসাবে তাঁহার উপন্যাসগুলির আদর ও অলোচনা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থও সাহিত্যের হিসাবেই আজিকালকার লোকে পড়িয়া থাকেন। কিন্তু এসকল গ্রন্থের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ কোন্ দিকে কতটা পরিমাণে যে বাংলার বর্ত্তমান যুগকে ফুটাইয়া ও গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, একথাটা সকলে জানেন না; অতি অল্পলোকে ইহার অনুধাবন করিয়া থাকেন।

পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আজিকালকার শিক্ষিত বাঙ্গালী তাঁহাদের অব্যবহিত পুরোবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষদিগের মতন ইংরাজী সাহিত্যের চর্চ্চা করেন বলিয়া মনে হয় না। স্কুল-কলেজে যতটুকু ইংরাজী পড়া হয়, অনেকে ইংরাজী সাহিত্যের ততটুকু পরিচয়ই পাইয়া থাকেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়া অতি অল্প লোকেই এখন ইংরাজী সাহিত্যের সবিশেষ চর্চ্চা করিয়া থাকেন। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। সেকালে আমাদের ইংরাজী-নবীশেরা ইংরাজী সাহিত্যে একেবারে মজিয়া থাকিতেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা তখনও তেমন হয় নাই। দেশের জন-সাধারণের মধ্যে যাঁহারা লিখিতে পড়িতে জানিতেন, তাঁহারা সকলেই অবসরকালে কাশীরামের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন। ইতিহাস এবং মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া তখনও এসকল পুরাতন পুঁথির বিচার-আলোচনা আরম্ভ হয় নাই। কথা ও কাহিনীরূপেই লোকে

কাশীরামের ও কৃত্তিবাসের গ্রন্থ পাঠ করিতেন। আজিকাল আমরা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন ও চরিত্রের ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাসে কাশী-রাম ও কৃত্তিবাসকে যে গৌরবের আসন দিতে আরম্ভ করিয়াছি, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের সে মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সেক্সপিয়র বা মিল্টনের কথাই নাই, চসার প্রভৃতি প্রাচীন ইংরাজী কবির সঙ্গে এক আসনে বসিতে পারেন, এমন কোনও বাঙ্গালী কবি আছেন, সেকালে আমরা ইহা কল্পনাই করিতে পারিতাম না। বঙ্কিম-যুগের পূর্ব্বে নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীরা সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চাতেও প্রবৃত্ত হন নাই। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, ভট্টিকাব্য, কাদম্বরী, শকুন্তলা এবং উত্তররাম-চরিত পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল বটে। কিন্তু কেবল পরীক্ষা পাশ দিবার জন্যই অধিকাংশ লোকে এগুলি পড়িতেন। রসস্বষ্টির দিক দিয়া আমাদিগের মধ্যে তখনও সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্ব-প্রথমে "বঙ্গদর্শনে" সেক্সপিয়র এবং কালিদাসের তুলনায় সমালোচনা করেন, এবং উত্তররাম-চরিতের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ করিয়া রসস্বষ্টির দিক দিয়া ভবভূতির একটা অতি উচ্চ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পূর্ব্বে ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরাজী সাহিত্যেই ডাউডেন প্রভৃতি সমালোচকদিগের গ্রন্থে এরূপ উচ্চাঙ্গের সমালোচনা পাঠ করিতেন। সেই কষ্টিপাথরে সংস্কৃত বা বাংলা সাহিত্যকে কষিয়া বিশ্ব-সাহিত্যে তার স্থান ও মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে কেহ চেষ্টা করেন নাই। বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে প্রাচীন ভারতবর্ষ যে উচ্চ আসন পাইবার অধিকারী, ইহা তখনকার শিক্ষিত বাঙ্গালীর কল্পনাতেও আসে নাই। বঙ্কিম-চন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে ভারতের সাহিত্যকে আধুনিক বিশ্ব-সাহিত্যের পরিষদে লইয়া যান। আর তখন হইতেই বাঙ্গালী স্বদেশের সাহিত্যের আদর করিতে আরম্ভ করেন।

সেকালে আমাদের ইংরাজী-নবীশেরা ইংরাজী সাহিত্যতেই মসগুল হইয়া ছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যের কষ্টিপাথরে কষিয়াই তাঁহারা যাবতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেন। সেক্সপিয়র এবং মিল্‌টন তাঁহাদের চক্ষে জগতের শ্রেষ্ঠতম কবি ছিলেন। ইঁহাদের পদপ্রান্তে বসিতে পারেন, বাংলা দেশে কোনও কবি তাঁহারা খুঁজিয়া পান নাই। বৈষ্ণব কবিগণ তখনও বটতলায় আত্মগোপন করিয়া বাস করিতেছিলেন। বৈষ্ণব কীর্ত্তনীয়ারা স্বল্পবিস্তর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিতেন বটে, কিন্তু ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী তখনও য়ুরোপের আমদানী খৃষ্টীয়ান ethics'এর বা ধর্ম্মনীতির আওতায় পড়িয়া ছিলেন। মহাজন-পদাবলীর অলোচনায় তাঁহাদের অধিকার জন্মে নাই। ইন্দ্রিয়-বিকারের ভাষায় বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ সাত্ত্বিক বিকারের যে অপূর্ব্ব ছবি তাঁহাদের পদাবলীতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহার খোঁজ এখনই বা ক'জনে রাখেন? তখন আমাদের ইংরাজী-নবীশ ethics-বাদীরা তাহার যে কোন সন্ধানই পান নাই, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত এককালে মহাজন-পদাবলীর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সাধারণ ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী এসকল অপূর্ব্ব রসসৃষ্টির কোনও খোঁজই তখনও পান নাই। বাংলা ভাষাতে যে বয়স্ক ও সুবিজ্ঞ সুধীজনের পাঠোপ-যোগী কোনও পুস্তক আছে, একথা অনেকের ধারণাতেই আসে নাই।

এইরূপ অবস্থায় প্রথম যখন মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ-বধ' প্রকাশিত হইল, তখন ইংরাজী-নবীশ বাঙ্গালী একটা নূতন গৌরবে ভরিয়া উঠিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবি-প্রতিভা কম ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং একথা স্বীকার এবং প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালী গুপ্ত-কবিকে কোনও শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবির

সঙ্গে তুলনা করিতে পারিতেন না বলিয়া তাঁহার যথাযোগ্য সম্মান করিতে পারেন নাই। 'মেঘনাদ-বধ' প্রকাশ হইবা মাত্র শিক্ষিত বাঙ্গালী মাইকেলকে মিল্‌টনের সঙ্গে তুলনা করিতে লাগিলেন, এবং বাঙ্গালী কবি মধুসূদনের কবি-প্রতিভাকে মিল্‌টনের কবি-প্রতিভার এক পঙ্‌ক্তিতে বসাইয়া একটি অভিনব স্বাজাত্যাভিমানে ফাঁপিয়া উঠিলেন। এতদিনে ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী একখানি পাঠোপযোগী শ্রেষ্ঠ বাংলা কাব্য পাওয়া গেল বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু মেঘনাদ-বধের গৌরব যত লোকে করিতে লাগিলেন, তত লোকে তাহা পড়িতে পারিলেন না। বাংলার অমিত্রাক্ষর ছন্দ পড়া সহজ ছিল না। ইহা ছাড়া মেঘনাদ-বধের অলোকসামান্য শব্দ-সম্পদের উপরেও তখন পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর অধিকার জন্মে নাই। অভিধান না খুলিয়া অনেক স্থলে মেঘনাদ-বধের অর্থগ্রহণ অসাধ্য ছিল। সখের পড়াশুনা করিতে যাইয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অভিধান খুলিয়া দেখাও সম্ভব ছিল না। এই সকল কারণে মাইকেলের কবি-যশ যতটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ততটা পরিমাণে তাঁহার কাব্যের পঠন-পাঠন শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজে পরিব্যাপ্ত হয় নাই। মেঘনাদ-বধে বাঙ্গালী এইমাত্র বুঝিল যে বাংলা ভাষার এবং বাঙ্গালী মনীষার বিশ্ব-সাহিত্যে যাইয়া বসিবার শক্তি আছে। বঙ্কিমচন্দ্র কেবল এই সত্যটাকেই প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহা নহে ; কিন্তু আপনার অপূর্ব্ব সাহিত্য-সৃষ্টি দ্বারা শিক্ষিত বাঙ্গালীর অনুভবেতে এই কথাটা উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন।

(২)

বোধ হয় 'মেঘনাদ-বধ' প্রকাশিত হইবার অল্পদিন পরেই বঙ্কিম-চন্দ্রের 'দুর্গেশ-নন্দিনী' প্রকাশিত হয়। 'দুর্গেশ-নন্দিনী' পড়িয়া ইংরাজী-নবীশ বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলার স্যার ওয়াল্টার স্কট বলিয়া

সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। কাব্যে যেমন সেক্সপিয়র এবং মিল্‌টন ইংরাজী-নবীশ বাঙ্গালীর অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, উপন্যাসে ওয়াল্টার স্কট তাঁহাদের চিত্তকে সেইরূপ অধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং দুর্গেশ-নন্দিনীর সঙ্গে স্কটের উপন্যাসের সমালোচনা করিয়া বাঙ্গালী একটা অভিনব আত্মাভিমান বা স্বাজাত্যাভিমান অনুভব করিতে লাগিল। মেঘনাদ-বধ সংস্কৃত কোষের সাহায্য ব্যতিরেকে বোঝা অসাধ্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যদিও তখনও পর্য্যন্ত শব্দাড়ম্বর প্রকাশের লোভ একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তথাপি মোটের উপরে তিনি যে নূতন বাংলা এবারতের সৃষ্টি করিলেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইত। সুতরাং শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়িতে লাগিলেন। এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্র পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের চিত্তকে বিদেশীয় সাহিত্যের ও বিজাতীয় ভাবের মোহ হইতে অল্পে অল্পে মুক্ত করিয়া আধুনিক বাংলার সাহিত্যের এবং স্বাদেশিকতার গোড়া পত্তন করিয়াছিলেন।

(৩)

মোটামুটি বঙ্কিম-সাহিত্য তিন ভাগে বিভক্ত—(১) উপন্যাস, (২) ধর্ম্মতত্ত্ব, (৩) রাষ্ট্রনীতি; আর এই তিন বিভাগেই বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগের মধ্যে নূতন স্বাধীনতা এবং মানবতার প্রেরণা জাগাইতে চেষ্টা করেন। কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশ-নন্দিনী এবং মৃণালিনী এক শ্রেণীর; বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর এবং কৃষ্ণকান্তের উইল আর এক শ্রেণীর; এবং আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী এবং সীতারাম অপর শ্রেণীভুক্ত। প্রথম তিনখানিকে রোমান্স্ (romance) বলা যায়। সকল দেশেই নরনারীর চিত্তে কতকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই সার্ব্বজনীন মানুষী প্রবৃত্তির খেলার উপরেই রোমান্স্ গড়িয়া উঠে। এই প্রবৃত্তির

খেলাতে মূলতঃ স্বদেশী-বিদেশী, প্রাচ্য-প্রতীচ্য প্রভৃতি দেশগত বা জাতিগত কোনও প্রকারের প্রখর প্রভেদ থাকে না। তিলোত্তমা, আয়েষা, বিমলা, জগৎসিংহ, ওস্‌মান্ ইঁহারা এদেশের পোষাক পরিয়া এদেশের ভাষায় দেশী রকমে ও দেশী ঢংএ নিজেদের চরিত্রকে পাঠকের সমক্ষে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু অন্য পোষাকে, অন্য ভাষায় ও অন্য ঢংএও ইঁহারা যে ভাবের খেলা খেলিয়াছেন, তাহা এমনি সুন্দররূপে ফুটতে পারিত। কপালকুণ্ডলা এবং মৃণালিনী সম্বন্ধেও একথা খাটে। এই তিনখানি উপন্যাস সার্ব্বজনীন মানুষী প্রবৃত্তির সাধারণ ভূমির উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে। এগুলিতে বাংলার বা ভারতের বৈশিষ্ট্যের তেমন প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই না। কিন্তু এই তিনখানি উপন্যাসের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সাধারণ মানবতার প্রবল প্রেরণা অনুভব করিয়া থাকি। এখানে বাঙ্গালী মেয়ে সামাজিক অবরোধের ভিতরেও কতটা পরিমাণে যে স্বাধীনতা ভোগ করে, এবং নিজের প্রকৃতির বা বিশুদ্ধ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের জন্য কতটা আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়, ইহা দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হই।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম অভ্যুদয়কালে শিক্ষিত বাঙ্গালী নিজের জাতকে বড় হীন বলিয়া মনে করিতেন। য়ুরোপীয়দের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করিয়া সর্ব্বদাই মাথা হেঁট করিয়া থাকিতেন। তখনও সাক্ষাৎভাবে তাঁহারা য়ুরোপের কোনও জ্ঞানলাভ করেন নাই। ইংরাজী ও য়ুরোপীয় সাহিত্য-সৃষ্টির সাহায্যেই সেকালে তাঁহাদের য়ুরোপের মনুষ্যত্বের এবং য়ুরোপীয় সমাজের যা-কিছু জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। য়ুরোপের এই ছবির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালী অন্তরে অন্তরে আত্মগ্লানি অনুভব করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রথম তিন খানি উপন্যাসে এদেশের চিত্রপটেও যে য়ুরোপের সাহিত্য-সৃষ্টির

মতন উৎকৃষ্ট রসমূর্ত্তি গড়িয়া তোলা সম্ভব, ইহা দেখাইয়া বাঙ্গালীর অন্তরের এই আত্মগ্লানিটা নষ্ট করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্গেশ-নন্দিনী, কপালকুণ্ডলা এবং মৃণালিনী সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই একটা অতি বড় কাজ করিয়াছিলেন। আর কোনও কিছু না করিলেও এই তিনখানি উপন্যাসের দ্বারা তিনি বাংলার নবযুগের ইতিহাসে একটা স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া থাকিতেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ,—সকলেরই যে যথাযোগ্য পথে আত্ম-চরিতার্থতা সাধনের অধিকার আছে, এই তিনখানি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী সমাজে এই সত্যটা পরোক্ষভাবে প্রচার করেন। ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মের নামে প্রকাশ্যভাবে যে স্বাধীনতার সংগ্রাম ঘোষণা করেন, বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ মানব-প্রকৃতির নামে পরোক্ষভাবে সেই সংগ্রামেই অসাধারণ শক্তি আধান করিয়াছিলেন।

(৪)

বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রসসৃষ্টিকে কেবল আরও উন্নত এবং পরিস্ফুট করিয়া তোলেন তাহা নহে, কিন্তু সার্ব্বজনীন মানবতার ভূমি হইতে এগুলিকে পৃথক করিয়া বাঙ্গালী চরিত্রের এবং বাঙ্গালী সমাজের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সাজাইয়া তোলেন। সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীতে, সুন্দরী এবং শৈবলিনীতে, ভ্রমর এবং রোহিনীতে আমরা কেবল সাধারণ নারীত্বের সার্ব্বজনীন মূর্ত্তিই দেখি না, কিন্তু সার্ব্বজনীন নারীত্ব কোন্ আকারে কিরূপে বাংলার মাটি, বাংলার জলবায়ু, বাংলার ঘাট মাঠ, বাংলার নৈসর্গিক প্রকৃতি এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া কোন কোন মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠে, ইহাও প্রত্যক্ষ করি। প্রতিদিন যে পথে-ঘাটে বেড়াই, যে নদী-তরঙ্গ এবং সাঁঝের আকাশ

দেখি, তাহাই যখন আলোক-ছবিতে কিম্বা সুনিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় ফুটিয়া উঠে, তখন তাহার মধ্যে যে রূপ দেখিতে পাই, পূর্ব্বে তাহা দেখি নাই। আর দেখি নাই এইজন্য যে, সেদিকে কোনদিন লক্ষ্য করি নাই। এত সৌন্দর্য্যের ভিতরে যে প্রাতঃসন্ধ্যায় ঘুরিয়া বেড়াই, ছবি দেখিবার পূর্ব্বে ইহা বুঝি নাই। বুঝি নাই বলিয়া তাহার মর্য্যাদা করি নাই। কিন্তু যেদিন ইহার ছবি দেখিলাম, সেদিন হইতে এই চিরপরিচিত পথ-ঘাটের দাম যেন বাড়িয়া গেল। ঠিক এইরূপে বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর এবং কৃষ্ণকান্তের উইল শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকটে তাহার সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের মূল্যটা বাড়াইয়া দিল। এতদিন বাঙ্গালী ভাবিত যে য়ুরোপীয় সমাজে এবং পাশ্চাত্য জাতীয় লোকদিগের পারিবারিক জীবনে যে রস ও আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠে, হতভাগ্য বাঙ্গালী-জীবনে তাহা সম্ভবে না। বিষবৃক্ষ প্রভৃতি উপন্যাস প্রচার করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষিত বাঙ্গালীর চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন—বিবিধ রসের উৎস ও রসমূর্ত্তির উপকরণ কেবল য়ুরোপেই যে আছে তাহা নহে, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে তাহা আছে। বাঙ্গালীর চোখ নাই বা প্রাণ নাই বলিয়া দেখিতে পায় না। বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে বাংলার সমাজ বাংলার ঘরকে আধুনিক শিক্ষিত রস-পিয়াসু বাঙ্গালীর নিকটে আদরের বস্তু করিয়া তুলিলেন। এই ভাবে এই তিনখানি উপন্যাসের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার নবযুগের নবীন সাধনাকে পরিপুষ্ট করিয়া তোলেন।

(৫)

দুর্গেশ-নন্দিনী, কপালকুণ্ডলা এবং মৃণালিনীতে সার্ব্বজনীন মানব-প্রবৃত্তির স্বাভাবিক ভোগাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে

আত্ম-চরিতার্থতার পথে বাহিরের বন্ধন-মুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। এই ভোগের পথ যে সোজা পথ নয়, বাহিরের বন্ধন ছিঁড়িলেই যে এই ভোগের পথে যাইয়া মানুষ সম্যক আত্ম-চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না, এ পথে পদে পদে কত বিঘ্ন কত বাধা, আত্ম-চরিতার্থতা লাভ করা দূরে থাক, আত্মহত্যার যে কত আশঙ্কা,—বিষবৃক্ষে, চন্দ্রশেখরে এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে তিনি ইহা বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। আধুনিক য়ুরোপীয় evolution বা অভিব্যক্তিবাদের ভাষায় দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতিকে রসরাজ্যে মানবের আত্ম-চরিতার্থতার অভিব্যক্তিধারাতে thesisএর অবস্থা বলা যায়। বিষবৃক্ষ প্রভৃতিকে এই অভিব্যক্তিধারাতে antithesisএর অবস্থা বলা যায়। দুর্গেশ-নন্দিনী প্রভৃতিতে সহজ রসবিলাসের ছবি দেখিতে পাই। এখানকার কথা সহজ ভোগ। বিষবৃক্ষে, চন্দ্রশেখরে এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে ভোগের প্রবৃত্তির সঙ্গে সংযমের ও সমাজ-শাসনের একটা প্রবল বিরোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি—এই সংগ্রামের ভিতর দিয়াই এই তিনখানি ছবি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখানে কোনও সন্ধির কথা বা সমন্বয়ের সঙ্কেত নাই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষ তিনখানি উপন্যাসে এই সন্ধি বা সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন। ইহাই আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী এবং সীতারামের বিশেষত্ব। কেবল রসমূর্ত্তির সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী বা সীতারামের রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। এই তিনখানির উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশবাসীদিগকে ভারতের উচ্চাঙ্গের কর্ম্মযোগে দীক্ষিত করা। সেকালের ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজের আত্মঘাতী ইহসর্ব্বস্বতার প্রভাব নষ্ট করিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিবার জন্যই এই কর্ম্মযোগ প্রচারের প্রয়োজন ছিল।

(৬)

ইংরাজী শিক্ষা ও য়ুরোপীয় সভ্যতা আমাদিগের অত্যন্ত ইহ-সর্ব্বস্ব এবং পরমার্থবিমুখ করিয়া তুলিয়াছিল। ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের যাঁহাদের ভিতরে স্বাভাবিকী আস্তিক্যবুদ্ধি বলবতী ছিল, তাঁহারা প্রায় সকলেই তখন ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে যাইয়া নিজেদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু ইঁহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প ছিল। দেশের অধিকাংশ ইংরাজী-নবীশেরা কোনও প্রকারের ধর্ম্মকর্ম্মের ধার ধারিতেন না। ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টীয়ান নীতিবাদ বা ethicsএর প্রভাবও ইঁহাদের উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বয়সের সকল উপন্যাসেতেই এই নীতিবাদটা বিশেষভাবে ফুটিয়াছে। এইজন্য আমাদের সেকালের ইংরাজী-নবীশেরা সাংসারিক ভোগবিলাস সাধনেই নিজেদের সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিয়াও গোবিন্দলালের মতন ভোগবিলাসকেই সর্ব্বস্ব পণ করিয়া জীবনে বরণ করিয়া লইতে পারিতেন না। সুতরাং ভোগেতে আত্মসমর্পণ করিয়া চরমে গোবিন্দ-লাল যে পথ ধরিয়া ধর্ম্ম ও ভক্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে পথে চলিবার প্রেরণাও অধিকাংশ লোকের মধ্যে আসিত না। এইরূপে শিক্ষিত সাধারণে বাহিরে কতকটা নীতির বা moralityর বন্ধন মানিয়া চলিলেও ভিতরে ভিতরে ইহসর্ব্বস্ববাদী বা secularist এবং materialist হইয়া পড়িতেছিলেন। য়ুরোপের ইহসর্ব্বস্ববাদ একটা তাজা জিনিষ। য়ুরোপীয় প্রকৃতি হইতেই তাহা আপনার শক্তিতে আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর প্রকৃতির ভিতরের প্রেরণায় যে বস্তু ফুটিয়া উঠে, তাহা আপাতঃ-দৃষ্টিতে ভালই হউক আর মন্দই হউক, তাহার মধ্যে সর্ব্বদাই একটা কল্যাণের শক্তি লুকাইয়া থাকে। আমাদের দেশের ইংরাজী-নবীশদিগের ইহসর্ব্বস্ববাদ অনেকটা ধার

করা জিনিষ ছিল। ইহাতে য়ুরোপের ইহসর্ব্বস্ববাদের প্রাণতা ছিল না; অথচ সেকালের ইংরাজী শিক্ষা ইহার দ্বারা আমাদের দেশের প্রকৃতিনিহিত আধ্যাত্মিকতাকে ঢাকিয়া ও চাপিয়া রাখিতেছিল। য়ুরোপীয়দিগের ইহসর্ব্বস্ববাদ তাহাদের স্বধর্ম্ম ছিল। আমাদের এই ধার করা ইহসর্ব্বস্ববাদকে নষ্ট করিতে না পারিলে, হিন্দুর হিন্দুত্ব, বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব, আমাদের স্বদেশের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা অসম্ভব হইবে,—এই দেখিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র সংসার এবং পরমার্থের মধ্যে, ভোগের এবং বৈরাগ্যের মধ্যে, প্রবৃত্তিধর্ম্ম এবং নিবৃত্তিধর্ম্মের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য এবং সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সমসাময়িক শিক্ষিত-সমাজের ইহসর্ব্বস্বতা নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে, কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠাকল্পে, আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী এবং সীতারাম রচনা করেন।

(৭)

ভগবদ্-গীতায় নিষ্কাম কর্ম্মযোগেতেই ভারতের সনাতন সাধনা প্রবৃত্তি বা ভোগ এবং নিবৃত্তি বা বৈরাগ্য এই দুইএর একটা অপূর্ব্ব সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এই নিষ্কাম কর্ম্মের উপরে মানুষের সহজ ভোগ-প্রবৃত্তির সঙ্গে বৈরাগ্য-ধর্ম্মের সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী এবং সীতা-রামের সৃষ্টি করেন। আর এই কাজটি করিতে যাইয়া প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাদের প্রাচীন গীতোক্ত কর্ম্মযোগ বা কর্ম্ম-সন্ন্যাসকে একটা নূতন ও উন্নততর সোপানে তুলিয়া লয়েন। প্রথমে যাগযজ্ঞাদিই কর্ম্ম ছিল। তারপরে উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন কর্ম্মযোগের নূতন অভিব্যক্তিরূপে প্রচারিত হয়। তার পর ভক্তিপথে ইষ্টদেবতার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি এবং তাঁহার লীলার অনুসরণ শ্রেষ্ঠতম কর্ম্মযোগ

বলিয়া বিহিত হয়। ভগবদ্-গীতার কর্ম্মযোগ এই ধাপ পর্য্যন্তই উঠিয়াছিল। রাজা রামমোহন ভারতের কর্ম্মযোগের অভিব্যক্তিকে আর একটা অভিনব এবং উদার সোপানে তুলিয়া দিতে চেষ্টা করেন। তিনি লোকশ্রেয়কে শ্রেষ্ঠতম কর্ম্মযোগ বলিয়া প্রচার করেন। ইহাই আধুনিক য়ুরোপের কর্ম্মযোগ। বঙ্কিমচন্দ্র এই পথেই গীতোক্ত কর্ম্মযোগকে, বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করিয়া, আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী এবং সীতারামের আশ্রয়ে আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু লোকশ্রেয় কথাটা অত্যন্ত বিস্তৃত। সাধারণ লোকের পক্ষে এই লোকশ্রেয় কেবল একটা ভাবে বা ভাবুকতাতেই পর্য্যবসিত হয়। বাস্তব জীবনে প্রতিদিনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের মধ্যে ইহা আপনাকে গড়িয়া তুলিতে পারে না। সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি বা ব্রহ্মদৃষ্টি লাভ হইলেই কেবল এই বিশ্বতোমুখী আদর্শের অনুসরণ কার্য্যতঃ সম্ভব হয়। যতক্ষণ এই বিশ্বমৈত্রী সাধন না হইয়াছে, ততক্ষণ বিশ্ব-সেবা বা বিশ্ব-মানবের কল্যাণ সাধন চেষ্টা কখনও সত্যোপেত এবং বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিতে পারে না, ভাবুকতাতেই আবদ্ধ হইয়া রহে। কোনও একটা সত্য-প্রেমের প্রেরণা জাগাইতে না পারিলে মানুষ নিষ্কাম কর্ম্মযোগের পথে পা ফেলিতে পারে না। কখনও কখনও মানুষ মানুষকে ভালবাসিয়াই নিষ্কাম প্রেমের উদ্বোধন করিতে পারে। কিন্তু এ বড় কঠিন পথ; শাণিত ক্ষুরধারের মতন সূক্ষ্ম ও দুর্গম। কিন্তু এই নিষ্কাম প্রেমের এবং নিষ্কাম কর্ম্মের একটা সুগম এবং প্রশস্ত পথ স্বদেশ-প্রীতি। স্বদেশের প্রতি মানুষের মমত্ব-বুদ্ধি জন্মিতে পারে। এই মমত্ব-বুদ্ধির প্রেরণায় মানুষ স্বদেশের সেবা করিতে যাইয়া কোনও প্রকারের নিজের সংকীর্ণ স্বার্থের অন্বেষণ না করিতেও পারে—করাটা দুষ্পরিহার্য্য বা অপরিহার্য্য নহে। ইহা দেখিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে, দেবী-

চৌধুরাণীতে এবং সীতারামে দেশমাতৃকার প্রতি নির্ম্মলা ভক্তির উপরে আধুনিক নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এই দেশ-প্রীতিই এই তিনখানি উপন্যাসের মূলসূত্র। আর এই জন্যই আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরণী এবং সীতারাম বাংলার নূতন স্বাদেশিকতার শাস্ত্র হইয়া আছে।

(৮)

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রীতির আদর্শে কোনও প্রকারের সঙ্কীর্ণতা ছিল না ; থাকিলে এই স্বদেশ-প্রাতির উপরে তিনি লোকশ্রেয়ের এবং লোকশ্রেয়ের উপরে তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধনের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন না। আনন্দমঠে তিনি দেশ-মাতৃকাকে মহাবিষ্ণুর বা নারায়ণের অঙ্কে স্থাপন করিয়া আমাদের দেশপ্রীতি ও স্বদেশ সেবা-ব্রতকে সাধারণ মানবপ্রীতি এবং বিশ্ব-মানবের সেবার সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন। মহাবিষ্ণুকে বা নারায়ণকে বা বিশ্ব-মানবকে ছাড়িয়া দেশ-মাতৃকার পূজা হয় না। এ কথাটা আনন্দমঠের একটা অতি প্রধান কথা। একদিকে আনন্দমঠ একটা অতি প্রবল স্বদেশ-প্রীতি ও স্বাজাত্যাভিমান জাগাইয়া দেয়। কিন্তু ইহারই সঙ্গে সঙ্গে আর একদিকে এই স্বদেশ-প্রীতি এবং স্বাজাত্যাভিমান বিশ্ব-প্রীতি এবং বিশ্ব-কল্যাণ কামনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যে আপনার সফলতা কিছুতেই আহরণ করিতে পারে না, আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র আশ্চর্য্য কুশলতা সহকারে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পরিণাম দেখাইয়া এই কথাটাও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই সমন্বয় এখনও দেশ ভাল করিয়া ধরিতে পারে নাই। কিন্তু যতদিন না বাঙ্গালী স্বদেশ-প্রীতির পথে আধুনিক যুগের উপযোগী নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধনের এই সঙ্কেতটি ভাল করিয়া আয়ত্ত করিবে, ততদিন সে নিজের সভ্যতা এবং সাধনার

বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া বর্ত্তমান যুগের বিশ্ব-ধর্ম্মকে আপনার সাধনা এবং সিদ্ধি দ্বারা ফুটাইয়াও তুলিতে পারিবে না। এখনও বাঙ্গালী সে শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কাজ এখনও শেষ হয় নাই। আর যতদিন তাহা শেষ না হইয়াছে ততদিন বঙ্কিমচন্দ্রের আশ্চর্য্য শক্তি বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সজীব থাকিবেই থাকিবে।

দ্বাদশ কথা

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা

কহিয়াছি যে বঙ্কিম-সাহিত্য তিন ভাগে বিভক্ত—প্রথম উপন্যাস, দ্বিতীয় ধর্ম্মব্যাখ্যা, তৃতীয় রাষ্ট্র-কথা বা politics। এই তিন বিভাগেই বঙ্কিমচন্দ্র একটা সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র ভোগ এবং ত্যাগের মধ্যে একটা সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমে শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভোগ-লিপ্সা বাড়াইয়াই দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেন। কিন্তু এই ভোগকে রস বা রোমান্সের রসায়ন দিয়া উন্নত এবং সুষ্ঠু করিয়া তুলিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও উপন্যাসেই রস-রসায়নবর্জিত ভোগের লোভনীয় ছবি প্রকট হয় নাই। যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজধর্ম্ম বিগর্হিত ভোগ-লিপ্সার ছবি আঁকিয়াছেন, সেখানেও তাহাকে অলক্ষিতে রসের ভূমিতে লইয়া গিয়াছেন। বিষবৃক্ষের রস-সৃষ্টির কুশলতার দিক দিয়া বিচার করিলে হীরার ছবি সর্ব্বাপেক্ষা ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহা বলিতেই হইবে। হীরা দাসী, অশিক্ষিতা, রুচি তার অমার্জ্জিত, ভাষা তার গ্রাম্য; কিন্তু এসকল বাহিরের আবরণ ও আবর্জ্জনার ভিতরেও হীরার মধ্যে একটা তাজা রসের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এইরূপে যে সকল চিত্র সমাজধর্ম্ম-বিগর্হিত বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকের চক্ষে ঘৃণনীয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার ভিতরেও এক একটা তাজা রসের ছবির আভাস পাওয়া যায়। এই ভোগের সঙ্গে ত্যাগের বা বৈরাগ্যের একটা সমন্বয় প্রতিষ্ঠাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর

মূল ও অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য হইয়া আছে। দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতিতে এ উদ্দেশ্যটা ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই; ফুটিয়া উঠিয়াছে—আনন্দমঠে, সীতারামে এবং দেবী-চৌধুরাণীতে।

সমন্বয় অর্থই পূর্ব্বপক্ষ প্রতিপক্ষের মধ্যে একটা রফা। উভয় পক্ষের মধ্যে দাবীদাওয়া যতক্ষণ না সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সমন্বয়ের ভূমি প্রস্তুত হয় না। ভোগের এবং ত্যাগের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, প্রথমে ভোগকে এবং ত্যাগকে উভয়কেই আপনার স্বরূপে যথাসম্ভব পূর্ণমাত্রায় ফুটাইয়া তুলিতে হয়। ভোগ যতক্ষণ না আপনার পরিতৃপ্তির জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া ও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ইপ্সিতের দিকে ছুটিয়াছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভোগের সত্য স্বরূপটা প্রকট হয় না। ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভোগ আপনার সত্য পথও খুঁজিয়া পায় না। দেবেন্দ্র দত্তের চরিত্রে ভোগ মাঝপথে মারা যায়। সুতরাং এখানে ভোগের সত্য স্বরূপ ফুটিয়া উঠে নাই। অন্য দিকে গোবিন্দলালের মধ্যে ইহা দেখিতে পাই। গোবিন্দলাল ভোগ্য বস্তুকে একান্তভাবে আত্মসাৎ করিতে যাইয়াই তাহাকে হারাইয়া ফেলেন। গোবিন্দলালের ভোগ নিরঙ্কুশ আত্মচরিতার্থতা করিতে যাইয়াই পরিণামে আত্মহত্যাই করিয়া বসে; এবং নিঃশেষ নিষ্ফলতা আহরণ করিয়া ত্যাগ ভিন্ন যে ভোগ অসম্ভব ইহা দেখিয়া ত্যাগের পথে ফিরিয়া আসে। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে ভোগ এবং ত্যাগের সংগ্রামটা পাকিয়া উঠিয়াছে মাত্র; কিন্তু রফা বা সমন্বয়ের পথ তখনও খোলে নাই। আনন্দমঠে এই সমন্বয়ের প্রথম সূচনা। তাই বলিয়া আনন্দমঠে ভোগ এবং ত্যাগের কোলাকুলিটা সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলির মতন "মুঠোম হাত ফরাক্" রহিয়া গিয়াছে। আনন্দমঠে ভোগ ত্যাগের ভিতরেই আপনাকে ফিরিয়া পায় নাই। এই জন্য জীবানন্দের

ব্রত ভঙ্গ হইল। জীবানন্দ ভোগের লোভে ত্যাগকে অবলম্বন করেন নাই। জীবানন্দের সন্ন্যাস সত্য সন্ন্যাস ছিল না। দেশসেবা-রূপ একটা অবান্তর উদ্দেশ্যের প্রেরণায় জীবানন্দ সন্ন্যাসী সাজিয়া ছিলেন। ইহার ফলে শান্তি যখন তাঁহার পিছনে পিছনে আসিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া তাঁহার ব্রতে সহধর্ম্মিনী হইবার জন্য উপস্থিত হইল, তখন তাহার রূপের আগুনে সন্ন্যাসীর খড়ের ত্যাগের ঘর নিমেষের মধ্যে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। আনন্দমঠে ত্যাগ-ধর্ম্ম ভোগের ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠে নাই বলিয়া সন্ন্যাসীর দল ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

সীতারামে ও দেবী-চৌধুরাণীতেই ভোগের ও ত্যাগের সত্য সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এখানে ভোগ আপনাকে পরিপূর্ণ মাত্রায় পাইবার জন্যই আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। যীশুখৃষ্ট কহিয়াছেন—যদি জীবন পাইতে চাও, তবে জীবন পাত কর। আমাদের প্রাচীনেরা ইহার বহুপূর্ব্বে কহিয়াছিলেন—ত্যাগেনৈকং অমৃতত্বমনাস্তুঃ। অর্থাৎ একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। ভোগের লোভ ছাড়িয়াই ভোগের পরিতৃপ্তি লাভ করিতে হয়। ভোগের অনুসরণে অতৃপ্তির জ্বালামাত্র আছে তৃপ্তির শান্তি মেলে না। ত্যাগের দ্বারাই ভোগ সত্যভাবে আপনাকে পায়। এই ত্যাগের পথ নিষ্কর্ম্মের পথ নয়, কিন্তু কর্ম্মের পথ। কর্ম-সন্ন্যাসের দ্বারাই, অর্থাৎ ভগবানে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিয়াই প্রকৃত ত্যাগের সাধন করিতে হয়। ইহাই গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম-সাধনার সঙ্কেত।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং স্মরণং ব্রজ

ইহাই গীতোক্ত কর্ম্মযোগের মূলমন্ত্র। সীতারামে ও দেবী-চৌধুরাণীতে বঙ্কিমচন্দ্র ভগবদ্গীতায় ভোগ এবং ত্যাগের মধ্যে, কর্ম্ম এবং সন্ন্যাসের মধ্যে ভগবান যে সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,

তাহাকেই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। দুর্গেশনন্দিনী হইতে আরম্ভ করিয়া দেবী-চৌধুরাণী পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর ভিতরে নিগূঢ় সূত্ররূপে এই সমন্বয় চেষ্টাটাই দেখিতে পাই।

(২)

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মব্যাখ্যাতেও এই সমন্বয়-চেষ্টাটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে ইংরাজী-নবীশ বাঙ্গালীদিগের মধ্যে নাস্তিক্যবাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ এবং ইহসর্ব্বস্ববাদ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ কিয়ৎপরিমাণে এই সকলের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ কেবল মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত রহেন নাই; ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও আদর্শ অনুযায়ী একটা নূতন ধর্ম্মসমাজ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাতেও প্রবৃত্ত হয়েন। সর্ব্বপ্রকারের ভ্রম-কুসংস্কারবর্জ্জিত ধর্ম্মাচরণ যেমন তখনকার ব্রাহ্ম-সমাজের লক্ষ্য হইয়াছিল, সেইরূপ সর্ব্ববিষয়ে সাধু-চরিত্র লাভও ব্রাহ্মসমাজের সাধনের প্রধান অঙ্গ হইয়াছিল। অন্যদিকে ব্রাহ্মদিগকে প্রাচীন সমাজের পৌরহিত্য এবং জাতিভেদ প্রভৃতি সংস্কার বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইত। ব্যক্তিগত চরিত্রে শুদ্ধতালাভ কোন কালে কোনও সমাজেই সহজ নহে। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি প্রকাশ্যভাবে অগ্রাহ্য করিয়া সমাজচ্যুত হইবার ভয় জয় করাও সহজ নহে। সেকালে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে আসিতেন, একদিকে তাঁহাদিগকে নূতন সমাজের কঠোর শাসনাধীনে বাস করিতে হইত; অন্যদিকে পিতা, মাতা, পবিবার ও স্বজনবর্গ হইতেও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হইত। এইজন্য যাঁহারা মনে মনে ব্রাহ্মসমাজের মতবাদকে বিশুদ্ধতর ও শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মানিতেন, তাঁহাদের পক্ষেও প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করা সহজ ছিল না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী এই দোটানায় পড়িয়া

ছিলেন। মানুষ যাহা ভাল মনে করে, দুর্ব্বলতাবশতঃ তাহার অনুসরণ করিতে না পারিলে বড়ই অধোগতি প্রাপ্ত হয়। শিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ অধোগতির পথেই দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবকে এড়াইতেও পারিতেছিলেন না; সাহস করিয়া সেই স্রোতের মাঝখানে ঝাঁপাইয়াও পড়িতে পারিতেছিলেন না। একদিকে ব্রাহ্মসমাজের বিশুদ্ধ মতবাদ ও জীবনের আদর্শ, অন্যদিকে প্রাচীন হিন্দুসমাজের কোমল স্নেহের বন্ধন এবং কঠোর শাসনদণ্ড, এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মাঝখানে পড়িয়া নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাহিরের এই সংগ্রাম তাঁহার ভিতরেও বাধিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা দ্বারা এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা ও ধর্ম্ম প্রচারের মূল কথা। এই কথাটা না বুঝিলে বাংলার নবযুগের ইতিহাসে বঙ্কিম-চন্দ্রের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যার স্থান কোথায় এবং মূল্য ও মর্য্যাদাই বা কি, ইহা বুঝিতে পারা যাইবে না।

বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যার দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে একটা সমন্বয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাঁহার অনুশীলনধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মেরই নামান্তর মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র "কৃষ্ণচরিত্রের" দ্বিতীয় সংস্করণের উপক্রমণিকায় তাঁহার "ধর্ম্মতত্ত্বে" যে কয়টি কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, সংক্ষেপে নিজেই তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে কয়টি কথা এই :—

(১) "মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার 'বৃত্তি' নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

(২) তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম।

(৩) সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

(৪) তাহাই সুখ।"

এই অনুশীলনধর্ম্মের একটা সার সংগ্রহ করিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র কহিয়াছেন ঃ—

"জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্য্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্ম্মাত্মতা এবং সুরসে রসিকতা, এই সকল হইলে তবে মানসিক সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি আছে, অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ এবং সর্ব্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই।"

সংক্ষেপে ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনধর্ম্মের সাধ্য। সেকালের ব্রাহ্মসমাজেরও ইহাই আদর্শ ছিল।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে ব্রাহ্মসমাজ প্রথম যুগে এই আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। সেকালে মার্কিণ চিন্তানায়ক থিয়োডোর পার্কারের প্রভাব খুব বেশী পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজের উপর পড়িয়াছিল। পার্কার ও নিউম্যান তখনকার নবীন ব্রাহ্মদিগের শিক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। পার্কারের চতুরঙ্গ ভক্তি বা four-fold piety এই অনুশীলন ধর্ম্মেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও এই আদর্শের প্রেরণাতেই তাঁহার "ধর্ম্মতত্ত্ব" রচনা করেন।

তাঁহার "অনুশীলন" গ্রন্থে আধুনিক য়ুরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের এবং ধর্ম্মচিন্তার সঙ্গে হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের একটা সমীচীন সমন্বয়ের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। যুক্তি এবং জ্ঞানের ভূমিতেই বঙ্কিমচন্দ্র এই সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মসমাজ মহর্ষির নেতৃত্বাধীনে স্বদেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে কেবলমাত্র উপনিষদকেই বিচারযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরাণাদিকে ভ্রম কুসংস্কার-

সঙ্কুল বলিয়া একেবারেই বর্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহা তলাইয়া দেখেন নাই যে বৈদিক ধর্ম্মের ক্রমবিকাশে যেমন উপনিষদের প্রকাশ হইয়াছিল, সেইরূপ উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের ক্রমবিকাশেই হিন্দুর পুরাণের ও পৌরাণিক ধর্ম্মেরও অভিব্যক্তি হইয়াছে। বেদে ভূল ভ্রান্তি আছে; বেদে দেববাদ আছে; বেদে যজ্ঞবাহুল্য আছে। উপনিষদ এই বৈদিক দেববাদের এবং ক্রিয়াকাণ্ডের সমন্বয় করিয়া ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধনার প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানে মানুষের সকল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইল না। উপনিষদ তিন প্রকারের উপাসনার উল্লেখ করিয়াছেন—এক স্বরূপ উপাসনা; সমাধির অবস্থাতেই এই স্বরূপোপাসনা সম্ভব হয়। সকল প্রকার বহিরিন্দ্রিয় চেষ্টার নিবৃত্তি হইলে আত্মা যখন আপনার বিশুদ্ধ জ্ঞানেতে অবস্থান করে, তখনই এই সমাধির অবস্থা লাভ হয়। গুরুশাস্ত্র-মুখে শুনিয়াছি যে এই সমাধির অবস্থাতে সাধক ব্রহ্মস্বরূপের অপরোক্ষ অনুভব লাভ করেন। এই অনুভবেরই নাম ব্রহ্মাত্মৈকত্বসিদ্ধি। ইহাকে স্বরূপ উপাসনা কহিয়াছেন। এই সমাধির অধিকার যাঁহার লাভ হয় নাই, তিনি স্বরূপোপাসনার অধিকারী নহেন। তাঁহার জন্য ব্যতিরেকী এবং অন্বয়ী এই দুই প্রকারের ব্রহ্মোপাসনা বিহিত হইয়াছে। "নেতি, নেতি"—ইহা ব্রহ্ম নয়, ইহা ব্রহ্ম নয়, ইহাই ব্যতিরেকী উপাসনার সূত্র। "ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য"—এই চক্ষুগ্রাহ্য জগতে ইঁহার রূপ নাই; অর্থাৎ চক্ষে যাহা কিছু দেখি তাহা ব্রহ্ম নহে; কর্ণে যাহা কিছু শুনি তাহা ব্রহ্ম নহে; মন এই ইন্দ্রিয়ানুভূতির পশ্চাতে যাইয়াই যাবতীয় মন্তব্য বিষয়ের সৃষ্টি করে, এ সকলও ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্মকে মনের দ্বারা মনন করা যায় না। বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। এইরূপে ব্রহ্মের মনাতীত, বাক্যাতীত, জগদাতীত সত্তার চিন্তাই ব্যতিরেকী উপাসনা। এই উপাসনার শেষ কথা—

অস্তীতি ব্রবীতি কথং তদুপলভ্যতে

ব্রহ্ম আছেন এই মাত্রই বলা যায়। এছাড়া তাঁর উপলব্ধি আর কিরূপে সম্ভব?

উপনিষদবিহিত অন্যতর উপাসনার নাম অন্বয়ী। এই উপাসনায় যিনি জগদাতীত তাঁহাকেই জগতের প্রতিষ্ঠারূপে ধ্যান করিতে হয়; যিনি ইন্দ্রিয়াতীত, তাঁহাকেই—

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, চক্ষুষঃ চক্ষুঃ, বাচোহবাচং, প্রাণস্য প্রাণম্

অর্থাৎ শ্রোত্রের শ্রোত্র, চক্ষুর চক্ষু, বাক্যের বাক্য, এবং প্রাণের প্রাণরূপে ধ্যান করিতে হয়। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ব্রহ্মস্তোত্রের "নিগু́ণায় নমস্তুভ্যং" ব্যতিরেকী উপাসনার সূত্র। আর "বিশ্বরূপাত্মকায় তে" —অর্থাৎ তুমি বিশ্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি—ইহাই অন্বয়ী উপাসনার মূল সূত্র। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্রুতি

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চজগত্যাং জগৎ

এই চলন্ত জগতে যাহা কিছু চলন্ত বা চঞ্চল বস্তু, তৎসমুদায়কে ঈশ্বরের দ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা যিনি তাঁহার দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। সোজা কথায় যাহা কিছু দেখিতেছ, শুনিতেছ, ভোগ করিতেছ, তৎসমুদায়ের মধ্যে জগৎ-নিয়ন্তা পরমেশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন এই যে বুদ্ধি, ইহার সাধনা করিবে; আমাদের বৈষ্ণব ভক্তেরা কহিয়াছেন,

স্থাবর জঙ্গম দেখে দেখেনা তার মূর্ত্তি
যাঁহা নেত্র পড়ে হয় ইষ্টদেব স্ফুর্ত্তি।

ইহাই অন্বয়ী উপাসনার সিদ্ধি।

পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম উপনিষদবিহিত অন্বয়ী উপাসনার সূত্র অবলম্বনেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই কথাটা যে না বুঝিবে, সে হিন্দুর ধর্ম্ম যে কি বস্তু কিছুই বুঝিবে না। প্রথম যুগের ব্রাহ্মসমাজ

এই কথাটা ধরিতে পারেন নাই বলিয়াই একটা বিরোধের মাঝখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছিলেন; কোনও উদার সমন্বয়ের ভূমিতে উঠিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই চেষ্টাটা করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মে যাহা অপূর্ণ ছিল তাহা পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যাতে উপনিষদ-ধর্ম্মের সঙ্গে পৌরাণিকী হিন্দুধর্ম্মের একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। সমন্বয় করিতে গেলেই পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ উভয় পক্ষকেই একটা সাধারণ ভূমিতে তুলিয়া লইতে হয়; উভয়েরই খণ্ডজ্ঞানকে একটা পূর্ণতর জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করিতে হয়; এবং সেই পূর্ণতর জ্ঞানের কষ্টিপাথরে উভয়কে কষিয়া উভয়ের খাদ বা মিথ্যা কিম্বা সত্যাভাসকে নষ্ট করিয়া উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বকার বিরোধ ভঞ্জন করিতে হয়। ইহাই প্রকৃষ্ট সমন্বয়ের পদ্ধতি। বঙ্কিমচন্দ্র এই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াই উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে প্রচলিত পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের একটা রফা করিতে চেষ্টা করেন।

(৩)

বঙ্কিমচন্দ্রের এই সমন্বয় চেষ্টার প্রথম সূত্র মানবপ্রকৃতির উপরেই মানবধর্ম্ম গঠিত। যে যাহা নয়, সে তাহার জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। জ্ঞান মাত্রই এইজন্য আত্মজ্ঞান। মানুষের মধ্যে যদি ঈশ্বর না থাকেন, তবে মানুষ কখনওই ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। মানুষের এবং ঈশ্বরের মধ্যে সামান্য ধর্ম্ম আছে বলিয়াই মানুষ ঈশ্বরকে জানিতে পারে, ঈশ্বরকে ভক্তি করিতে পারে, ঈশ্বরের পূজা করিতে পারে। এই কথাটা উপনিষদে আংশিক-ভাবে প্রকাশিত। উপনিষদ মানুষকে কেবল আত্মারূপেই দেখিয়াছেন। মানবাত্মার সঙ্গে মানব দেহের যে নিগূঢ় অঙ্গাঙ্গী যোগ হইয়া প্রত্যক্ষ মানবের উৎপত্তি হইয়াছে; মানুষ কেবল বিদেহী আত্মা

নহে, কিন্তু দেহেন্দ্রিয় আত্মাসম্পন্ন জীব, এ কথাটা উপনিষদ উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এইজন্য উপনিষদ-ধর্ম্ম মনুষ্যের পূর্ণ ধর্ম্ম নহে ; আংশিক ধর্ম্ম মাত্র। এই আংশিকধর্ম্মে হিন্দু স্থিতিলাভ করিতে পারিল না। এবং এইজন্যই উপনিষদ্‌-ধর্ম্মের দেহ এবং আত্মার মধ্যে বিরোধের সমন্বয় করিবার চেষ্টায় পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হয়। পুরাণে ব্রহ্মজ্ঞান বর্জিত হয় নাই ; পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে মাত্র। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা মানব প্রকৃতির উপরে। বঙ্কিমচন্দ্র কহিতেছেন যে আমাদিগের সাধারণ লোকের ধর্ম্মসংক্রান্ত বিশ্বাস এই সাধারণ মানবতার আদর্শের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

"হিন্দুর পূজনীয় দেবতাদিগের প্রাধান্য, রূপবান চন্দ্রে বা বলবান কার্ত্তিকেয়ে নিহিত হয় নাই ; বুদ্ধিমান বৃহস্পতি বা জ্ঞানী ব্রহ্মায় অর্পিত হয় নাই ; রসজ্ঞ গন্ধর্ব্বরাজ বা বাগদেবীতে নহে। কেবল সেই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি বিশিষ্ট ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বিষ্ণুতে নিহিত আছে।"

ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বিষ্ণুই হিন্দুর সকল অবতারের মূল। এই বিষ্ণু হইতেই বিশ্বপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিষ্ণু জগৎ-কারণ। এই জগৎ কারণ-রূপী বিষ্ণুরই বিকার বা বিবর্ত্ত বা বৈষ্ণবী পরিভাষায় পরিণাম। কারণে যাহা নাই, কার্য্যে তাহা থাকিতে পারে না। কার্য্যের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি কারণেতে নিত্যসিদ্ধরূপে বিদ্যমান রহে। চিত্রপটে যে ছবিটা তুলিকামুখে তিলে তিলে ফুটিয়া উঠে, চিত্রকরের অন্তরে তাহা পরিপূর্ণরূপে পূর্ব্বেই বিদ্যমান রহে। ইহাই চিত্রের নিত্যসিদ্ধরূপ। এই জগতের নিত্যসিদ্ধরূপ বিষ্ণুতে নিত্য বিদ্যমান। এইজন্যই মানুষেরও নিত্যসিদ্ধ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন রূপ বিষ্ণুতে নিত্য বিদ্যমান। এইজন্যই হিন্দুর সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বপ্রধান পূজনীয়

দেবতা বিষ্ণু। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে এই কথাটাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

(৪)

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কেবল প্রাচীন উপনিষদ-ধর্ম্ম অথবা আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল তত্ত্বের সঙ্গে দেশ-প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের মূল সত্যের সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত রহেন নাই; আধুনিক ইউরোপীয় সাধনার সঙ্গেও ইহার একটা যুক্তিসঙ্গত সমন্বয়ের প্রয়াস পাইয়াছেন। ফলতঃ তিনি যে অনুশীলনধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এক দিকে ইউরোপের কোমত প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের এবং অন্যদিকে ভারতের গীতোক্ত ধর্ম্মের সমন্বয় করিবার প্রয়াস মাত্র। কোমত প্রত্যক্ষ মানুষকেই বা মনুষ্যত্বকেই মানবের একমাত্র সাধ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কোমত সিদ্ধান্তে ঈশ্বর নাই; পরলোক নাই; ধর্ম্মের অতিপ্রাকৃত প্রামাণ্য বা প্রতিষ্ঠা নাই। কিন্তু আছে এই প্রত্যক্ষ মানুষ এবং এই প্রত্যক্ষ মানুষ আপনার অপূর্ণতার ভিতর দিয়াই যে পরিপূর্ণতার আদর্শের দিকে আমাদিগের চিত্তকে প্রেরিত করে সেই আদর্শ। এইজন্যই ইহাকে বিশ্বমানব ধর্ম্ম বা Religion of Humanity বলা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই কোমত ধর্ম্মের সঙ্গে গীতোক্ত ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়া তাঁহার অনুশীলন-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কোমত-ধর্ম্মে যাহা অপূর্ণ ছিল, গীতায় তাহা পূর্ণ হইয়াছে। কোমত-ধর্ম প্রাকৃত মানুষ এবং অতি-প্রাকৃত ঈশ্বরের মধ্যে একটা বিশাল ব্যবধান প্রত্যক্ষ করিয়া অপ্রামাণ্য বলিয়া ঈশ্বরতত্ত্বকে বর্জ্জন করিয়া কেবল সাধারণ ও প্রত্যক্ষ মানবতার উপরেই আপনাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। গীতার ঈশ্বর-বাদ মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। উপনিষদ মানুষের আত্মাকে মাত্র ব্রহ্মরূপে ধরিয়াছিল। গীতা বিভূতিযোগে এবং

বিশ্বরূপে ব্রহ্মাণ্ড এবং মানুষের সঙ্গে ব্রহ্মের একাত্মতা প্রতিষ্ঠা করিয়া উপনিষদের বিরোধ নষ্ট করিতে চাহিয়াছেন। গীতায় ভগবান আপনাকে কেবল নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, কিন্তু যাবতীয় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুকেই আপনার প্রকাশ বা বিভূতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনিই মানুষের আত্মা; তিনিই মানুষের মন; তিনিই মানুষের বুদ্ধি; তিনিই মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রামেরও প্রতিষ্ঠা। এই মানুষের দেহ ক্রমবিকাশ ধারাতে যে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন রূপের ইঙ্গিত করে, সেই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন মানুষী রূপ, যাহা একাধারে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, যার ছাঁচে মানুষের রূপ ফুটিয়া উঠে,—এই স্ফুটায়মান মানুষী রূপ ভগবানে নিত্যসিদ্ধ। পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ মানব প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি—এ সকলও ভগবানে নিত্যসিদ্ধ। সুতরাং কোমত বাদ এবং আধুনিক ইউরোপীয় যুক্তিবাদ মানুষ এবং ঈশ্বরের মাঝখানে যে ব্যবধানের কল্পনা করিয়াছে গীতোক্ত ধর্মে তাহার চুড়ান্ত মীমাংসা হইয়াছে। কোমত-ধর্ম এবং আধুনিক ইউরোপীয় যুক্তিবাদ উভয়ই ঈশ্বরতত্ত্বকে বর্জ্জন করিয়া পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শের উপরে আধুনিক সাধনাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। গীতা ঈশ্বরকে রাখিয়াও এই চেষ্টাই করিয়াছেন। এই জন্য গীতার ধর্মে আধুনিক যুগের ইউরোপীয় অনুশীলনধর্ম পূর্ণতর এবং পূর্ণতম হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের পঞ্চাশ বৎসর পূর্বকার ইংরাজীনবীশেরা সকলেই আধুনিক ইউরোপীয় সাধনার প্রভাবে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেহ বা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে ইউরোপীয় যুক্তিবাদের সঙ্গে মানবের স্বাভাবিক ধর্মপ্রবৃত্তির একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু অনেকেই ভিতরে ভিতরে এই যুক্তিবাদকে অগ্রাহ্য করিতে পারিতে-ছিলেন না; অথচ বাহিরে দেশপ্রচলিত ধর্মের অনুষ্ঠান এবং অনু-শাসন অসত্য জানিয়াও বর্জ্জন করিতে পারিতেছিলেন না; এইজন্য

তাঁহাদের ধর্ম্মজীবন এবং চরিত্র উভয়ই পঙ্গু হইয়া পড়িতেছিল। এই অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'অনুশীলন-ধর্ম্ম' প্রচার করিয়া এই সাংঘাতিক বিরোধের একটা মীমাংসার চেষ্টা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যার ইহাই প্রধান কথা। ব্রাহ্মসমাজ যে কাজটা করিতে চাহিয়াছিলেন, অথচ পুরামাত্রায় করিয়া উঠিতে পারেন নাই, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় প্রকৃতপক্ষে সেই কাজটাই করিতে চাহিয়াছেন। মহর্ষির নেতৃত্বাধীনে ব্রাহ্মসমাজ প্রাচীন উপনিষদের তত্ত্বাঙ্গ ও সাধনাঙ্গের উপরেই মোটামুটি আপনার ধর্ম্মবিজ্ঞান এবং সাধন-প্রণালী গড়িয়া তুলিতে গিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতির ভিতরে যে একটা রক্ষণশীলতা ছিল, তাহারই প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার নেতৃত্বাধীনে য়ুরোপীয় যুক্তিবাদকে অবলম্বন করিয়াও একেবারে সেই যুক্তিবাদের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে নাই। বিশেষতঃ মহর্ষির ব্রাহ্মসমাজ অন্ততঃ তাহার বহিরাবরণে যথাসাধ্য স্বদেশের সাধনার সঙ্গে যোগ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজকে একটা উদার বিশ্বজনীন আদর্শের উপরে গড়িয়া তুলিতে যাইয়া এই স্বাদেশিকতার আবরণটা একেবারে কাটিয়া ছাটিয়া বর্জ্জন করেন। মহর্ষির ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে হিন্দু ভাবের ও হিন্দু সমাজের যে বিরোধ জাগে নাই, কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে সে বিরোধ কেবল জাগিয়া উঠিল তাহা নহে, অতি অল্পকাল মধ্যেই অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিল। এই বিরোধের মুখে যাঁহারা হিন্দুভাব ও হিন্দু সমাজের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারা কিছুতেই ব্রাহ্মসমাজের সত্য মতবাদ এবং উন্নত আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিতে-ছিলেন না। ইহাতে বাংলার শিক্ষিত হিন্দুসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের মতবাদের মধ্যে যেটুকু সত্য বলিয়া ধরিয়াছিলেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শের যতটা বর্ত্তমান ভারতের

উদ্ধারের মূলমন্ত্র বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহাকেই তাঁহার ধর্ম্ম-ব্যাখ্যার দ্বারা দেশমধ্যে প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার 'অনুশীলন-ধর্ম্ম' য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ ও কোমতের মানবধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব এবং ধর্ম্মসাধনের সমন্বয় করিতে চেষ্টা করে। ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যাতে তিনি আধুনিক ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মজ্ঞান এবং ভক্তিসাধনের সঙ্গে ভারতের সনাতন তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তিসাধনার সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার "কৃষ্ণ-চরিত্রে" বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেকালের য়ুরোপীয় চিন্তার মানবতার আদর্শের একটা পরিপূর্ণ ঐতিহাসিক মূর্ত্তি গড়িয়া তুলেন; এবং এইভাবে কোমত প্রচারিত আধুনিক বিশ্বমানবধর্ম্মকে ভারতীয় সাধনার সনাতন ভক্তিপন্থার সঙ্গে মিলাইয়া দেন। সে সময়ে আমাদিগের ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোমত-মতবাদ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। কলিকাতায় ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই মতের একজন প্রধান প্রচারক ছিলেন। "ইণ্ডিয়ান নেশন"—সম্পাদক ৺নগেন্দ্রনাথ ঘোষও এই মতাবলম্বী ছিলেন। আরও অনেকে কোমত-মতবাদের আশ্রয়ে হিন্দুসমাজের আনুগত্যের সঙ্গে তাঁহাদের য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত মত ও বিশ্বাসের একটা কৃত্রিম সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইঁহারা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের কিছুই মানিতেন না; অথচ ব্রাহ্মদিগের মতন নিজেদের মত ও বিশ্বাস অনুযায়ী আচার অনুষ্ঠানাদি অবলম্বন করিয়া সমাজের বহির্ভূত হইতে চাহিতেন না। কোমতমতে সমাজ শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সমাজ শাসনকে অব্যাহত রাখিবার জন্য যথাপ্রয়োজন ত্যাগ স্বীকার করাকেই মানবের শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য বলিয়া প্রচার করে। এই মতবাদকে আশ্রয় করিয়া আমাদেরও একদল ইংরাজী শিক্ষিত লোক নিজেদের জীবনে ব্যক্তিগত

মতামতের সঙ্গে প্রচলিত হিন্দু সমাজের যে বিরোধ বাধিয়াছিল, তাহার একটা নিষ্পত্তি করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইউরোপে এপথে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সমাজশাসনের একটা সমন্বয় সম্ভব; কারণ আধুনিক ইউরোপে সমাজশাসন এবং রাষ্ট্রশাসন একাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। সমাজ-শক্তি রাষ্ট্রশক্তিকে আশ্রয় করিয়া রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থার ভিতর দিয়াই আপনাকে রক্ষা করিতেছে। আর রাষ্ট্র-শাসনের সঙ্গে ধর্ম্মসাধনের একটা ভাগ-বাটোয়ারাও হইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রশক্তি ও ধর্ম্মসাধন উভয়েই নিজের নিজের এক একটা গণ্ডী কাটিয়া নিজেদের একটা স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছেন। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের এই স্বাতন্ত্র্য বা autonomy প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া ইউরোপে এখন স্বাধীনভাবে নিজেদের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী ধর্ম্মসাধন করিয়াও লোকে স্বচ্ছন্দে সমাজের প্রভুত্বকে মানিয়া চলিতে পারে। ইহাতে তাহাদের স্বাধীনতার ব্যাঘাত হয় না, ধর্ম্মবুদ্ধিতেও আঘাত লাগে না। ভারতবর্ষে এখনও জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের এই স্বাতন্ত্র্য বা autonomy প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং আমাদিগের মধ্যে কোমত-পন্থার অনুসরণ করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা ধর্ম্মবুদ্ধিকে অক্ষুন্ন রাখিয়া সমাজ-শাসন মানিয়া চলা সম্ভব নহে। সমাজ-শক্তির সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একটা সমন্বয় সাধন এখানে অত্যাবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্র এই সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন।

রাজা রামমোহন বাংলার নবযুগে সর্ব্বপ্রথমে সমাজ এবং ব্যক্তি, শাস্ত্র এবং স্বানুভূতি, স্বদেশ-প্রীতি এবং বিশ্ব-সেবা,—এ সকলের মধ্যে একটা সমন্বয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষের লোকে নানা ধর্ম্ম যাজন করে দেখিয়া তিনি এসকল ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যেও একটা সমন্বয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। ব্রহ্মজ্ঞানের উপরে রাজার সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যাতে সেই চেষ্টাই

করিয়াছেন ; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের উপরে নহে, ঈশ্বর-ভক্তির উপরে। রাজার সমন্বয়ের শাস্ত্র ছিল বেদান্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের সমন্বয়ের শাস্ত্র হইল ভগবদ্গীতা। এই গীতা-ধর্ম্মের উপরেই তিনি আধুনিক ইউরোপীয় ধর্ম্ম এবং লোকশ্রেয়ের আদর্শকে হিন্দু ভারতের সনাতন ভক্তি-ধর্ম্মের সঙ্গে মিলাইয়া তাঁহার অনুশীলনের ধর্ম্মতত্ত্বকে গড়িয়া তোলেন। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মব্যাখ্যার বিশেষত্ব। আধুনিক ইউরোপ প্রাচীন ধর্ম্মের অতিপ্রাকৃত ঈশ্বর-বাদকে উপেক্ষা করিয়া পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সন্ধানে ছুটিয়াছে। খৃষ্টীয়ানেরা যীশুখৃষ্টকেই ঈশ্বরের একমাত্র অবতার বলিয়া ভজনা করিয়া আসিয়াছেন। আধুনিক খৃষ্টীয়ানেরা এই যীশুখৃস্টকেই মানবতার চরম আদর্শরূপে ধরিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যীশুখৃস্টের জীবনে মানবের সকল বৃত্তির অনুশীলন হয় নাই। পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। "কৃষ্ণ-চরিত্রে" বঙ্কিমচন্দ্র ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ "শারীরিক বলে আদর্শ বলবান"। শ্রীকৃষ্ণ সে সময়ের ক্ষত্রিয়-সমাজে সর্ব্বপ্রধান অস্ত্রবিদ্ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। সেনাপতিত্বেও শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসকলও চরম স্ফুর্ত্তি পাইয়াছিল। মনুষ্য শরীর ধারণ করিয়া যতদূর সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়, কৃষ্ণ ততদূর সর্ব্বজ্ঞ। অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম তত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, যাহার উপরে আজিও মনুষ্য বুদ্ধি যায় নাই, তাহা হইতে চিকিৎসা-বিদ্যা ও সঙ্গীতবিদ্যা, এমন কি অশ্বপরিচর্য্যা পর্য্যন্ত তাঁহার আয়ত্ত ছিল। কৃষ্ণের কার্য্যকারিণী বৃত্তিসকলও চরম স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত। তাঁহার ধর্ম্ম এবং সত্য অবিচলিত। বলদৃপ্তগণের অপেক্ষা বলবান হইয়াও লোকহিতার্থ তিনি শান্তির জন্য দৃঢ়যত্ন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি সর্ব্বলোকহিতৈষী, কেবল মনুষ্যের নহে গো-বৎসাদি তির্য্যকযোণির প্রতিও তাঁহার দয়া। তিনি আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর হিতৈষী, অথচ আত্মীয় পাপাচারী হইলে তিনি

তাহার শত্রু। তিনি স্বজনপ্রিয়, কিন্তু লোকহিতার্থ স্বজনের বিনাশেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সকল শ্রেষ্ঠবৃত্তি কৃষ্ণে চরম স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনে তিনি অপরাঙ্মুখ ছিলেন না; কেন না তিনি আদর্শ মনুষ্য।

"কৃষ্ণ সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে সর্ব্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে অপরাঙ্মুখ, ধর্ম্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ শাস্তা, নির্মম, নিরহঙ্কার, যোগযুক্ত, তপস্বী। তিনি মানুষী শক্তি দ্বারা কর্ম নির্ব্বাহ্ করেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র অমানুষ।"

বঙ্কিমচন্দ্র "কৃষ্ণ-চরিত্রে" পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সঙ্গে ঈশ্বর-প্রকৃতির সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিয়া আধুনিক সাধনায় বিশ্ব-ধর্মের গোড়াপত্তন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। রাজা রামমোহন যে কর্মের সূচনা করেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেই কর্মকেই আধুনিক সময় ও সাধনার উপযোগী করিয়া পরিপূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাংলা নবযুগের যুগ-প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন যে সমন্বয় ধারা প্রবর্ত্তিত করেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেই ধারাকেই তাঁহার "ধর্মতত্ত্বে" ও "কৃষ্ণ-চরিত্রে" ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।

ত্রয়োদশ কথা

বঙ্কিম সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি

(১)

সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকেরা বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলার শ্রেষ্ঠতম গল্প-লেখক বলিয়াই জানেন। অপেক্ষাকৃত অল্প লোকেই তাঁর ধর্মগ্রন্থাদির আলোচনা করিয়া থাকেন। যাঁরা করেন, তাঁরাও সকলে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কি, ইহা তলাইয়া দেখেন না। বহুদিন হইতেই এদেশে ব্রাহ্মসমাজের উপরে লোকের অন্তরে একটা বিরাগ জন্মিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর "অনুশীলনে," "ভগবদ্গীতায়" এবং "কৃষ্ণ-চরিত্রে" ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রাণে হিন্দুধর্মের প্রতি একটা নূতন অনুরাগ জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন, অনেকেরই এই ধারণা। এই জন্য অনেকেই, বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া যে একটা উদার সমন্বয়ের সন্ধানে গিয়াছিলেন, ইহা ধরিতে পারেন না। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাংলাদেশে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিকূলে একটা প্রবল আন্দোলন জাগিয়া উঠে। ফলতঃ এই আন্দোলনের ভিতরকার কথা ঠিক ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব নষ্ট করাও ছিল না। ইহার মূলে একটা নূতন পরজাতিবিদ্বেষ, বিশেষতঃ ইংরাজ-বিদ্বেষই জাগিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ অনেকটা বিদেশী ঢং অবলম্বন করিয়াছিলেন। একটা কল্পিত সার্ব্বজনীনতার সন্ধানে যাইয়া, ব্রাহ্ম সমাজ স্বাদেশিকতাকে কেবল উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন, তাহা

নহে, প্রকাশ্যভাবে তাহার প্রতিকূলতাই করিতেছিলেন। এই কারণেই চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বকার এই স্বাদেশিকতার ভাবস্রোত ব্রাহ্ম-সমাজকে যাইয়া গুরুতর আঘাত করিতে আরম্ভ করে। এই আন্দোলনকে আমরা সেকালে হিন্দু-পুনরুত্থান বা Hindu Revival নাম দিয়াছিলাম। এই আন্দোলনও আমাদের বর্ত্তমান চিন্তা, ভাব ও কর্মের ধারাকে নানা দিক দিয়া পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে—সে কথা আর একদিন, ঈশ্বর ইচ্ছা হইলে, কহিব। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে কেবল এইমাত্রই বলা প্রয়োজন যে অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রকে এই পুনরুত্থানেরই একজন প্রধান পুরোহিত বলিয়া মনে করেন। এই কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে। অনেকেই এই পুনরুত্থানে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ নিজেও যে একাজটা একেবারে করেন নাই, এমন নহে। খৃষ্টীয় ধর্মের প্রতিপক্ষতা করিতে যাইয়া খ্রীষ্টীয়ান পাদ্রীদিগের প্রচারের ব্যাঘাত জন্মাইয়া, বাংলার হিন্দুসমাজকে খ্রীষ্টীয়ানীর হাত হইতে বাঁচাইয়া প্রথমে "বেদান্ত প্রতিপাদ্য" ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচার করিয়া ব্রাহ্মসমাজই সর্ব্বপ্রথমে আধুনিকযুগে হিন্দুপুনরুত্থান প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা রামমোহন হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সাধনার সংস্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া, একটা সমীচীন সমন্বয়ের পথ ধরিয়াই চলিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুর ধর্ম্ম ও সাধনাকে দেশকাল পাত্রোপ-যোগী করিয়া সত্য ও সতেজ করিবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। পর-ধর্ম্মের ও বিদেশীয় সাধনার সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু সাধনার কোনও মারাত্মক বিরোধ বাধাইতে যান নাই, কিন্তু একটা উচ্চতর জ্ঞানের ও সার্ব্বজনীন অভিজ্ঞতার ভূমিতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে কোথায় মিল আছে, তাহা দেখাইয়া ধর্ম্মে ধর্ম্মে জগতে প্রাচীনকাল হইতে যে বিরোধ বাধিয়া আছে, তাহাই মিটাইতে চাহিয়াছিলেন। সম্মেলন ও সমন্বয়ই রাজার শিক্ষার ও সাধনার মূল কথা ছিল। ইহাই বঙ্কিম

চন্দ্রের ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মসাহিত্যেরও যে মূল কথা, পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইহা দেখিয়াছি। কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকেরা ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখেন না। অনেকেই এই জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে পঞ্চাশ বৎসর আগে-কার হিন্দু-পুনরুত্থানের একজন প্রধান পুরোহিত বলিয়া মনে করেন। সে আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র নহেন শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়। আর অনেকেই একথা জানেন না যে বঙ্কিমচন্দ্র তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মতানুবর্ত্তী ছিলেন না। তর্কচূড়ামণি মহাশয় যেভাবে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র সায় দিতে পারেন নাই। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পদ্ধতিকে আমরা সেকালে "আধ্যাত্মিক" ব্যাখ্যা কহিতাম। বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ "আধ্যাত্মিক" ব্যাখ্যার আদৌ সমর্থন করেন নাই। তাঁর' অনুশীলনে', 'ভগবদ্গীতায়' কিম্বা "কৃষ্ণ-চরিত্রে" কোথাও এই "আধ্যাত্মিক" ব্যাখ্যার নাম গন্ধ পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক গবেষণার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন। ফরাশীস্ চিন্তা-নায়ক মসেঁা রেণাঁ (Renan) যে পদ্ধতি ধরিয়া খ্রীষ্ট চরিত্রের ও খ্রীষ্টধর্মের একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন, বঙ্কিম-চন্দ্র ঠিক সেই বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বনেই হিন্দুধর্মের ও কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আর এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রকে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের দলে ঠেলিয়া ফেলা সম্ভব হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্বের অন্বেষণে যাইয়া বিরোধের পথ ধরেন নাই, একটা উদার সমন্বয়ের পথই ধরিয়াছিলেন। এই জন্যই বঙ্কিম-চন্দ্রের ধর্মসাহিত্য আধুনিক বাংলার চিন্তার ও সাধনার ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। রাজা রাম-মোহন হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত নবযুগের বাঙ্গালীর সাধনা ও সাহিত্যের মধ্যে যে একই ধারা নিরবচ্ছিন্ন হইয়া প্রবাহিত

হইয়া আসিয়াছে, একথাটা অনেকেই ধরিতে পারেন না। এই ধারাতে যাঁহার স্থান নাই, বাংলার নবযুগের ইতিহাসেও তাঁহার বিশেষ স্থান থাকিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধারারই লোক বলিয়া, বাংলার নবযুগের কথায় তাঁহার একটা অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা আছে।

(২)

রাজা রামমোহন যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, বঙ্কিম-সাহিত্যে তাহাই অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজার পথ সমন্বয়ের পথ ছিল। কি রস-সাহিত্যে, কি ধর্ম-সাহিত্যে, সকল বিভাগেই বঙ্কিমচন্দ্রও একটা উদার সমন্বয়-সূত্র ধরিয়া চলিয়াছেন। যেমন ধর্মবিচারে, সেইরূপ রাষ্ট্রীয় সমস্যার আলোচনাতেও রাজা রামমোহন এই সমন্বয়ের পথেই চলিয়াছিলেন। রাজার রাষ্ট্রনীতি বিরোধের উপর গড়িয়া উঠে নাই, একটা উদার সম্মেলনের ভূমিকেই গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তখনও ব্রিটিশ-সিংহ এদেশে নিজের মূর্ত্তি ধারণ করেন নাই। তখনও দেশের লোক একেবারে হতবল হইয়া পড়ে নাই। তখনও, আর কিছু থাকুক আর না থাকুক, কামড়াইবার শক্তিটা দেশে ছিল। আর থাকুক বা না থাকুক, নূতন রাজপুরুষেরা দেশের লোকের নখদন্তের ভয়টা তখনও করিতেন। ক্রমে ইংরেজের সঙ্গে দেশের লোকের যে তীব্র বিরোধ বাধিয়া উঠিয়াছে, রাজার সময়ে তাহার পূর্ব্বাভাসও ফুটিয়া উঠে নাই। কিন্তু ইংরাজ শাসন যে পরগাছা, ইহা রাজা দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই পরগাছা যে চিরদিন বা বহুদিন দেশে বদ্ধমূল হইয়া থাকিতে পারিবেনা,—ইহাও রাজা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। রাজা বিলাতে যাইয়া আর্নল্ড নামে একজন ইংরাজকে তাঁর লেখা-পড়ার কাজে নিযুক্ত করেন। এই আর্নল্ড সাহেব লিখিয়াছেন

যে রাজা মনে করিতেন যে ভারতবর্ষ ইংরাজ শাসনাধীনে আসিয়া নানা দিক দিয়া লাভবানই হইয়াছে। আধুনিক সভ্যতা ও সাধনার স্রোতের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়া, ভারতের বহুশতাব্দীগত জড়তা নষ্ট হইয়া যাইবে। এই জন্য তিনি ইংরাজ শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধারের জন্য যে কাজটা প্রয়োজন, ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যেই তাহা শেষ হইয়া যাইবে; এবং চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ইংরাজ ভারতের রাজা হইয়া থাকিবে, তার পরেই ভারতবর্ষও আধুনিক জগতের অপরাপর সভ্য জাতির মতন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালাভ করিবে,—ইহাই রাজা মনে করিয়াছিলেন। আর্‌নল্ড সাহেবের জবানীতে ইহাই জানিয়াছি। রাজা স্বাধীনতার অকৃত্রিম উপাসক ছিলেন। স্বাধীনতাই তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য ছিল। স্বাধীনতাই তাঁহার অভিধানে পরম পুরুষার্থ ছিল। এই জন্যই হিন্দুর সন্ধ্যাবন্দনার উদ্বোধন-মন্ত্রটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। রাজা বৈদান্তিক ছিলেন। মানুষ নিজের সত্য স্বরূপে "নিত্যমুক্ত স্বভাববান"—ইহাই রাজার সিদ্ধান্তের মূল কথা ছিল। এই "নিত্যমুক্ত স্বভাবসম্পন্ন" যে মানুষ তাহাকে তার এই স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে, জীবনের সকল বিভাগেও সর্ববিধ সম্বন্ধে এই স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, ইহাই রাজার সমাজ-তত্ত্বের বনিয়াদ ছিল। এই বনিয়াদের উপরেই রাজা তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্মকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই গেল রাজার বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানের একদিক। ইহার আর এক দিক ছিল—"সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি।" আমার আত্মাতে যে অন্তর্যামী পুরুষ বিদ্যমান থাকিয়া আমার জীবনকে পরিচালিত করিতেছেন, সকল মনুষ্যের আত্মাতেই সেই একই অন্তর্য্যামী পুরুষ বিদ্যমান রহিয়াছেন, এটি প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষমাত্রকেই শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করা বৈদান্তিক সাধনের আর এক দিক। বেদান্ত কহিয়াছেন—

যশ্চায়ং অস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ
যশ্চায়ং অস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ
ত্বমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যপন্থাবিদ্যতেঽয়নায় ॥

অর্থাৎ এই বাহিরের আকাশে বা জড়সৃষ্টির মধ্যে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ বিদ্যমান থাকিয়া সকল অনুভব করিতেছেন, এই অন্তরের মধ্যে (সর্ব্বজীবান্তর্বাসীরূপে) যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ বিদ্যমান থাকিয়া সকল জানিতেছেন—কেবল তাঁহাকে জানিতে পারিলেই জীব মৃত্যুকে বা সংসারকে অতিক্রম করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে, মুক্তির আর অন্য পথ নাই। এই বেদান্ত-সিদ্ধান্তের আশ্রয়ে রাজার জীবন, সাধনা ও কর্ম্ম ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি এই জন্যই সমাজ-সংস্কার ও রাষ্ট্রসংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। আর তারই জন্য সকল বিষয়েই রাজা একটা উদার সমন্বয়ের পথ ধরিয়া চলিয়াছেন। এই সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি বা ব্রহ্মদৃষ্টির প্রভাবেই রাজার রাষ্ট্রীয় আদর্শও বিরোধ ও বিদ্বেষের দ্বারা প্রেরিত হয় নাই, কিন্তু মিলন ও সমন্বয়ের সন্ধানেই গিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রীয় আদর্শও এই সমন্বয়ের পথেই চলিয়াছিল। কিন্তু অনেকেই এই কথাটা ধরিতে পারেন না।

(৩)

রাষ্ট্রনীতির প্রেরণা আসে, রাষ্ট্র-রক্ষার প্রয়োজন হইতে। যার রাষ্ট্র নাই বা রাজ্য নাই তার রাষ্ট্রনীতি—মাথা নাই যার তার মাথা ব্যথার মতন। আর থাকা অর্থই নিজের অধিকারে থাকা। যে বস্তুর উপরে যার অধিকার নাই, যাহার সম্বন্ধে যার মমত্ব-বোধ নাই—এ বস্তু আমার এই বুদ্ধি যে বস্তু সম্বন্ধে নাই, সে বস্তু প্রকৃতপক্ষে তার নিকটে নাই বলিলেই চলে। রাষ্ট্রনীতির প্রতিষ্ঠা হয় রাষ্ট্র সম্বন্ধে

এই মমত্ব-বোধের উপরে। কোনও কালে আমাদের দেশে এই রাষ্ট্রীয় আত্মবোধ বা মমত্ববোধ ছিল কি না, বলা বড় সহজ নহে। সমাজ সম্বন্ধে আমাদের সাধনা ও সভ্যতা খুবই প্রবল মমত্ববোধ জাগাইয়াছিল। এই সমাজ আমার, আমি এই সমাজের—এই সমাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ। ভ্রূণ যেমন মাতৃগর্ভে বা জরায়ুশয্যায় বাস করে, আমরা প্রত্যেকে সেইরূপ এই সমাজ-মাতৃকার গর্ভে বাস করিতেছি। মায়ের শোণিতের দ্বারা যেমন গর্ভস্থ ভ্রূণের দেহ গড়িয়া উঠে, মায়ের জীবন-শক্তির দ্বারা যেমন গর্ভস্থ সন্তানের প্রাণ বাঁচিয়া থাকে ও শক্তিলাভ করে, ঠিক সেইরূপ সমাজের ধনবল, জ্ঞানবল, ধর্ম্মবল, এ সকলই আমাদের প্রত্যেকের ধন, জ্ঞান ও ধর্ম্মের আধার ও আশ্রয় হইয়া আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সার্থকতা সম্পাদনে সহায়তা করিতেছে। গাছের ডাল যেমন কাটিয়া ফেলিলে শুকাইয়া যায় ও যাহা সতেজ পত্রপল্লবশোভিত ছিল, যাহাতে ফুল ফল ধরিতে পারিত, তাহা কেবল আগুনে দিয়া জ্বালাইবারই উপযুক্ত হয়, সমাজ-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে মানুষেরও ঠিক সেইরূপ দশাই ঘটে। এই জন্য আমরা চিরদিনই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির যে একটা অতি ঘনিষ্ঠ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে, ইহা জানিতাম ও বুঝিতাম। এই জন্য আমাদের দেশে চিরদিনই সমাজ সম্বন্ধে একটা গভীর মমত্ববোধ ছিল। আর সমাজের প্রতিষ্ঠা ধর্ম্মে; অথবা ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা সমাজে। এইজন্য আমরা চিরদিনই সমাজানুগত্যকে ধর্ম্মের বনিয়াদ বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। "যদি যোগী ত্রিকালজ্ঞঃ সমুদ্রলঙ্ঘনক্ষমঃ তথাপি লৌকিকাচারঃ মনসাঽপি ন লঙ্ঘয়েৎ"—এই কথাটার নিগূঢ় মর্ম্ম ইহাই। সমাজকে কখনও অতিক্রম করিয়া চলিও না, ইহাই আমাদের দেশের চিরকালের অনুশাসন। সমাজকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পার কেবল এক অবস্থায়—নিজের

মোক্ষলাভের জন্য, পরমেশ্বরকে ঐকান্তিকভাবে জীবনের কর্ত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥

বর্ণাশ্রমাদি সর্ব্ববিধ সমাজ-ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কেবল একমাত্র আমারই শরণাগত হও; আমি তোমাকে সমাজধর্ম্মবর্জ্জনজনিত যে পাপ তাহা হইতে রক্ষা করিব। যে ঈশ্বরে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছে, সে যে বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হইয়া গিয়াছে, সে যে জীবন্মুক্ত পুরুষ। তার হৃদয়-গ্রন্থিসকল ছিন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ তার আত্ম-সুখবাসনা নিঃশেষ নষ্ট হইয়াছে। তার সকল সংশয় দূর হইয়াছে। তার সকল কর্ম্ম কটাক্ষে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। যার কর্ম্মক্ষয় হইয়াছে তার সমাজের সম্বন্ধে বিশিষ্ট মমত্ববোধও ঘুচিয়া গিয়াছে। সে সর্ব্বভূতে আত্মবুদ্ধিলাভ করিয়া, ইহা আমার ইহা পরের, এই অভিমান হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। যে এইভাবে বিশ্বাত্মৈকত্ব সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছে সে যে সকল প্রকারের ভেদ বিরোধের সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্বের অতীত হইয়াছে, সে মুক্ত। সমাজ তাহাকে বাঁধিবে কিরূপে? ইহাই আমাদের প্রাচীন সমাজতত্ত্বের ও ধর্ম্মতত্ত্বের মূল কথা ছিল। এই পথেই আমাদের প্রাচীনেরা সমাজধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই পথে আমাদের মধ্যে চিরদিনই আমাদের সমাজ সম্বন্ধে একটা প্রগাঢ় ও প্রবল মমত্ববোধ জন্মিয়াছিল; কিন্তু রাষ্ট্র সম্বন্ধে এরূপ কোনও মমত্ববোধ জন্মে নাই।

ফলতঃ আমাদের এই চিরাগত সামাজিক একাত্মবোধে রাষ্ট্রীয় একাত্মবোধটা ভাল করিয়া কেন, একরূপ একেবারেই ফুটিয়া উঠিতে দেয় নাই। যতদিন সমাজশক্তি ও রাষ্ট্রশক্তি একাধারে নিহিত ছিল,

ততদিন আমাদের এই সামাজিক মমত্ববোধই রাষ্ট্রীয় মমত্ববোধকে জাগাইয়া রাখিয়াছিল। রাষ্ট্রের উপরে হাত পড়িলে সমাজের উপরে হাত পড়িল। সমাজের উপরে হাত পড়িলে ধর্ম্মের উপরও হাত পড়িল। এইভাবে ততদিন আমরা রাষ্ট্রবুদ্ধির বা পলিটিক্যাল কনসাস্‌নেসের ('political consciousness'এর) প্রেরণার নহে, কিন্তু ধর্ম্মের প্রেরণায় রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপাত করিয়াছি। রাষ্ট্র গেলে সমাজের স্বাতন্ত্র্য গেল, সমাজের স্বাতন্ত্র্য গেলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। সমাজের শৃঙ্খলা অর্থাৎ আত্ম-শাসনশক্তি নষ্ট হইলে ধর্ম্মের আশ্রয় আর থাকিবে না। ধর্ম্ম গেলে সকলই যাইবে। এইভাবেই মুসলমানাধিকার সময়ে রাজপুত সমাজে একটা প্রবল দেশাত্মবোধ জাগিয়াছিল। কিন্তু ইহাকে সত্যভাবে দেশাত্মবোধ বলা যায় না। রাজপুতদিগের বলবীর্য্য স্বদেশ বা স্বরাষ্ট্রকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই, নিজেদের সমাজকে আশ্রয় করিয়া সেই সমাজের স্বাতন্ত্র্য ও শুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্যই জাগিয়া উঠিয়াছিল। রাজপুত বীর-কীর্ত্তি কলাপের ইতিহাসে তাঁহাদের সমাজ" ধর্ম্মটাই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে আমরা এখন যাহাকে রাষ্ট্রধর্ম্ম বা পলিটিকস্‌ বলিয়া বুঝি, তাহা তেমনভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। যে পথে রাজপুত বীরশক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই পথেই রাজপুতানার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাও লোপ পাইয়াছিল। সমাজধর্ম্ম রাষ্ট্রধর্ম্ম অপেক্ষা বড় হইয়াছিল বলিয়া, রাজপুতেরা দেশকালপাত্র বিবেচনায় নিজেদের নীতিকে গড়িয়া তুলিতে পারে নাই; রাষ্ট্রধর্ম্মের খাতিরে রাষ্ট্রীয় স্বত্ব-স্বার্থ রক্ষার জন্য সমাজধর্ম্মকে বদলাইয়া, উদার করিয়া, প্রবলতর বহিঃশত্রুর ও পরকীয় রাষ্ট্র ও সমাজ-শক্তির সঙ্গে একটা সত্য ও স্থায়ী রফা করিতে পারে নাই। এই জন্যই রাজপুতেরা রাষ্ট্রশক্তির ও রাষ্ট্রিয় স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে সকলই হারাইয়া বসিল, আর এখনও

সামাজিক মমত্বাভিমানের নিগড়ে বাঁধা পড়িয়া একটা মিথ্যা গৌরবের অভিনয় করিতেছে।

বস্তুতঃ একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদের ঐকান্তিক সামাজিক আত্মবোধ বা মমত্ববোধই আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন ও ভারতের রাষ্ট্রশক্তিকে চিরদিন পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, এখনও রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। সমাজকে আমরা রাষ্ট্র হইতে পৃথক করিয়া লইয়া রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার মধ্যেই বহু শতাব্দী ধরিয়া একটা কৃত্রিম ও সঙ্কীর্ণ সামাজিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। ইহার ফলে আমাদের মধ্যে চিরদিনই একটা অতি সতেজ সামাজিক আত্মবোধ (social consciousness) ছিল, কিন্তু ইংরাজ আসিবার পূর্ব্বে একটা সত্যকার রাষ্ট্রীয় আত্মবোধ বা political consciousness জাগে নাই। এইজন্য আমাদের সমাজ ছিল, কিন্তু আধুনিক জগতে যাহাকে nation কহে, তাহা ছিল না। আমাদের প্রাচীন সাধনায় দুইটি বস্তু আমাদের চক্ষে খুবই ফুটিয়া উঠিয়াছিল—এক সমাজ, আর এক বিশ্ব।
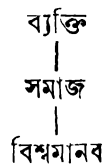
এই ত্রিপাদে আমাদের সামাজিক চিন্তা ও সমাজ-বিজ্ঞান ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বহু ব্যক্তির সমষ্টি সমাজ। বহু সমাজের সমষ্টি বিশ্বমানব বা মানবজগৎ। মাঝখানে যে বহু সমাজের সম্মেলনে ও সমন্বয়ে এক একটা রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে ও নেশন প্রতিষ্ঠিত করে, এই কথাটা আমাদের প্রাচীন সামাজিক চিন্তাতে ধরা পড়ে নাই। আর পড়ে নাই বলিয়াই আমাদের সামাজিক জীবন যতটা ঘননিবিষ্ট,

যতটা সতেজ সংহত হইয়া উঠিয়াছিল, রাষ্ট্রীয় জীবন বা পলিটিক্যাল্ লাইফ্ ততটা সতেজ ও সংঘবদ্ধ হইয়া গড়িয়া উঠে নাই। সমাজের পরেই আমরা একেবারে বিশ্বমানবের সাধনা করিতে গিয়াছি। ইহাই "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়" মন্ত্রের অর্থ। এই জগদ্ধিতায়র সঙ্গে গোব্রাহ্মণহিতায় চ—এই জন্যই অমন অদ্ভূতভাবে মিলিয়া গিয়াছিল। গো আর ব্রাহ্মণ ভারতের হিন্দুসমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ। গো আর ব্রাহ্মণের উপরে হিন্দুসমাজের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত। গো মাতা ইহার দ্বারা জগতের অন্যান্য সমাজের সঙ্গে আমাদের বৈশিষ্ট্য ও ও পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট হইল। অপর সমাজে গো-হত্যা নিষিদ্ধ নহে। হিন্দুর সমাজেই ইহা ব্রহ্মহত্যার এক পর্য্যায়ভূত। আর ব্রাহ্মণে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। ব্রাহ্মণ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মুখ্য নিদর্শন। ব্রাহ্মণত্বের উপরেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং গো-ব্রাহ্মণ হিন্দুর সমাজ-জীবনের মুখ্য বস্তু। গোব্রাহ্মণহিতায় অর্থে সমাজের হিত। সমাজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা, সমাজ জীবনের শুদ্ধতা ও স্বাতন্ত্র্যকে বাঁচাইয়া রাখা। আর ইহার পরেই জগদ্ধিতায়—বিশ্বের কল্যাণব্রত সাধন। হিন্দুর এই চিন্তাধারাতে, হিন্দুর এই সমাজ-বিজ্ঞানে সমাজ-তত্ত্বের মাঝখানে রাষ্ট্র বা নেশন বলিয়া কোন তত্ত্ব ফুটিয়া উঠে নাই। আর ফুটিয়া উঠে নাই বলিয়াই হিন্দুর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালোপেও তার সামাজিক স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় নাই। বরং যেই হিন্দুর রাষ্ট্রলক্ষ্মী অপরের হাতে যাইয়া পড়িল, হিন্দু অমনি আরও দৃঢ়তর মুষ্টিতে আপনার সমাজশক্তিকে আঁকড়াইয়া ধরিল। রাষ্ট্রলক্ষ্মী গেছে যাক্ না—লক্ষ্মী ত চিরকালই চঞ্চলা, লক্ষ্মী ত চিরদিন এক ঘরে বাঁধা থাকেন না। রাষ্ট্রলক্ষ্মী গেছে যাক; সমাজটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলেই হইল। এইভাবে বাহিরে যতই পরাধীনতার শৃঙ্খল কঠোর হইতে কঠোরতর হইতে লাগিল, হিন্দু ততই নিজের সমাজের বুকে প্রবেশ

করিয়া কঠোরতর আচার বিচারের বেড়া দিয়া নিজকে দুনিয়া হইতে সরাইয়া ও বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। ইহার ফলে এই সামাজিক আত্মবোধে ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার বলে বলীয়ান হইয়া, হিন্দু রাষ্ট্র সম্বন্ধে ক্রমে একেবারেই উদাসীন হইয়া পড়িল। এটি না হইলে মুসলমানেরা এমনভাবে একরূপ অনেকটা নির্ব্বিবাদে এতকাল ধরিয়া হিন্দুর উপরে নিজেদের স্বেচ্ছাতন্ত্রী প্রভুশক্তি প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিত না। আমাদের গভীর সামাজিক মমত্ববোধই বহুল পরিমাণে আমাদের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার জন্য দায়ী।

(৪)

এই সামাজিক মমত্ববোধ বা social consciousness একটা অতি মহার্ঘ বস্তু। এ বস্তু হারাইলে চলিবে না। আমাদের সাধনাতে যেমন ব্যক্তির পরে সমাজ, সমাজের পর একেবারেই বিশ্বমানবে যাইয়া পৌঁছিবার চেষ্টা হইয়াছিল নেশন বা রাষ্ট্র যে একটা মাঝখানের ধাপ আছে, এদিকে আমরা ভাল করিয়া লক্ষ্য করি নাই, য়ুরোপের সাধনাতেও সেইরূপ

ব্যক্তি
|
রাষ্ট্র বা নেশন
|
বিশ্বমানব
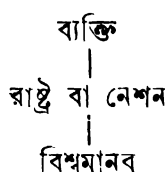
এই তিন ধাপেই সমাজ-বিজ্ঞানটা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। ব্যক্তির পরে যে একটা সমাজিক জীবনের সোপান আছে, ব্যক্তিগত individual consciousness'এর পরে যে একটা social consciousness আছে, এই কথাটা য়ুরোপ ভুলিয়া গিয়াছে। আর ভুলিবার কারণ এই যে য়ুরোপে বহুদিন হইতে এই social consciousnessটা political consciousness'এর সঙ্গে—সামাজিক আত্ম-

বোধটা রাষ্ট্রীয় আত্মবোধের সঙ্গে মিশিয়া আছে। যুরোপে আমাদের দেশের মত বহু সমাজের সমাবেশ হয় নাই। সমগ্র যুরোপে ফলতঃ একটা মাত্র সমাজই গড়িয়া উঠিয়াছে। যুরোপের লোকেরা সকলেই এক সমাজের অন্তর্গত। তাহাদের ধর্ম্ম এক, রীতিনীতি এক, ক্রিয়াপদ্ধতি এক,—সামাজিক জীবনের সকল ব্যাপারই মোটের উপরে এক নিয়মে শাসিত, এক ছাঁচে ঢালাই করা। সামাজিক জীবন সম্বন্ধে ইংরাজে ফরাসীশে, অষ্ট্রিয়ানে ও জর্ম্মাণে, ইতালীয়ে ও স্পেনীয়ে কোন বিরোধ নাই, বিশেষ প্রভেদই আছে কি না সন্দেহ। এইজন্য ইহাদের মধ্যে স্বচ্ছন্দে আদানপ্রদান চলে। যুরোপের এক দেশের লোক অন্য দেশে যাইয়া স্বল্পবিস্তর সেই দেশের সমাজের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া যাইতে পারে। কেবল ইহুদীরা যুরোপে আপনাদের সামাজিক স্বাতন্ত্র্যটা যথাসম্ভব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহাও আর পারিতেছে না। যুরোপে একটা সমাজই গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং যুরোপে ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যটা রাষ্ট্রীয় জীবনের আশ্রয়েই ফুটিয়া উঠিবার ও আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে। এই জন্য যুরোপের সামাজিক অভিব্যক্তি ব্যক্তি হইতে রাষ্ট্র, রাষ্ট্র হইতে বিশ্বমানবে যাইয়া পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের সামাজিক অভিব্যক্তিও পূর্ণ হয় নাই। যুরোপের সামাজিক অভিব্যক্তিও পূর্ণ নহে। আমরা সমাজকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে হারাইয়াছি। যুরোপ একেবারে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপরে রাষ্ট্র-স্বাতন্ত্র্যকে গড়িয়া তুলিতে যাইয়া, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অরাজকতার পথে ছুটিয়া যাইতেছে; এবং সোসিয়লিজম, সিণ্ডিক্যালিজম্, বল্‌শেভিজম্ প্রভৃতি মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিয়া অসংখ্য ও সাংঘাতিক সমাজ-সমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছে।

রাষ্ট্রনীতির জন্ম হয় রাষ্ট্ররক্ষা ও রাষ্ট্রীয় অভ্যুদয়লাভের চেষ্টা হইতে। এই চেষ্টার উৎপত্তি হয় রাষ্ট্রের প্রতি মমত্ববুদ্ধি হইতে। পুরাকালে রাষ্ট্র ছিল রাজাদিগের; সুতরাং রাষ্ট্রের প্রতি সত্য মমত্ববুদ্ধি কেবল রাষ্ট্রপতিদিগের অন্তরেই জন্মিত। সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জের অন্তরে রাজভক্তির অনুশীলন কিছুটা হয়ত হইত, এবং এই রাজভক্তির আশ্রয়েই অপরোক্ষভাবে তাহাদের রাষ্ট্রের প্রতি কতকটা মমত্ববুদ্ধি জন্মিত। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতি সত্য মমত্ববুদ্ধি প্রজাদিগের মধ্যে সেকালে ছিল না। সাধারণ লোকে নিজেদের সমাজটাকেই প্রত্যক্ষভাবে আপনার বলিয়া ভাবিত। বিভিন্ন সমাজের সমবায়ে আধুনিককালে যে সকল বিচিত্র রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা তখনও গড়িয়া উঠে নাই। এই জন্য সেকালে আমরা আজিকালি যাহাকে দেশাত্মবোধ কহিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা ভাল করিয়া জন্মে নাই। দেশ আমার, আমি দেশের,—দেশের জনসমষ্টির কল্যাণ ও অকল্যাণের উপরে আমার নিজের এবং আমার স্বজনবর্গের কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে, এই ধারণা হইতেই সত্য দেশাত্মবোধের জন্ম হয়। আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় সাধনাতে এই দেশাত্মবোধ জাগানই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম ছিল। রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার নবযুগের সকল চিন্তানায়কই আপন আপন ভাবে নিজ নিজ অধিকারে এই কাজটি করিয়াছেন। বঙ্কিম-সাহিত্যের সকল বিভাগেই এই দেশাত্মবোধের প্রেরণা জাগিয়া আছে। এই ভিত্তির উপরেই বঙ্কিম-সাহিত্যে একটা সমীচীন রাষ্ট্রনীতিও গড়িয়া উঠিয়াছে।

আত্মা ও অনাত্মার—আমাদের প্রাচীন দর্শনের পরিভাষায় 'অহং এবং ইদং'এর—সংঘর্ষ এবং বিরোধ হইতেই আত্মজ্ঞান জন্মে। অপরের সম্মুখীন না হইলে আমি যে আমি, এই জ্ঞানের উদয়

হয় না। পরকীয় রাষ্ট্রশক্তির সম্মুখীন না হইলে রাষ্ট্রীয় আত্মবোধও জন্মিতে পারে না। পরকীয় রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে বিরোধ এবং প্রতিযোগিতা বাধিলেই নিজের রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার এবং নিজেদের রাষ্ট্রীয় স্বত্ব স্বার্থের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের চেষ্টা হইতেই রাষ্ট্রনীতির বা politics'এর জন্ম হয়। এই ভাবেই আমাদের দেশে প্রাচীনকালে সাম, দান, দণ্ড, ভেদের—এই চতুরঙ্গ নীতির প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ক্রমে যখন আমরা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারাইয়া বসিলাম, রাষ্ট্ররক্ষার ও রাষ্ট্র শাসনের ভার অপরের হাতে যাইয়া পড়িল, তখন হইতে আমাদিগের মধ্যে রাষ্ট্রনীতির চর্চ্চাও লোপ পাইল। রাষ্ট্রসেবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া আমাদের রাষ্ট্রের প্রতি মমত্ববুদ্ধিও ক্রমে নষ্ট হইয়া গেল। প্রেম বাড়ে সেবায়। প্রেমপাত্রের সেবা করিবার অধিকার ও অবসর নষ্ট হইলে প্রেমও অনশনে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ-সেবার অবসর সঙ্কীর্ণ হইলে স্বদেশের প্রতি মমত্ববুদ্ধিও ক্ষীণ হইয়া যায়।

এইরূপে আমদিগের মধ্যে বহুদিন হইতে দেশাত্মবোধ একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছিল। মুসলমানের শাসনাধীনে কিয়ৎপরিমাণে আমরা রাষ্ট্রের শাসন সংরক্ষণ কার্য্যে নিজেদের শক্তি সাধ্য প্রয়োগ করিবার অবসর পাইয়াছিলাম। সেই সময়ে আমাদের মধ্যে কতকটা দেশাত্মবোধও ছিল। যাঁহারা মুসলমানের শক্তির প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মধ্যে এই বিরোধের ফলে একটা প্রবল দেশাত্মবোধও জাগিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে ইহা জাগে নাই। ইংরাজ শাসনাধীনে আসিয়া ক্রমে ক্রমে দেশের শাসন সংরক্ষণের দায় হইতে আমরা একেবারে মুক্তি পাইলাম। এই কারণে একদিক দিয়া আমাদের রাষ্ট্রের প্রতি মমত্ববুদ্ধির অনুশীলনের অবসর একেবারেই নষ্ট হইয়া

গেল। এই অবস্থায় ইংরাজ যদি আপনার শাসন সৌকার্য্যার্থে আমাদিগের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা প্রচার না করিত তাহা হইলে যে ভাবে আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রীয় জীবন একটা উদার গণতন্ত্র স্বাধীনতার আদর্শকে ধরিয়া গড়িয়া উঠিতেছে তাহা আদৌ সম্ভব হইত না।

আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা আসে, প্রথমে ইংরাজী সাহিত্য ও য়ুরোপের ইতিহাস হইতে। আমাদের প্রাচীন সাধনাতে পারমার্থিক মুক্তির কথা বিস্তর আছে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা একেবারে নাই বলিলেও চলে।

Rule Britannia, rule the waves
Britons shall never be slaves.

এই জাতীয় কথা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইংরাজী শিক্ষাই আমাদের অন্তরে এই স্বাধীনতার প্রেরণা জাগাইয়া দেয়। ইংরাজকে দেখিয়াই রঙ্গলাল গাহিয়াছিলেন :—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
দাসত্ব শৃঙ্খল কেবা সাধে পরে পায় রে ?

ইংরাজী সাহিত্যের ও ইতিহাসের শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই হেমচন্দ্রের শিঙ্গা গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল,

চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

বঙ্কিম সাহিত্যের স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রনীতির প্রেরণাও ইংরাজী সাহিত্য ও য়ুরোপের ইতিহাস হইতেই প্রথমে আসিয়াছিল।

(৬)

কিন্তু আমাদের প্রথম যুগের স্বাধীনতার বাসনা কল্পনার আশ্রয়েই জাগিয়া উঠে। সত্য স্বাধীনতার বাসনা জাগে তীব্র বন্ধনের বেদনা হইতে। তখনও ইংরাজ শাসনকে আমরা একটা সাংঘাতিক বন্ধন বলিয়া অনুভব করিতে আরম্ভ করি নাই। ইংরাজের সঙ্গে তখনও আমাদের বিরোধটা পাকিয়া উঠে নাই। বরঞ্চ ইংরাজের অধীনে আমরা নানা দিক দিয়া যে পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিলাম, পূর্ব্বে এ দেশের লোকে কোনও দিন সে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পায় নাই, এরূপ ধারণা আমাদের তখন ছিল। রাজার ত কথাই নাই, সমাজও চিরদিন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপরে উদ্যতদণ্ড হইয়া থাকিত। সুতরাং ইংরাজ শাসনাধীনে প্রথম যুগে আমরা যে পরিমাণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সম্ভোগ করিতে পাইয়াছিলাম, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কোনও দিন তাহা পাইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। অতএব তখনও আমাদের সত্য বন্ধন-বেদনা জাগে নাই। সাহিত্যে স্বাধীনতার মহিমা কীর্ত্তন শুনিয়া এবং ইতিহাসে তাহার মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়াই আমরা ইহার জন্য লোভী হইয়া উঠিয়াছিলাম।

বাজ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে
সবাই জাগ্রত এ বিপুল ভবে
সবাই জাগত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!

হেমচন্দ্রের এই উদ্দীপনা বিদেশের সাহিত্য ও ইতিহাস হইতেই আসিয়াছিল। প্রথমযুগের রাষ্ট্রীয় সাধনা এই কল্পিত স্বাধীনতার বাসনায় গড়িয়া উঠে। তখনও আমাদের অন্তরে ইংরাজ বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠে নাই। ইংরাজের সঙ্গে রেষারেষিটা তীব্র হয় নাই। তখনও ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীরা ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর

পিঠে হাত বুলাইতেন। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীও ইংরাজের সাধনা ও চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধালু ছিলেন। আর ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাস পড়িয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বাসনাও তাঁহাদের অন্তরে জাগিয়াছিল। এই স্বাধীনতার আকাঙ্খার অন্তরালে কোনও প্রকারের পরজাতি বিদ্বেষ ছিল না। আমাদের প্রথম যুগের স্বাধীনতার আদর্শ অনেকটা বিশ্বজনীন ছিল। জগৎটা স্বাধীন হউক, জগতের সকল লোকেই মানের গৌরবে বড় হইয়া উঠুক, পৃথিবী স্বাধীনতা এবং সাহচর্য্যের লীলাভূমি হইয়া শক্তিতে, সম্পদে, সুখে, সখ্যে, সর্ব্বোতো-ভাবে স্বর্গের সমকক্ষ হইয়া উঠুক, ধরাধামে স্বর্গরাজ্য আবির্ভূত হউক, ইহাই তখনকার স্বাধীনতার সাধকদিগের প্রাণের বাসনা ছিল। এইজন্য আমাদিগের প্রথমযুগের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আহ্বানে পাশ্চাত্যের ইংরাজের বা অন্য কোনও জাতির প্রতি কোনও প্রকারের বিদ্বেষের ভাব লুকাইয়া থাকে নাই।

তখন আমরা ইংরাজকে কতকটা ভক্তি করিতাম আর অত্যন্ত ভয়ও করিতাম। এইজন্য প্রথমযুগের বাংলা সাহিত্যে ইংরাজ-শাসনের উপরে কোনও তীব্র আক্রমণ দেখা যায় না। অথচ পরাধীনতার প্রতি একটা গভীর বিদ্বেষ জাগাইতে হয়, এইজন্য প্রথম-যুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান শাসনের চিত্র আঁকিয়া স্বদেশ-বাসীদিগের অন্তরে নূতন স্বাধীনতার প্রেরণা জাগাইবার চেষ্টা করা হয়। রঙ্গলাল রাজপুত ইতিহাসের আশ্রয়ে এই কাজটা করেন। হেমচন্দ্র মুসলমান শাসনাধীনে ভারতবর্ষের ইতিহাসেই তাঁর 'ভারত সঙ্গীতে'র ভূমিকা রচনা করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলমান শাসনাধীনে প্রপীড়িত ভারতের কল্পিত হিন্দু বীরের মুখে "গাও ভারতের জয়" এই গাথা স্থাপন করেন। ইঁহারা কেহই খোলাখুলিভাবে ইংরাজশাসনকে আক্রমণ করেন নাই।

আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সাধনার প্রবর্ত্তাবস্থায় অত্যাচারী মুসলমান রাজশক্তিই প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়াছিল।

(৭)

সেকালে আমরা স্বদেশাভিমানের অনুশীলন করিতে যাইয়া এককালে মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর যে বিরোধ ছিল তাহার স্মৃতিকেই আশ্রয় করিয়াছিলাম। মুসলমানকে খাটো দেখিলে আমাদের স্বাজাত্যাভিমান পরিতৃপ্ত হইত। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর উপন্যাসে এই ভাবেই আমাদের স্বাজাত্যাভিমানকে বাড়াইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। হিন্দু মুসলমানের বিরোধের আশ্রয়েই 'দুর্গেশনন্দিনী'র আখ্যায়িকা গড়িয়া উঠে। কতলু খাঁর অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে যাইয়া অসহায়া হিন্দু বিধবা বিমলা তাঁহার বুকে ছুরি মারিয়া সহস্র প্রহরী-বেষ্টিত মুসলমান শিবির হইতে নির্ব্বিঘ্নে সরিয়া পড়িলেন;—এই দৃশ্যে বাঙ্গালী হিন্দু স্বজাতি গৌরবে ভরিয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালী রমণীর এই বীর্য্য, এই নীতিকুশলতা, ধর্ম্মের উপরে ভরসা ও আপনার বুদ্ধি ও বাহুর প্রতি আস্থা দেখিয়া বাঙ্গালীর আত্মমর্য্যাদা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তারপর জগৎসিংহ এবং ওস্‌মান। উভয়েই বীরপুরুষ, উভয়ের মধ্যেই অনেক সদ্‌গুণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র জগৎসিংহকেই বড় করিয়া ধরিয়াছেন। সর্ব্বশেষে আয়েষা এবং তিলোত্তমা—দুইই অপূর্ব্ব সৃষ্টি। কিন্তু তিলোত্তমা হিন্দু মহিলা, আয়েষা যবন দুহিতা। তিলোত্তমাতে হিন্দু নারীত্বের ছবি অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আয়েষাতেও রমণী চরিত্রের মাধুর্য্য এবং শক্তি অল্প ফুটে নাই। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র তিলোত্তমাকেই আয়েষা অপেক্ষা বড় করিয়া তুলুন আর নাই তুলুন বেশী মিষ্টি করিয়া আঁকিয়াছেন। ইহাতে আমাদের নবজাগ্রত স্বাজাত্যাভিমানে নূতন শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল।

যেমন দুর্গেশনন্দিনীতে সেইরূপ কপালকুণ্ডলাতে এবং মৃণালিনীতেও বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু এবং মুসলমানকে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়াছেন, এবং সর্ব্বত্রই হিন্দুর তুলনায় মুসলমানকে খাটো করিয়া আঁকিয়াছেন।

মুসলমানকে খাটো করা বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল না। যাঁহারা বঙ্কিম সাহিত্যের আশ্রয়ে স্বদেশপ্রীতির অনুশীল করিতেন তাঁহাদের অন্তরেও মুসলমানের প্রতি কোন বিদ্বেষ ভাব ছিল না। লেখক এবং পাঠক—উভয় পক্ষই মুসলমান শাসনের বিরোধের স্মৃতি জাগাইয়া বর্ত্তমান কালের স্বাধীনতার সংগ্রামের আয়োজন করিতেছিলেন। সত্য বলিতে কি, ভিতরে ভিতরে এই সকল চিত্রে মুসলমান বলিতে আমরা মুসলমানকে বুঝি নাই, যে স্বাধীনতার পরিপন্থী তাহাকেই বুঝিতাম। মুসলমান এই সকল সাহিত্যে একটা ভাবের প্রতীকমাত্র হইয়াছিলেন। এই কথাটা না বুঝিলে বঙ্কিম-সাহিত্যের রাষ্ট্রনীতির মর্ম্মকথাটা ধরিতে পারা যাইবে না।

(৮)

পূর্ব্বেই কহিয়াছি, অনাত্মার সাক্ষাৎকারেই আত্মার আত্মজ্ঞান জন্মে। আমি যাহা নই, তাহার সম্মুখীন হইয়াই, আমি যে কি ইহা প্রথমে বুঝিতে পারি। অনাত্মার আশ্রয় ব্যতীত আত্মচৈতন্য জাগ্রত হয় না। দেশাত্মবোধ বা সামাজিক আত্মচৈতন্য বা ইংরাজীতে যাহাকে আমরা 'ন্যাশন্যাল্ সেলফ্-কন্শাস্নেশ্' (National self-consciousness) বলিয়া থাকি, তাহার সম্বন্ধেও এই কথাটা খাটে। অন্য সমাজের বা অপর 'নেশনে'র সঙ্গে সংঘর্ষ এবং বিরোধ হইতেই এই দেশাত্মবোধের বা ন্যাশনাল কন্শাস্নেশ-এর জন্ম হয়। এই সংঘর্ষ ও বিরোধ যত তীব্র হয়, সেই পরিমাণে এই দেশাত্মবোধও প্রবল হইয়া উঠে।

বর্ত্তমান যুগের প্রথমে আমাদের এই দেশাত্মবোধ বা ন্যাশন্যাল্ কন্শাস্নেস্ ঠিক বস্তুতন্ত্র ছিল না। কারণ সেই সময়ে ভিন্ন জাতির বা ভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের কোনও প্রত্যক্ষ বিরোধ ভাল করিয়া বাধে নাই। ইংরাজ তখন দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, সত্য; কিন্তু এই ইংরাজকে, অন্ততঃ এই বাংলা দেশে, বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানরাই ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। ইংরাজ শক্রবেশে নহে, মিত্র বেশেই প্রথমে বাংলার শাসনতন্ত্রে প্রবেশ করিয়াছিল। এইজন্য গোড়া হইতেই এই নূতন ইংরাজ-রাজ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর অন্তরে একটা আত্মবুদ্ধি বা মমত্ববুদ্ধি জন্মিয়াছিল। এইজন্য বাঙ্গালী, কি হিন্দু কি মুসলমান, সাধারণভাবে কেহই ১৮৫৭ ইংরাজির সিপাহী যুদ্ধে ইংরাজের বিপক্ষে যান নাই। বিহারে, প্রয়াগে, অযোধ্যায় বা আগ্রা-দিল্লী অঞ্চলে জনসাধারণের অন্তরে ইংরাজ সম্বন্ধে এই আত্মবুদ্ধি ছিল না। সে দেশে ইংরাজ বিজেতা—দেশের লোক বিজিত। সে দেশের লোকে ইংরাজকে ডাকিয়া তাহার ললাটে নিজের হাতে রাজটীকা আঁকিয়া দেন নাই। বিজিতের মর্ম্মঘাতী বেদনা তাঁহাদের প্রাণে জাগিয়া ছিল। এই জন্যই সিপাহী-যুদ্ধের ভেরী বাজিয়া উঠিলে সে অঞ্চলের বহুলোকে সিপাহীদের সঙ্গে গোপনে বা প্রকাশ্যে যোগদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী কেন করে নাই, একথাটা আজি পর্য্যন্ত কেহ ভাল করিয়া বিচার ও আলোচনা করিয়া দেখেন নাই। কেবল বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'আনন্দ-মঠে' এই কথাটা বিশদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার আলোচনা যথাস্থানে করিব। এখানে কেবল এই কথাই বলিতে চাই যে, আমাদের আধুনিক দেশাত্মবোধ বা ন্যাশন্যাল্ সেল্ফ-কন্শাস্নেস্ ইংরাজের সঙ্গে কোনও প্রকারের প্রত্যক্ষ বিরোধকে আশ্রয় করে প্রথমে জাগে নাই।

(৯)

এই আত্মচৈতন্য জাগিয়া উঠে, ইংরাজের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া নহে, কিন্তু ইংরাজের সাহিত্য ও য়ুরোপের ইতিহাস পড়িয়া। আমাদের প্রথম যুগের দেশাত্মবোধ এই কারণে অনেকটা কাল্পনিক ছিল। দাম্পত্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে, যৌবনের প্রথম উন্মেষে, কোনও প্রকারের প্রত্যক্ষ আশ্রয় বা বিষয় ব্যতিরেকেও, অনেক সময় কেবল নাটক উপন্যাস পড়িয়া যুবক যুবতীর অন্তরে একরূপ আদিরসের বা মাধুর্য্যের উন্মাদনা জন্মিয়া থাকে। এই জাতীয় নাটুকে আদিরসের অভিনয়কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "এমন কর্ম্ম আর করব না"—নামক প্রহসনে তীব্র বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। বইখানির নাম এখন কেহ করেন না। আজিকালিকার বাঙ্গালী তার কোন খোঁজ খবর রাখেন না ; কিন্তু 'সেটায়ার' (satire) হিসাবে এখানি বাংলা ভাষার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। আর সেকালের সমাজচিত্র ও নব্যশিক্ষিত যুবকযুবতীদের মনোগতির ছবি হিসাবে এখানি এবং "যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ"—বাংলা সাহিত্যের দুখানি অমূল্য রত্ন। "এমন কর্ম্ম আর করব না"-তে একটা কল্পিত আদিরসের অভিনয়ের অদ্ভুত ছবি অঙ্কিত হইয়াছে। আমাদের প্রথম যুগের দেশাত্মবোধ বা স্বাদেশিকতাও অনেকটা এই নাটুকে ধরণের ছিল। এই জন্যই রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত মুসলমান অধিকারের সময়ে হিন্দু মুসলমানে যে সকল বিরোধ করিয়াছিল, তাহার স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়া, সেই বিরোধের ছবি আঁকিয়া আমাদের নূতন স্বাজাত্যাভিমানকে উদ্বুদ্ধ করিতে বাধ্য হন।

(১০)

ইংরাজ তখন দেশের রাজা হইয়া বসিয়াছে বটে, কিন্তু এই নূতন

রাজশক্তির সঙ্গে দেশের লোকের তখনও তেমন বিরোধ বাধে নাই। ইহার প্রধান কারণ—ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন। এই বাংলা দেশে তখন যাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থলে ছিলেন, যাঁহারা দেশের চিন্তা, ভাব ও কর্ম্মকে পরিচালিত করিতেছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই স্বল্পবিস্তর এই নূতন শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎভাবে যাঁহারা ইংরাজি পড়েন নাই, তাঁহারাও পরোক্ষভাবে ইহার প্রেরণা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিলেন। কহিয়াছি যে, বাঙ্গালী চিরদিনই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষপাতী। জীমূতবাহনের সময় হইতেই বাঙ্গালী চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমান অধিকারে বাঙ্গালীর এই চিরন্তন সাধনার উপরে আঘাত পড়িয়াছিল। কিন্তু এ আঘাতও বাঙ্গালী সহিয়াছিল। সমাজের চারিদিকে লক্ষ্মণের গণ্ডী আঁকিয়া সে তার নিজের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ইহাও অসাধ্য না হউক, দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। মুসলমান এই গণ্ডীও ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জোর করিয়া দলে দলে লোককে মুসলমান করিতে আরম্ভ করিল। তাহারই ফলে আজ বাংলা দেশের এগারআনা লোক মুসলমান-সমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ মুসলমানের শক্তি যখন কমিতে আরম্ভ করিল, মুসলমান যখন প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া উঠিল, প্রবলেরা দুর্ব্বলদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল, চারিদিকে অরাজকতা জাগিয়া উঠিল, সমাজগ্রন্থি এই ভীষণ অরাজকতার মুখে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল, তখন বাঙ্গালীর বহুকালের সাধের ও সাধনার ধন এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করা একেবারেই অসাধ্য হইয়া পড়িল। আর তখনই বাঙ্গালী এই অরাজকতা হইতে আত্ম-রক্ষার লোভে, ইংরাজকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিল। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের

আধুনিক বাংলার ইতিহাসের বিশিষ্ট ব্যাখ্যা। তাঁর সকল উপন্যাসে, বিশেষতঃ আনন্দ-মঠে, সীতারামে ও দেবী-চৌধুরাণীতে নানা দিক দিয়া এই কথাটা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

(১১)

ইংরাজ দেশের শাসনদণ্ড লইয়া সর্ব্বপ্রথমেই শান্তি স্থাপন করিল। আইন-আদালতের প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজকে পশুশক্তির উৎপীড়ন হইতে মুক্ত করিল। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্ব্বিবাদে, আপনার ইচ্ছামত, স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার পথ খোলসা করিয়া দিল। ইহার ফলে দেশের জনসাধারণে অভয় লাভ করিয়া, প্রাণ খুলিয়া "কোম্পানী বাহাদুরের" জয় ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিল। দেশের জনসাধারণের এরূপ মনোভাব পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একদিকে ইংরাজি শিক্ষা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল, অন্যদিকে ইংরাজের শাসন জনসাধারণের চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল। এ অবস্থায় ইংরাজকে প্রতিপক্ষরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশের নূতন দেশাত্মবোধের সাধন করা তখন সম্ভব ছিল না।

যাঁহারা ইংরাজি শিখিয়াছিলেন, তাঁহারা ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পাদির অনুশীলন করিয়া, ইংরাজের সভ্যতার ও সাধনার আদর্শকে নিজেদের অন্তরে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই আদর্শকে দেশের মধ্যে গড়িয়া তোলাই তাঁহাদের স্বাদেশিকতার সাধ্য হইয়াছিল। সুতরাং ইংরাজ-চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবশত ইংরাজের সভ্যতা ও সাধনার প্রতি অনুরাগবশত, বাঙ্গালী সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে ইংরাজকে যথাসাধ্য

বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার উচ্ছেদ সাধনের প্রচেষ্টার সমর্থন করে নাই।

বঙ্কিমযুগেও ইংরাজের সঙ্গে আমাদের বিরোধটা ভাল করিয়া বাধে নাই। একটু আধটু সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে মাত্র, সংগ্রামের ভেরী তখনও বাজিয়া উঠে নাই। ইংরাজের শাসনও তখন পর্য্যন্ত কঠোর ও পরুষ ভাব ধারণ করে নাই। ইংরাজ রাজপুরুষদিগের মধ্যে স্বজাতি-পক্ষপাতিত্ব দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র, কিন্তু একেবারে ফুটিয়া উঠে নাই। সাধারণ ভাবে ইংরাজের শাসন তখনও আমাদের চিন্তার বা কর্ম্মের স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করে নাই। সুতরাং ইংরাজকে প্রতিপক্ষ করিয়া সে সময়ে আমাদের দেশাত্মবোধ বা নাশন্যাল্ কনশাস্‌নেস্ জাগান সম্ভব ছিল না, বলিলেও চলে। অথচ অনাত্মার সম্মুখীন না হইলে আত্ম-চৈতন্য জাগে না। জাতির সমষ্টিগত আত্ম-চৈতন্যকে জাগ্রত করিতে হইলে একটা পরজাতিকে প্রতিপক্ষরূপে জাতির সম্মুখে দাঁড় করান আবশ্যক ছিল। নায়ক-নায়িকার প্রেম ফুটাইবার জন্য যেমন কাব্যে ও নাটকে একজন প্রতি-নায়ক বা প্রতি-নায়িকার সৃষ্টি করিতে হয়, সেইরূপ স্বজাতি-বাৎসল্যকে জাগাইতে হইলে, একটা প্রতিদ্বন্দ্বী পরজাতির শক্তির সঙ্গে বিরোধের ধ্যান ও অনুশীলন করা আবশ্যক হয়। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চেই কোন জাতির বা নেশনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির বা নেশনের সাক্ষাৎকার, সংঘর্ষ ও বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে। আমাদের তখনকার ইতিহাসে ইংরাজের সঙ্গে এরূপ কোনও বিরোধ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে নাই। ফলতঃ আমাদের নূতন স্বাদেশিকতার প্রেরণা আসে, ইংরাজের সাহিত্যের ও য়ুরোপের ইতিহাসের আলোচনা হইতে। ইহার ভিতরে ভাবুকতাই প্রবল ছিল, বস্তুতন্ত্রতা ছিল না বলিলেও হয়। সুতরাং এই সাহিত্যিক ও কাল্পনিক

স্বাদেশিকতার অনুশীলনের জন্য, আমাদিগকে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। এই কারণেই তখন মুসলমান অধিকারের ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে এই নূতন স্বাদেশিকতার আশ্রয় ও উদ্দীপনা সংগ্রহ করিয়া, সেকালে দেশে হিন্দু মুসলমানে যে বিরোধ ও প্রতি-যোগিতা ছিল, তাহারই ছবি আঁকিয়া আমাদিগকে এই দেশপ্রীতির অনুশীলন করিতে হইয়াছিল। এই কথাটা মনে রাখিয়াই বঙ্কিম-সাহিত্যের স্বাদেশিকতার ও রাষ্ট্রনীতির আদর্শের আলোচনা করিতে হইবে। এই কথাটা ভুলিয়া গেলে, বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি যে কি ছিল, ইহার সন্ধান পাওয়া অসাধ্য হইবে।

(১২)

পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজের সঙ্গে আমাদের বিরোধটা পাকিয়া উঠে নাই। ব্যক্তিগত ভাবে, ইংরাজ বিশেষের, অথবা এদেশের প্রবাসী ইংরাজ সমাজের অংশ বিশেষের সঙ্গে রেষারেষি বাধিতেছিল বটে ; কিন্তু ইহাতে সমগ্র ইংরাজ জাতির প্রতি আমাদের অন্তরে কোন প্রকারের তীব্র বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় নাই। ইংরাজ তখনও আমাদের বাংলাদেশের নব্যশিক্ষিত সমাজের দীক্ষাগুরু ও শিক্ষা-গুরু হইয়াই ছিলেন। আর তখন ইংরাজিনবীশ বাঙ্গালীদের মধ্যেই নূতন দেশপ্রীতির ভাব আবদ্ধ ছিল, জনসাধারণের মধ্যে তাহা সংক্রামিত হইয়া পড়ে নাই। তাঁহারা তখনও দেশের ডাক শোনেন নাই। দেশ-প্রীতি যে কি অপূর্ব্ব উন্মাদকারিণী বস্তু, এ জ্ঞান তখনও তাঁহাদের জন্মে নাই, তখন ইহার সংবাদ পর্য্যন্ত তাঁহাদের নিকট পৌঁছায় নাই। দেশের জনসাধারণের সুখ স্বার্থ, ভাবনা এবং কর্ম্ম লোকের ব্যক্তিগত, পারিবারিক কিম্বা সামাজিক জীবনের গণ্ডী ছাড়াইয়া যায় নাই। ইংরাজিনবীশেরাই ইংরাজি পড়িয়া, ইংরাজের নিকট হইতে এই নূতন

দেশপ্রীতির দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তখন বাস্তবিকই ইংরাজের জাতীয় চরিত্রের ও য়ুরোপীয় সাধনা ও সভ্যতার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধালু ও অনুরক্ত ছিলেন। এই কারণে সেকালে ইংরাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা জাগাইয়া স্বদেশপ্রীতির উদ্দীপনা করা সম্ভব ছিল না। অথচ পরজাতির প্রতিপক্ষতার আশ্রয় ব্যতিরেকে স্বজাতি প্রেমের উদ্দীপনা ও অনুশীলনও সম্ভব নহে। এই জন্যই আমাদের প্রথম যুগের দেশচর্য্যার আচার্য্যেরা মুসলমান অধিকারের ভারতবর্ষের ইতিহাসের কথা তুলিয়া, মুসলমানকে এই স্বদেশপ্রীতির সাধনে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড় করাইয়া, এই নূতন স্বদেশপ্রেমকে জাগাইতে চেষ্টা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রকেও তাহাই করিতে হয়। কিন্তু ইহার অন্তরালে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে কোনও মুসলমান বিদ্বেষ ছিল না, পূর্ব্বেই একথা কহিয়াছি।

(১৩)

আর ছিল না এই জন্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি হীন ও হেয় পলিটিক্স্ ছিল না। পরজাতি-বিদ্বেষের উপরে তাঁহার স্বজাতিপ্রেমের আদর্শ গড়িয়া উঠে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রীতি তাঁহার ঈশ্বর-ভক্তির অন্তর্গত ছিল। তাঁহার দেশ-সেবা ধর্ম্মের একটা মুখ্য অঙ্গ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যে ধর্ম্মের সাধনা ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে তিনি অনুশীলন ধর্ম্ম কহিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই, কারণ তিনি দেখিয়াছিলেন যে, হিন্দুধর্ম্মেতে এই উদার ও বিশ্বজনীন অনুশীলন ধর্ম্ম যতটা পরিমাণে ফুটিয়া উঠিয়াছে, জগতের আর কোনও ধর্ম্মে ততটা ফুটিয়া উঠে নাই। মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও রঞ্জিনী-বৃত্তি-সম্পর্কিত যে সকল শক্তি ও করণ বা যন্ত্র আছে, তৎসমুদায়ের

যথাযোগ্য পরিস্ফূর্ত্তি দ্বারাই এই অনুশীলন-ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভ হয়। এ সকল মানবীয় বৃত্তির প্রায় সকলগুলিই মনুষ্য সমাজের বিবিধ সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে। এ সকলের যথাযোগ্য অনুশীলন, বিকাশ এবং সার্থকতা সম্পাদন সমাজ-সাপেক্ষ। এই অনুশীলন ধর্ম্ম প্রচলিত অর্থে সন্ন্যাস ধর্ম্ম নহে। সন্ন্যাসী পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের দায় এড়াইয়া, নিঃসঙ্গভাবে জীবন যাপন করিতে যাইয়া, নিজের ঈশ্বর-দত্ত বৃত্তিগুলিকে অনেক সময় চাপিয়া মারেন। বঙ্কিমচন্দ্র কহিয়াছেন ঃ—"যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহাদের নিকটে অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি অতিশয় ঘৃণিত। তাঁহারা স্ত্রীমাত্রকেই পিশাচী মনে করেন। আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি, অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি সমুচিত মাত্রায় পরম ধর্ম্ম। এই পারিবারিক প্রীতি জাগতিক প্রীতিতে আরোহণ করিতে পারে না।"

আর মানুষ প্রীতির অনুশীলনে একেবারে পারিবারিক প্রীতি হইতে জাগতিক প্রীতিতে যাইতেও পারে না। প্রীতির অভিব্যক্তি ও সম্প্রসারণের একটা ক্রম আছে। প্রথমে আত্মপ্রীতি, তারপর আত্মপ্রীতির সম্যক চরিতার্থতার জন্যই অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি—কিন্তু ইহা ভিন্ন স্বজনপ্রীতির ভিতরে আরও কিছু আছে। যাহারা অপত্যস্থানীয়, অপত্যপ্রীতি নিজের সন্তানকে ছাড়াইয়া তাহাদিগকেও আশ্রয় করিয়া থাকে। এইরূপ প্রীতির সম্প্রসারণ হইতে থাকিলে, কুটুম্বাদি ও প্রতিবাসিগণ প্রীতির পাত্র হয়েন। তারপর প্রীতির সীমা আরও বিস্তৃত হইয়া স্বদেশবাসিদিগকে অধিকার করে। এইরূপে স্বদেশকে অধিকার করিয়া সমুদায় মানবমণ্ডলীতে যাইয়া প্রীতি অর্পিত হয়। ইহাই প্রীতির স্বাভাবিক অভিব্যক্তির ক্রম। এই ক্রম অনুসারেই প্রীতি স্ফূরিত হইয়া আপনার চরম ও পরম সার্থকতালাভ করে। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্ম্মে প্রীতির

প্রতিষ্ঠা। এই জন্যই স্বদেশপ্রীতি বিশ্বপ্রীতির অনুশীলনের সোপানরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ হইয়াছিল। "অনুশীলন" গ্রন্থে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই স্বদেশপ্রীতি-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(১৪)

মানুষের যাবতীয় বৃত্তির যথাযোগ্য বিকাশ-সাধনের নামই অনুশীলন। ইহাই সত্য মানব-ধর্ম্ম। এই সকল বৃত্তির অনুশীলন সমাজ-সাপেক্ষ।

"সমাজের বাহিরে মনুষ্যের কেবল পশুজীবন আছে মাত্র, সমাজের ভিতরে ভিন্ন মনুষ্যের ধর্ম্মজীবন নাই। সমাজের ভিতরে ভিন্ন, কোন প্রকারের মঙ্গল নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমাজ-ধ্বংসে মনুষ্যের ধর্ম্ম ধ্বংস এবং সমস্ত মনুষ্যের সকল প্রকার মঙ্গল ধ্বংস। যদি তাহাই হইল, তবে সব রাখিয়া আগে সমাজরক্ষা করিতে হয়। অর্থাৎ আত্মরক্ষার অপেক্ষাও দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং এই জন্যই সহস্র সহস্র ব্যক্তি আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও দেশরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। যে কারণে আত্মরক্ষার অপেক্ষা দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সেই কারণেই স্বজনরক্ষার অপেক্ষাও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। কেন না, তোমার পরিবারবর্গ সমাজের সামান্য অংশ মাত্র, সমুদায়ের জন্য অংশ-মাত্রকে পরিত্যাগ বিধেয়।"

"সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি যাদৃশ অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, আত্মরক্ষা, স্বজন রক্ষা এবং দেশরক্ষা আমার তাদৃশ অনুষ্ঠেয় কর্ম। উভয়েরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যখন উভয়ে পরস্পর বিরোধী হইবে, তখন কোন্ দিক্ গুরু তাহাই দেখিব। আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, দেশরক্ষা—জগৎ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়, অতএব সেইদিক অবলম্বনীয়।"

"কিন্তু বস্তুতঃ জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি বা স্বজনপ্রীতি বা দেশপ্রীতির কোন বিরোধ নাই। যে আক্রমণকারী, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব, কিন্তু তার প্রতি প্রীতিশূন্য কেন হইব? জাগতিক প্রীতি এবং সর্ব্বত্র সমদর্শনের এমন তাৎপর্য্য নহে যে, পড়িয়া মার খাইতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—যখন সকলেই আমার তুল্য, তখন আমি কখন কাহার অনিষ্ট করিব না। কোন মনুষ্যেরও করিব না এবং কোন সমাজেরও করিব না। আপনার সমাজের যেমন সাধ্যানুসারে ইষ্ট সাধন করিব, সাধ্যানুসারে পর সমাজেরও তেমন ইষ্ট সাধন করিব। সাধ্যানুসারে, কেন না কোন সমাজের অনিষ্ট করিয়া অন্য কোন সমাজের ইষ্ট সাধন করিব না। পর সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া আমার সমাজের ইষ্ট সাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া কাহাকেও আপনার সমাজের ইষ্ট সাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশ-প্রীতির সামঞ্জস্য।"

বঙ্কিমচন্দ্র কহিয়াছেন যে তাঁহার এই দেশপ্রীতি 'ইউরোপীয় Patriotism নহে।" ইউরোপ যাহাকে দেশপ্রীতি বলিয়া সাধন করিতেছে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের মতে "একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ।" কারণ,—

"ইউরোপীয় Patriotism ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পর সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতি সকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর যেন ভারতবর্ষের কপালে এরূপ দেশ-বাৎসল্য ধর্ম্ম না লিখেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রীতি ঈশ্বরভক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। আত্মরক্ষা

ধর্ম্ম, কেননা এই দেহ-মন-প্রাণ-আত্মা ঈশ্বরের সৃষ্টি, ঈশ্বরের দান; তাঁহাকে প্রীতি করিবার ও তাঁহার জগতের সেবা করিবার উপকরণ ও সহায়। স্বজনরক্ষা ধর্ম্ম, কারণ স্বজনবর্গের শক্তি, সাহায্য ও সাহচর্য্যের উপরে আমার নিজের রক্ষা ও নিজের ঈশ্বরদত্ত শক্তি ও বৃত্তিসকলের অনুশীলন ও সার্থকতা লাভ নির্ভর করে। স্বদেশ-রক্ষা ধর্ম্ম, কেননা ইহা সমস্ত জগতের হিতের উপায়।

"পরস্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বা অধঃপতিত হইয়া কেবল পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত হইলে, পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। এইজন্য সর্ব্বভূতের হিতের জন্য সকলেরই স্বদেশরক্ষণ কর্ত্তব্য।"

(১৫)

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি ঈশ্বর-ভক্তির অঙ্গ ছিল। ভক্তি বলিতে তিনি মানুষের সমুদয় বৃত্তির ঈশ্বরাভিমুখতা বুঝিতেন। "মানুষের সকল বৃত্তিগুলি অনুশীলিত হইয়া যখন ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হইবে, মনের সেই অবস্থাই ভক্তি।" এই ভক্তির ফল জাগতিক প্রীতি, কেননা ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। এই জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্ম-প্রীতি, স্বজন-প্রীতি এবং স্বদেশ-প্রীতির প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীনেরা এই সত্যটা ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই। ইহাই ভারতবর্ষীয়দিগের সামাজিক ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অবনতির কারণ।

"ভারতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ব্বলোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতি এই সার্ব্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতি-বৃত্তির সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন নহে। দেশ-প্রীতি ও সার্ব্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর

সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিবে।”

এই উদার ও বিশ্বজনীন স্বদেশ-প্রীতির আদর্শের উপরেই বঙ্কিম-চন্দ্রের রাষ্ট্রনীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই জন্যই বঙ্কিম-সাহিত্যের রাষ্ট্রনীতি একটা সমন্বয়ের পথ ধরিয়া চলিয়াছিল।

(১৬)

রামমোহনের মত বঙ্কিমচন্দ্রও জীবনের সকল বিভাগে একটা সমন্বয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় ইহা বিশেষভাবে দেখিয়াছি। বঙ্কিম সাহিত্যের রাষ্ট্রনীতিও এই সমন্বয় প্রতিষ্ঠারই চেষ্টা করিয়াছে। বিরোধ থাকিলেই সমন্বয় করিতে হয়। ধর্ম্মেতে এবং সমাজে আমাদিগের বর্ত্তমান যুগে প্রাচীনে এবং নবীনে একটা তীব্র বিরোধ বাধিয়া উঠিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অনুশীলন-ধর্ম্মে, ভগবদ্‌গীতার ব্যাখ্যাতে এবং কৃষ্ণ-চরিত্রে এই বিরোধের একটা সমীচীন মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রাচীনের প্রতি অনুরাগ বশতঃ নবীনকে বর্জ্জন করিতে চাহেন নাই। আবার নবীনের লালসায় প্রাচীনকেও উপেক্ষা করেন নাই। কিন্তু প্রাচীনের সনাতন সত্য এবং সাধনার উপরে নবীনের প্রেরণাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উভয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় গড়িয়া তুলেন। সমন্বয়ের একটা সময় এবং অবস্থা আছে। কোন বিরোধ পাকিয়া না উঠিলে সমন্বয়ের সময় উপস্থিত হয় না। দূরদর্শী মনীষীরা প্রয়োজন হইলে পরিণামে এই সমন্বয় প্রতিষ্ঠার জন্যই, আদিতে বিরোধটা পাকাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। বিরোধ যত পাকিয়া উঠে, ততই সমন্বয়ের প্রয়োজন এবং অবসর উপস্থিত হয়। বাংলার বর্ত্তমান যুগে বঙ্কিম-চন্দ্রের পূর্ব্বেই ধর্ম্মে ও সমাজে প্রাচীনের এবং নবীনের মধ্যে বিরোধটা খুবই পাকিয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রকে বিরোধ

পাকাইতে হয় নাই। তবে তাঁহার প্রথম জীবনে নবীন সমাজ সংস্কারের দলই অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি অল্প লোকেই সেকালে প্রাচীনের পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বয়সে কোন কোন দিক দিয়া এই দুর্বল পক্ষেরই ওকালতী গ্রহণ করিয়া প্রবল দলকে একটুকু সংযত ও আত্মস্থ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু হিন্দু পুনরুত্থানকারী দল যখন প্রবল হইয়া উঠিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারিলেন না। একদিকে যেমন ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বল্প-বিস্তর বিরোধ বাধিয়াছিল, সেইরূপ অন্যদিকে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নূতন হিন্দু আন্দোলনের সঙ্গেও কোন কোন দিক দিয়া তাঁহার বিরোধ বাধিয়া উঠিল। তিনি এই দুই দলের কাহারো সঙ্গে মিলিতে পারিলেন না; কিন্তু উভয় দল হইতে পৃথক থাকিয়া ইহাদের পরস্পরের বিরোধের মীমাংসা করিবার চেষ্টাতেই "প্রচারে" তাহার গীতাভাষ্যের ও অনুশীলন-ধর্ম্মের আলোচনা আরম্ভ করেন।

(১৭)

যেমন ধর্ম্মে ও সমাজে, সেইরূপ রাষ্ট্রনীতিতে বঙ্কিমচন্দ্র একটা সমন্বয়ের সন্ধানেই গিয়াছিলেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে, তাঁহার প্রথম জীবনে, আমাদের মধ্যে স্বদেশ-প্রীতি ভাল করিয়া জাগে নাই। এই জন্য সর্ব্বপ্রথমে তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আমাদের ও ইংরাজের মধ্যে যে বিরোধটা অল্পে অল্পে বাধিতেছিল, পাকেপ্রকারে তাহাকেই পাকাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। প্রচ্ছন্নভাবে এবং কখনও কখনও প্রকাশ্যেও "বঙ্গদর্শন" আমাদের এই নূতন স্বদেশ-প্রীতিকে বিশেষভাবে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম যুগের উপন্যাস মুসলমান

ইতিহাসের আশ্রয়ে আমাদিগের মধ্যে স্বজাতি-প্রেম ও সঙ্গে সঙ্গে পরজাতি বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলে। "চন্দ্রশেখরে" এবং "আনন্দমঠে" সেকালের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্তরের ইংরাজ বিদ্বেষকে প্রকাশ্য ভাবে ফুটাইয়া তুলে। এইরূপে আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র সমন্বয়ের ভূমি গড়িবার পূর্ব্বে ইংরাজের সঙ্গে আমাদের বিরোধটা খুব ভাল করিয়া পাকাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় এ বিরোধটা কিন্তু পাকিয়া উঠে নাই। পাকিয়া উঠে তাঁহার স্বর্গারোহণের দশ বার বৎসর পরে, স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র কোন পথে এই সাংঘাতিক বিরোধের সমন্বয়ের সম্ভাবনা আছে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

(১৮)

দেখিয়াছি যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রীতি তাঁহার ধর্ম্মের অঙ্গ ছিল। ফরাসী বিপ্লবের পরে য়ুরোপে যে গণতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শ ফুটিয়া উঠে, বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বান্তকরণে তাহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই আদর্শ সার্ব্বজনীন। য়ুরোপে ফরাসী-বিপ্লব যে সাম্যের সন্ধানে গিয়াছিল, আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কালে ভগবান বুদ্ধদেব সেই আদর্শেরই প্রতিষ্ঠা করিতে চহিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার "সাম্য" শীর্ষক প্রবন্ধে এই সার্ব্বজনীন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শই প্রচার করিয়াছিলেন। সময়োচিত হয় নাই বলিয়া তিনি এই প্রবন্ধটিকে পরে তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে ছাঁটিয়া দিয়াছিলেন। আজিকার বাঙ্গালী পাঠকেরা ইহার কথা জানেন না। কিন্তু আধুনিক সমাজতত্ত্বের দিক দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক আদর্শ কি ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহার এই মহামূল্য প্রবন্ধটি আবার

প্রচারিত হইলে মন্দ হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যবাদ মৈত্রীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। ফরাসী বিপ্লবের অধিনায়কেরা সাম্যের আদর্শটাই ভাল করিয়া ধরিয়াছিলেন, যদিও তাঁহারা equality (সাম্য) এবং liberty (স্বাধীনতার) সঙ্গে fraternity (ভ্রাতৃত্ব) জুড়িয়া দিয়াছিলেন, এই সাম্য ও স্বাধীনতার সঙ্গে fraternity বা ভ্রাতৃত্বের কোনও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। কেবল নিরঙ্কুশ সাম্য ও স্বাধীনতার আস্ফালনে সমাজবন্ধন টিকিয়া থাকিতে পারে না দেখিয়া ইহাদের সঙ্গে এই ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধ সাধনের মৈত্রী ঠিক এই fraternity বা ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল না। সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টির উপরে মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা। উপনিষদ কহিয়াছেন যে আপনার অন্তর্নিহিত আত্মবস্তুকে অন্য সকল জীবের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে, সে কখনো কাহাকেও অবজ্ঞা করিতে পারে না। এই যে আপনার আত্মবস্তুকে সকল মানুষের মধ্যে দেখা, ইহাই আমাদের দেশের মৈত্রীর বনিয়াদ। য়ুরোপ এ তত্ত্বের সন্ধান পায় নাই। সুতরাং য়ুরোপের সাম্যবাদ এবং স্বাধীনতার আদর্শ কেবল বিরোধই জাগাইয়া তুলিয়াছিল, এখনও বিরোধকেই জাগাইয়া রাখিয়াছে। স্বাধীনতার সঙ্গে মৈত্রীর, সাম্যের সঙ্গে আত্মসংযমের সমন্বয় সাধন করিতে পারে নাই। য়ুরোপে এইজন্য এই জটিল সমাজ সমস্যার মীমাংসার পথ এখনও পরিষ্কার হয় নাই। চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমরাও এদেশে য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সাধনার প্রেরণায় সাম্য ও স্বাধীনতার সন্ধানে এই বিরোধের পথেই চলিয়াছিলাম। তারই জন্য মনে হয় কি জানি তাঁর 'সাম্য' শীর্ষক প্রবন্ধে এই সাংঘাতিক সাম্য ও স্বাধীনতার একদেশদর্শী আদর্শে শক্তি সঞ্চার করিয়া আমাদিগকে য়ুরোপ যে সর্ব্বনাশের পথে ছুটিয়াছে সেই পথেই

চালাইয়া লইয়া যায়, এই আশঙ্কাতেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "সাম্য" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রচার বন্ধ করিয়া দেন, এবং গীতোক্ত কর্ম্মযোগের পথে ভারতের আধুনিক সাধনাকে প্রবর্ত্তিত করিয়া ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বা বিশ্বাত্মৈকত্বের অনুভূতির উপরে সাম্য এবং স্বাধীনতার সঙ্গে বিশ্বজনীন মৈত্রীর সত্য সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। এই বিশ্বজনীন মৈত্রীর উপরেই বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় বিরোধেরও সমন্বয় করিতে চাহিয়াছেন।

(১৯)

কহিয়াছি যে বিরোধ যতক্ষণ পাকিয়া না উঠে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ধি বা সমন্বয়ের কথা ভাল করিতে উঠিতে পারে না। "আনন্দমঠে" বঙ্কিমচন্দ্র এই বিরোধটা প্রথমে পাকাইয়া তুলেন। পরজাতির অত্যাচার-পীড়িত না হইলে কোথাও স্বজাতি বাৎসল্য ভাল করিয়া জাগিয়া উঠে না। এইজন্য "আনন্দমঠের" প্রথম দিকে তিনি সেকালের প্রজার উপরে কি নির্ম্মম অত্যাচার হইতেছিল তাহার ছবি ফুটাইয়া তুলিলেন। মানুষ অনেক অত্যাচার সহিয়া যায়। তাহার মান-সম্ভ্রম, ভোগ বিলাস, এসকলের উপর আক্রমণ পর্য্যন্ত সে নীরবে সহ্য করিয়া চলে। কিন্তু এসকলের উপর যখন অত্যাচারীর কর্ম্মফলে তাহার জীবনের শেষ অবলম্বন মুষ্টি অন্ন পর্য্যন্ত আর মেলে না, তখনই মানুষ মরিয়া হইয়া বহুকালের অভ্যস্ত অত্যাচারের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়। জগতের সর্ববত্র এইভাবেই রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা হইয়াছে। "আনন্দমঠের" প্রথম দৃশ্যপটে বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাটাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। চারিদিকে দুর্ভিক্ষের হাহাকারের মাঝখানেই মাতৃপূজার শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছিল। স্বারাজ্য ব্যতীত মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক কোন কল্যাণই যে সম্ভব নহে, ইহাই

"আনন্দমঠের" প্রথম কথা, ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে শরীরের প্রয়োজন। শরীরের স্বাস্থ্য এবং শক্তির উপরে ধর্ম্মসাধনের যোগ্যতা নির্ভর করে। মানুষ যদি দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে না পায়, তাহার সাধন ভজন সম্ভব হয় না। আর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপরেই প্রকৃতি-পুঞ্জের অন্ন-সংস্থানের সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। রাজা যদি প্রজার সর্ব্বস্ব শোষণ করিয়া লয়, তাহা হইলে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াও প্রজা কিছুতে আপনার যথোপযুক্ত অন্নসংস্থান করিতে পারে না। "আনন্দমঠের" এই দৃশ্যে এই সত্যটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বদেশের এই দুর্গতির বেদনা যাঁহাদের কোমল প্রাণে প্রথমে বাজিয়া উঠে, তাঁহারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া স্বদেশের উদ্ধার কার্য্যে আপনাদের জীবন উৎসর্গ করেন। স্বদেশই তখন তাঁহাদের একমাত্র শ্রেয় ও প্রেয় হইয়া উঠে। এই স্বদেশ-প্রীতির প্রেরণাতেই "আনন্দমঠের" সন্তান দলের প্রতিষ্ঠা হয়। আর ইঁহারা এই দেশভক্তির প্রেরণায় ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার পর্য্যন্ত পরিহার করিয়া দেশবাসীর উদ্ধার কার্য্যে নিযুক্ত হন। কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিব, এই নীতির অনুসরণ করিয়া 'সন্তানেরা' রাজার দস্যুবৃত্তি নিবারণের জন্য নিজেরা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেন। ইহাতে তাঁহাদের কোন স্বার্থাভিসন্ধি ছিল না। ইঁহারা প্রজার ধন অপহরণ করিতেন না। প্রজার যে অর্থ শোষণ করিয়া রাজা আপনার উদরস্থ করিতে চাহিত তাহাই লুঠিয়া আনিয়া একদিকে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের এবং অন্যদিকে দুঃস্থ প্রজার দুঃখ নিবারণের জন্য ব্যয় করিতেন। এইভাবেই "আনন্দমঠে" একটা প্রজা-বিদ্রোহের ছবি ফুটিয়া উঠে। ইহার ভিতর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র রাজা-প্রজার বিরোধটা পাকাইয়া তুলেন। আর পাকাইয়া তুলেন এই জন্য যে এই বিরোধটা না পাকিয়া উঠিলে সন্ধি বা সমন্বয়ের কথা উঠিতে পারে না।

(২০)

বিরোধ কেবল পাকিয়া উঠিলেই চলে না। এই বিরোধে প্রজাপক্ষ যতক্ষণ জয়লাভ না করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ধির প্রস্তাব উঠিতে পারে না। "আনন্দমঠে" সন্তানেরা যখন শেষ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন বাংলার মুসলমান প্রভুশক্তি যখন নিঃশেষে বিলোপ পাইল, তখন সন্তান সম্প্রদায়ের গুরু ও প্রতিষ্ঠাতা তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে বলিয়া দলটা ভাঙিয়া দিলেন। সন্তানেরা কেবল অত্যাচারী রাজশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্যই উঠিয়াছিলেন। এই অত্যাচার নিবারণের জন্য যে শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজন কেবল তাহাই তাঁহারা পাইয়াছিলেন; কিন্তু যথাযোগ্যভাবে রাষ্ট্রশাসনের অধিকার এবং শিক্ষা তাঁহারা লাভ করেন নাই। অধর্ম্মের বিনাশ পর্য্যন্তই তাঁহাদের অধিকার ছিল। ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার সাধন তাঁহাদের হয় নাই। যাঁহারা অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন প্রায় কুত্রাপি তাঁহারা এই সংগ্রামের অবসানে সত্য গণতন্ত্র শাসনের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না। লড়াইয়ের একটা মোহ আছে। সংগ্রামে আত্ম-প্রতিষ্ঠার ফলে বিজয়ী সেনানীর অন্তরে পশুশক্তির উপরে একান্ত নির্ভর জন্মিয়া যায়। প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে গেলে স্বপক্ষের সেনামণ্ডলীর উপরে কঠোর শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। এ অবস্থায় সত্য স্বাধীনতার ভূমি কিছুতেই গড়িয়া উঠিতে পারে না। এইজন্য রাষ্ট্রবিপ্লব বা বিদ্রোহের সফলতাতে প্রজাস্বত্বের প্রতিষ্ঠা হয় না, কিন্তু এক স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজশক্তির উচ্ছেদ করিয়া তাহার আসনে আর একটা নূতন স্বেচ্ছাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা এই সত্যটাকে ভাল করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। তারই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র

কহিয়াছেন (কোথায় ঠিক মনে পড়িতেছে না) যে বিদ্রোহ আত্মঘাতী। "আনন্দ-মঠের" শেষ অঙ্কে তিনি এই সত্যটাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সত্যানন্দ সন্তানদলের নায়ক ছিলেন। যখন যেমন দুই খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের সংঘর্ষে ক্ষুদ্র মক্ষিকা নিষ্পেষিত হইয়া যায়, তেমনই দুই সন্তান-সেনার সংযোগে বিশাল ইংরাজসৈন্য নিষ্পেষিত হইল— "ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায় এমন লোক রহিল না" —তখনই সত্যানন্দের উপর আদেশ হইল, সন্তান দল ভাঙ্গিয়া দাও। সত্যানন্দ কহিলেন—আমার এক সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আমি যে মুহূর্ত্তে জয় করিয়া সনাতন ধর্ম্ম নিষ্কণ্টক করিলাম, সেই সময়েই আমার প্রতি এই প্রত্যাখ্যানের আদেশ হইল কেন?

যিনি আসিয়াছিলেন তিনি বলিলেন—তোমার কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে। আর এখন তোমার কোন কার্য্য নাই। অনর্থক প্রাণীহত্যার প্রয়োজন নাই।

সত্যানন্দ—মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয় নাই। এখনও কলিকাতায় ইংরাজ প্রবল।

তিনি—হিন্দুরাজ্য এখনও স্থাপিত হইবে না। তুমি থাকিলে এখন অনর্থক নরহত্যা হইবে, অতএব চল। ......সত্যানন্দ তীব্র মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইয়া মাতৃরূপা জন্মভূমির প্রতিমার দিকে ফিরিয়া জোড়হস্তে বাষ্পনিরুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হায় মা, তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না। আবার তুমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়িবে। হায় মা, কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না?"

তিনি বলিলেন—সত্যানন্দ কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণ জয় করিয়াছ। পাপের কখনও পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না

হইলে সনাতন ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা নাই। মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন, একথা আমি তোমাকে সেইরূপ বুঝাই, মনোযোগ দিয়া শুন।......প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক, কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাই সনাতন ধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি তাহা না জানিলে সূক্ষ্ম কি তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেকদিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কাজেই প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন প্রকৃত ধর্ম্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যতদিন তা না হয় যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান, গুণবান ও ও বলবান হয়, ততদিন ইংরেজ-রাজ্য অক্ষয় থাকিবে। অতএব হে বুদ্ধিমান—ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।

(২১)

ইহাই "আনন্দ-মঠের" মূল শিক্ষা। ইহাই আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূলতত্ত্ব। ইহারই উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রনীতিক সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মুসলমানের উচ্ছেদ সাধন যখন স্বজাতির ও স্বধর্ম্মের কল্যাণের জন্য আবশ্যক হইয়াছিল, তখন 'সন্তানেরা' প্রাণ

বিসর্জ্জন দিয়া সে কার্য্য সাধন করিয়াছেন। দুর্ব্বল ও অত্যাচারী রাজশক্তির প্রতিকূলে বিদ্রোহ অধর্ম্ম নহে। যুগে যুগে ভারতের ইতিহাসে অবতারগণ যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে, তখনই এইরূপে দুষ্কৃতির বিনাশ সাধন করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন। মুসলমানের প্রতিকূলে বিদ্রোহ আত্মঘাতী হয় নাই। কিন্তু তখনও ভারতের প্রজাশক্তি জাগিয়া উঠে নাই। মুষ্টিমেয় সন্তানদল মাত্র জাগিয়া উঠিয়াছিলেন। সে অবস্থায় তাঁহাদের উপরে রাজ্য শাসনের ভার পড়িলে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইত না। এই গণতন্ত্র আদর্শের প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার জন্যই ইংরাজ শাসন অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। ইংরাজ আসিবার পূর্বে ভারতবর্ষ যদি জাপানের মতন স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ থাকিত, তাহা হইলে অন্য কথা ছিল। জাপান যে পথে আধুনিক বহির্বিবষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়া আত্মরক্ষা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ভারতবর্ষ তখন তদবস্থাধীনে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিত।

কিন্তু যাহা হয় নাই তাহা হইতে পারিত এরূপ কল্পনা করিয়া যাহা হইয়াছে ও যাহা প্রত্যক্ষ তাহাকে উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে। রাষ্ট্রনীতি কবি-কল্পনার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, প্রত্যক্ষ অবস্থা এবং ব্যবস্থা দ্বারাই সমীচীন রাষ্ট্রনীতির গতি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রনীতি যাহা আছে তাহারই উপরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। যাহা হইতে পারিত সে কল্পনার আশ্রয় করিয়া চলে নাই। আর যাহা হইয়াছে ও আছে তাহাকে দৃঢ় করিয়া ধরিয়াই বঙ্কিমের রাষ্ট্রনীতি একটা সমীচীন সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। এ বিষয়েও বঙ্কিমচন্দ্র রামমোহনের পথ ধরিয়া চলিয়াছিলেন।

(২২)

কেহ কেহ মনে করেন যে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজের চাকুরী করিতেন ;

আর ইংরাজ প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে দেশের লোকের অন্তরে কোন প্রকার দ্রোহীভাব জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টাতে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে হয়, এইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র "আনন্দমঠে" এরূপভাবে ইংরাজের ওকালতি করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ কল্পনা করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা ও চরিত্রের অবমাননা করা হয়। রাজা রামমোহনের মতন এমন স্বাধীনতার উপাসক, এরূপ স্বজাতিবৎসল দেশসেবক কি এই যুগে কি পূর্ব্ব যুগে দেখা যায় নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ রাজাও ইংরাজ শাসনের দ্বারা এদেশের সমূহ কল্যাণ হইবে, এরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ইহার পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য, মৃত ভারতবাসীর অসাড় দেহে জীবনের শক্তি সঞ্চার করিবার জন্য আধুনিক বহির্বিজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ ভারতবাসীদিগকে নূতন শিক্ষা দিবার জন্য রামমোহনও কিছুকাল ইংরাজ এদেশে রাজা হইয়া থাকুক, ইহা চাহিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সহকারী বা প্রাইভেট সেক্রেটারী আরনল্ডকে কহিয়াছিলেন যে এই কাজটা করিবার জন্য আরও চল্লিশ বৎসর কাল ইংরাজ ভারতের রাজা হইয়া থাকিবে; ইহার মধ্যে ভারতবাসী য়ুরোপীয়-দিগের সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারিবে।

স্বর্গারোহণের কিছুদিন পূর্ব্বে রামমোহন আরনল্ডকে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে ১৮৭০-৮০ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ মোটের উপরে একশো বা সোয়াশো বৎসর পর্য্যন্ত ইংরাজ এদেশে রাজা হইয়া থাকিবে; এই সময়ের মধ্যেই ইংরাজদের নিকট আমাদের যাহা কিছু প্রাপ্য ও শিক্ষনীয় তাহা আদায় করিয়া লইতে পারিব। এই কারণেই ইংরাজ এদেশের রাজা হউক, রাজা হইয়া আমাদের নব-জাগরণের সহায়তা করুক, ইংরাজের শিক্ষাদীক্ষা পাইয়া আমরা বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানে পারদর্শী হইয়া উঠি, এবং ক্রমে এইভাবে

আধুনিক জগতে একটা স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ রাষ্ট্র গড়িয়া তুলি, রামমোহন ইহা চাহিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও তাহাই চাহিয়াছিলেন। "আনন্দমঠে" এই মতবাদটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ইহার আরও একটা হেতু অনুমান করা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র য়ুরোপীয় ছাঁচের স্বদেশপ্রীতির আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। য়ুরোপীয়েরা নিজের দেশকে বড় করিতে যাইয়া অপরের দেশের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়া থাকে, একথা তিনি দেখিয়াছিলেন। স্পষ্ট ভাষায় তিনি য়ুরোপের এই স্বদেশপ্রীতির নিন্দা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের লোকে কোনদিন যেন এই আত্মঘাতী, বিশ্বদ্রোহী ও ধর্ম্মদ্রোহী আদর্শের অনুসরণ না করে, বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মদ্রোহী রাষ্ট্রনীতির পথ বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইলে যেভাবে আধুনিক য়ুরোপে প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্রসকল গড়িয়া উঠিয়াছে, ভারতবর্ষকে সে পথে যাইলে চলিবে না। আর যুদ্ধবিগ্রহের পথে যদি ভারতবর্ষ আপনার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে যায় বা যাইতে বাধ্য হয় তাহা হইলে য়ুরোপে যেরূপ সামরিক সাম্রাজ্য-সকলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ভারতবর্ষেও সেই জাতীয় সামরিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে, বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা যে এই মোটা কথাটা ধরিতে পারে নাই, এরূপও মনে করিতে পারি না। যুদ্ধ করিতে হইলেই সেনা ও যুদ্ধের অন্যান্য সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে হইবে। আধুনিক কালে যুদ্ধ ব্যাপারটা অতি জটিল হইয়া উঠিয়াছে। কেবল বাহুবলে আজিকালি রণজয়ী হওয়া সম্ভব নয়। প্রবল পরাক্রান্ত বিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করিয়া জয়শ্রী লাভ করিতে হইলে এখন বাহুবল, ধনবল, বুদ্ধিবল, বিদ্যাবল, জাতীয় জীবনের প্রায় সমগ্র শক্তিকে ও সম্পদকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হয়। ইহাতে যুযুৎসু জাতিসকল পুনরায় অভিনব দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া

পড়ে, সত্য স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রতার আদর্শ আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় না। এই পথে বিশ্বমৈত্রীর প্রতিষ্ঠা অসাধ্য। আর ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শই এই বিশ্বজনীন মৈত্রী। ভারতবর্ষের হিন্দুরা অতি প্রাচীনকাল হইতে এই আদর্শের পশ্চাতে ছুটিয়াছে ; ইহাই ভারতের সভ্যতা ও সাধনার বিশেষত্ব। এই আদর্শভ্রষ্ট হইলে ভারতবর্ষ আপনাকে হারাইবে। আপনাকে যদি হারাইয়া ভারতবর্ষ য়ুরোপের মতনই হইয়া উঠে তবে তাহার স্বতন্ত্রভাবে বাঁচিয়া থাকিবার কোন হেতু থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র এসকল কথা যেরূপ সুস্পষ্ট করিয়া দেখিয়াছিলেন, এযুগে রামমোহন ছাড়া আর কেহ সেরূপ দেখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। আর এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ধর্ম্মে ও সমাজে, সেইরূপ রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও একটা সমন্বয় সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রয়োজন হইলে যুদ্ধবিগ্রহ যে পাপ এরূপ কথা বঙ্কিমচন্দ্র কখন ভাবিতেন না। নিষ্কামভাবে আততায়ীর আততায়িতা নিবারণের জন্য অস্ত্রধারণ পাপ হওয়া দূরে থাকুক, অতিশয় পুণ্য কর্ম্ম, ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা। "আনন্দমঠে", "সীতারামে", "দেবী-চৌধুরাণীতে", "অনুশীলন ধর্ম্মে" ও অন্যান্য প্রসঙ্গে তিনি অতি পরিষ্কার করিয়া এই কথাটা বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যেমন যতক্ষণ কৌরবদিগের সঙ্গে পাণ্ডবদিগের সন্ধিতে বা আপোষে বিবাদ নিস্পত্তির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন নাই, বঙ্কিমচন্দ্রও সেইরূপ যতক্ষণ স্বদেশের স্বাধীনতালাভের জন্য বিদেশীয় প্রভুশক্তির সঙ্গে সন্ধির ও সোলে-নামার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে ততক্ষণ মারাত্মক বিদ্রোহের পথ অবলম্বন অধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। এই সন্ধি ও সোলেনামার দিকে তাঁর দৃষ্টি সর্ব্বদা যেন নিবদ্ধ ছিল। এইজন্যই তিনি স্বদেশবাসীদিগকে আপনার বাহুবল, ধনবল, জ্ঞানবল ও বিদ্যাবল সংগ্রহ করিবার জন্য

প্রণোদিত করিরাছিলেন। "কমলকান্তের দপ্তরে" আত্মনির্ভর যে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও স্বাধীনতালাভের একমাত্র পথ—ভিক্ষাবৃত্তিতে যে স্বাধীনতা মিলে না, এই কথাটা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। অথচ অন্য দিকে এই আত্মশক্তিকে বিরোধ জাগাইবার পথে পরিচালিত না করিয়া প্রজার প্রতাপ প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজার স্বেচ্ছাতন্ত্রকে আপোষে নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। বঙ্কিমের রাষ্ট্রনীতিতে সমরায়োজনের স্থান আছে, কিন্তু তাহার লক্ষ্য সংগ্রাম নহে, সন্ধির দিকে প্রতিপক্ষকে প্রণোদিত করা। এইরূপেই বঙ্কিম-সাহিত্যের রাষ্ট্রনীতি একটা সমন্বয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়াছে। এই কথাটা না ধরিলে বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রনীতির মূল তত্ত্বটা ধরা সম্ভব হইবে না।

চতুর্দ্দশ কথা

নাট্যকলায় ও রঙ্গালয়ে নবযুগ

ইংরাজি শিক্ষা ও আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার প্রেরণা বাংলার ইংরাজি-নবিশদিগের অন্তরে যে বিপ্লব ঘটাইয়া তুলে, তাহার ফলে সাহিত্যের অপরাপর বিভাগের মতন নাট্যকলা এবং রঙ্গমঞ্চে এক অপূর্ব্ব যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে ভারতে নাট্যকলার অসাধারণ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, সংস্কৃত নাটকগুলি তার প্রমাণ। কিন্তু সাধারণ লোকের সাধারণ সাহিত্যে ইহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। বাংলা ভাষায় ইংরাজি আমলের পূর্ব্বে কোনও নাটক রচিত হইয়াছিল কিনা, তাহার প্রমাণ নাই। এমন কি পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বকার বাংলা সাহিত্যে কোনও বিশিষ্ট নাটকের খোঁজ পাওয়া যায় নাই—অতি উচ্চ অঙ্গের গীতিকাব্যের বিস্তর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। "চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি"— "চৈতন্য-চরিতামৃতে" ইহার উল্লেখ থাকিলেও "রায়ের নাটকগীতি" যে বাংলা নাটক ছিল, এরূপ অনুমান করিবার বোধ হয় কোন হেতু নাই। শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর সময়ে যে সকল নাটক রচিত হইয়াছিল, তাহা সকলই সংস্কৃতে, বাংলা ভাষায় কেবল গীতিকাব্যেরই সৃষ্টি হইয়াছিল। বাংলার নাট্যকলা নিতান্ত আধুনিক, ইংরাজি আমলের সৃষ্টি, ইংরাজি শিক্ষার ফল। আর এই নূতন শিক্ষার প্রেরণায় বাঙ্গালীর প্রাণে যে সকল ভাব ও আদর্শ জাগিয়াছিল, বাংলার নবযুগের নাট্যকলা তাহাকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছিল।

(২)

ইংরাজি শিক্ষার প্রথম ফল সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কার। প্রাচীন ও প্রচলিত ধর্ম্ম-বিশ্বাসে, সামাজিক আচারানুষ্ঠানাদিতে ইংরাজিনবিশ বাঙ্গালীর নূতন আদর্শে ও ধর্ম্মবুদ্ধিতে আঘাত লাগে। ইঁহারা স্বদেশের আচারানুষ্ঠানাদির প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া, এগুলির সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন। বাংলার নবযুগের প্রথম পর্ব্বের নাট্যকলাতে এই সমাজ সংস্কারের আদর্শটাই বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠে। "বিয়ে পাগলা বুড়ো", "জামাই বারিক" প্রভৃতি প্রহসনে, "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব", "বিধবা বিবাহ নাটক", "সধবার একাদশী" প্রভৃতি নাটকে এই ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের ভাবটাই খুব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজ যে সকল ভাব ও আদর্শ জাগাইয়াছিলেন, ষাট বৎসর পূর্ব্বকার বাংলা নাট্যকলা তাহাই স্বল্পবিস্তর প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিল। বাংলার নূতন রঙ্গালয়ের সাহচর্য্যে এই সকল ভাব এবং আদর্শই দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দীনবন্ধুর রসসৃষ্টি যুগপৎ সাময়িক ও সার্ব্বকালিক ছিল। একদিকে তাহাতে দেশকালের প্রভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে আবার যাহা দেশ এবং কালের অতীত, নিত্য রসমূর্ত্তি, তাহাও ফুটিয়া উঠিয়াছে। "জামাই বারিক" বহু বহু দিন উঠিয়া গিয়াছে। নিমচাঁদ বা রাম-মাণিক্যও বাঙ্গালী সমাজে লোপ পাইয়াছে। কিন্তু যে অবলম্বন ও উদ্দীপনার আশ্রয়ে এ সকল অপূর্ব্ব রসমূর্ত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা বদলাইয়া গেলেও মূল রস বদলায় নাই। তাহা চিরন্তন ও সনাতন। এইজন্য আজিও আমরা "সধবার একাদশী" বা "নবীন তপস্বিনী" পড়িলে বা এগুলির অভিনয় দেখিলে অপূর্ব্ব রসাস্বাদন করিয়া থাকি। "নবীন তপস্বিনী"কে বাংলায় ব্রাহ্মযুগের নাটক বলিতে পারা যায়। ফলতঃ দীনবন্ধু মিত্রের সকল নাটকের

মধ্যেই স্বল্পবিস্তর পরিমাণে তদানীন্তন কালের ব্রাহ্ম সমাজের ভাব ও আদর্শ ফুটিয়া আছে। ইহা কিছু আশ্চর্য্যের কথাও নহে। কারণ পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে দেশের নব্যশিক্ষিত সমাজের সকলেই অন্তরে অন্তরে ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন ছিলেন।

(৩)

সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারের যুগের পরে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার যুগের আবির্ভাব হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। কাব্যে, নাট্যে, উপন্যাসে, সঙ্গীতে, সাহিত্যের সকল বিভাগে এই নূতন স্বাধীনতার ভাবটা মুখরিত হইয়া উঠে। পশ্চিমে যমুনাতীরে বসিয়া গোবিন্দ চন্দ্র রায় নূতন "জাতীয় সংগীতের" তান ধরেন।

কত কাল পরে, বল ভারতরে
দুঃখ-সাগর সাঁতারি পার হবে ?

এটিই বোধ হয় তাঁর প্রথম গান।

নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা
তটশালিনী সুন্দরী যমুনে—ও!

এইটি দ্বিতীয় গান। গোবিন্দচন্দ্র এই দুইটি সংগীতেই বাংলা সাহিত্যে একটা স্থায়ী স্থান অধিকার করিয়া আছেন। আজিকালিকার লোকে এ সকল গান আর গায় না, ইহার মহিমা এবং শক্তিও ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এককালে এগুলি নব্য বাংলার নবীন দেশমাতৃকার সাধকদিগের জপমন্ত্র ছিল। যমুনা ত বহুদূরে। আমরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে বসিয়া "নির্ম্মল সলিলে" গাহিয়া ও শুনিয়া স্বদেশপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতাম। ভারত ইতিহাসের এমন করুণ কাহিনী আর কেহ গান করেন নাই।

এই স্বদেশ-প্রেমের ভাব ও আদর্শ ক্রমে নাট্যকলাতেও ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। "ভারত মাতা" নামে গীতি-নাট্যখানি সর্ব্বপ্রথমে দেশ-ভক্তিকে ধর্ম্মের এবং দেশ-সেবাকে উপাসনার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। পরে দেশ মধ্যে যে স্বদেশ-ধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, "ভারতমাতা"তেই তার প্রথম সূচনা হয়। বোধ হয় বেঙ্গল থিয়েটারেই এখানির প্রথম অভিনয় হইয়াছিল। বইখানি ছাপা হইয়াছিল কি না, মনে নাই। কিন্তু বহুদিন ধরিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া "ভারত মাতা" পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বকার শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে দেশ-ধর্ম্মের বা পেট্রিয়টীজ্‌মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

(৪)

ইংরাজ-বিদ্বেষ সে যুগের দেশ-ধর্ম্মের বা পেট্রিয়টিজ্‌মের মূল প্রেরণা ছিল। বাংলার নূতন নাট্যকলা এবং রঙ্গমঞ্চে এই বিদ্বেষ-ভাবটা খুব ফুটিয়া উঠে। ইহা প্রথম প্রকাশ পায় দীনবন্ধুর "নীল দর্পণে"।

নীল বানরে সোনার বাংলা করলে এবার
ছারেখার!
প্রজার আর প্রাণ বাঁচান ভার।
অসময়ে হরিশ ম'ল, লংয়ের হ'ল কারাগার।

এই গানটিতে লোকে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিত। আর—

নীলকর, বিষধর বিষপোড়া মুখ।
জ্বলন্ত শিখায় ঢেলে দিল যত সুখ।

পতিপুত্র শোকে মাতা হ'য়ে পাগলিনী
স্বহস্তে করেন বধ সরলা কামিনী।

আমার কথায় মার জ্ঞানের সঞ্চার
উথলিল একেবারে শোক পারাবার।

শেষ অঙ্কের শেষ অভিনয়ের এই আক্ষেপোক্তিতে শ্রোতৃ ও দর্শকমণ্ডলী অশেষ কারুণ্য রসে ডুবিয়া যাইত ও ইহারই সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে ইংরাজ-বিদ্বেষ প্রবল বন্যার মতন বহিতে আরম্ভ করিত।

(৫)

"নীল-দর্পণ" যে স্বাদেশিকতার বীজ বপন করিয়াছিল, উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের "শরৎ সরোজিনী"ও "সুরেন্দ্র বিনোদিনী" তাহাকে অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও কুসুমিত করিয়া তোলে। "নীলদর্পণের" কথা লোকে এখনও জানে। যতদিন বাংলা ভাষা থাকিবে, দীনবন্ধুর নাট্যাবলী ততদিন বাঙ্গালী সমাজে আদৃত হইয়া রহিবে। দীনবন্ধুর কবি-প্রতিভা উপেন্দ্রনাথের ছিল না। তাঁহার "শরৎ সরোজিনী" বা "সুরেন্দ্র বিনোদিনী" বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী স্থান অধিকার করে নাই। আজিকালিকার লোকে উপেন্দ্রনাথের নাম জানেন না, তাঁহার নাট্যকলার কোন খবর রাখেন না। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে "শরৎ সরোজিনী" এবং "সুরেন্দ্র বিনোদিনী" আমাদের নূতন স্বদেশ-প্রেমে ও ইংরাজ-বিদ্বেষে অসাধারণ ইন্ধন জোগাইয়াছিল। এই দুইখানি নাটকই স্বদেশ-প্রীতিমূলক। এই দুইখানিতেই ইংরাজের অত্যাচার ও অবিচারের চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই দুইখানি নাটকেই বিদেশীর হাতে দেশের লোকের কি লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় তাহা বিশদ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছে। হেমচন্দ্র তাঁর কবিতায়

ধীরে ধীরে যাই, ফিরে ফিরে চাই,
শ্বেতাঙ্গ দেখিয়ে আতঙ্কে পলাই।

বা

ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর
না হলে শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার।

এ সকল কথাতে যে ভাব জাগাইয়াছিলেন, গোবিন্দচন্দ্র "কত কাল পরে বল ভারতরে" এবং "নির্ম্মল সলিলে" গাহিয়া যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ কলাকুশলতা সহকারে সুনিপুণ তুলিকায় "চন্দ্রশেখরে" ফষ্টারের চিত্র আঁকিয়া স্বদেশের যে মর্ম্মান্তিক অযমাননার কথা অন্তরে জাগরূক রাখিতে চাহিয়াছিলেন,—সেই ভাব ও সেই প্রেরণাকেই উপেন্দ্রনাথ 'শরৎ সরোজিনী" এবং "সুরেন্দ্র বিনোদিনীতে" প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেকালে এই হাওয়াটাই আমাদের মধ্যে বহিতেছিল। তারই জন্য "শরৎ সরোজিনী" এবং "সুরেন্দ্র বিনোদিনী" তখনকার নাট্যকলাতে ও রঙ্গমঞ্চে এতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। আধুনিক স্বাদেশিকতার অভিব্যক্তির ইতিহাসে এই জন্য উপেন্দ্রনাথ দাস এবং তাঁহার "শরৎ সরোজিনী" ও "সুরেন্দ্র বিনোদিনী"র একটা বিশিষ্ট স্থান আছে।

"শরৎ-সরোজিনী" ও "সুরেন্দ্র বিনোদিনী"র একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, "নীলদর্পণ" ছাড়া এই দু'খানি নাটকই সর্ব্বপ্রথমে খোলাখুলি-ভাবে ইংরাজের সঙ্গে আমাদের যে একটা সাংঘাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগিয়া আছে, ইহা বলিতে চেষ্টা করে। ইহার পূর্ব্বে আমরা ঠারে-ঠোরে মুসলমান আমলের ইতিহাসের আড়ালে যাইয়া ইংরাজ-রাজের প্রতি আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতাম। হেমচন্দ্রের "বাজ রে শিঙ্গা", সত্যেন্দ্রনাথের "গাও ভারতের জয়", গোবিন্দ-চন্দ্রের "কতকাল পরে বল ভারত রে" কিম্বা "নির্ম্মল সলিলে"—এ সকলই পরোক্ষভাবে বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার বেদনাকে

জাগাইয়াছিল। কেবল "নীলদর্পণই" সাক্ষাৎভাবে ইংরাজ কুঠিয়াল-দের অত্যাচার এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ রাজপুরুষদিগের পক্ষপাতিত্বের ছবি ফুটাইয়া তুলে। কিন্তু নীলকরের অত্যাচারে দেশে যে তুমুল আন্দোলন জাগিয়াছিল, তাহা একটা বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা। লং প্রভৃতি সদাশয় ইংরাজেরা পর্য্যন্ত এই আন্দোলনে প্রজার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। লং সাহেবের কারাদণ্ড হওয়াতে একদিকে দেশের জনসাধারণে অন্যদিকে ইংরাজ সমাজের উদারমতি লোকেরা পর্য্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। এই ক্রোধ ও এই অত্যাচারের ছবিটাই দীনবন্ধু "নীলদর্পণে" অঙ্কিত করেন। সাধারণভাবে ইংরাজ-রাজের বা ইংরাজ-রাজপুরুষদিগের বিরুদ্ধে "নীলদর্পণে" স্পষ্টভাবে কোনও কথা বলা হয় নাই। তবে নীলকরদিগের অত্যাচারের ছবিতে কেবল নীলকরদিগের বিরুদ্ধেই যে লোকের মনে একটা বিদ্বেষ জাগাইয়াছিল, তাহা নহে; সাধারণভাবে সকল বিদেশীয়ের এবং বিদেশী প্রভুশক্তির প্রতিকূলেও একটা বিরূপ ভাব জাগাইয়াছিল। "শরৎ সরোজিনী"তে এবং "সুরেন্দ্র বিনোদিনী"তে উপেন্দ্রনাথই প্রথমে এই ভাবটাকে প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্যভাবে ইংরাজ সমাজের ও ইংরাজ প্রভুশক্তির প্রতিকূলে পরিচালিত করেন।

(৬)

নবযুগের নাট্যসাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "সরোজিনী" একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। রস-সৃষ্টির বিচারে "সরোজিনী" উপেন্দ্রনাথের নাট্যাবলী অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। স্বাদেশিকতার প্রেরণা হিসাবেও "সরোজিনী" একটা উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। "সরোজিনী" রাজপুত ইতিহাস অবলম্বনে রচিত। রাজপুতের অপূর্ব্ব দেশভক্তি বাংলা নাট্যকলায় প্রথমে "সরোজিনী"তেই ফুটিয়া

উঠিয়াছে। ' কাব্যে রঙ্গলালের "পদ্মিনী উপাখ্যান" এই উদ্দীপনা "সরোজিনী"র পূর্ব্বে জাগাইয়াছিল। কিন্তু যত লোকে রঙ্গলালের "পদ্মিনী উপাখ্যান" পড়িত, তার চাইতে অনেক বেশী লোকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ "সরোজিনী'র অভিনয় দেখিত। বাহির হইতে দেখিলে "সরোজিনী"তে একটা মুসলমান-বিদ্বেষ ফুটিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে অন্ততঃ বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। হিন্দু মুসলমানকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিত না, মুসলমানও হিন্দুকে ঈর্ষা করিত না। সুতরাং "সরোজিনী" প্রভৃতিতে মুসলমান ইংরাজের প্রতীকরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লোকে মুখে গালি দিত মুসলমানকে, অন্তরে ধ্যান করিত ইংরাজকে। পরোক্ষভাবে "সরোজিনী"ও রাজপুত-মুসলমানের বিরোধের ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া লোকের মনে ইংরাজ-বিদ্বেষই জাগাইয়াছিল।

(৭)

যদিও পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বকার স্বজাতিবাৎসল্য বিশেষভাবে পরজাতি-বিদ্বেষের আশ্রয়েই জাগিয়াছিল, তথাপি ক্রমে ক্রমে ইহার অন্তরালে স্বদেশের সভ্যতা এবং সাধনার প্রতি একটা অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ভক্তিই স্ফুরিত হইতেছিল। একদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" বিশেষভাবে এই কাজটা করিয়াছিল, অন্যদিকে সেই যুগের নাট্যকলাও নানাদিক দিয়া এই সত্য স্বাদেশিকতাকে উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সেকালে ইংরাজি-শিক্ষিত লোকেদের মনে য়ুরোপের অনুচিকীর্ষা প্রবৃত্তি নিরতিশয় বলবতী হইয়াছিল। যতদূর মনে পড়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে এই সাংঘাতিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে নষ্ট করিতে

চেষ্টা করেন। তাঁহার "যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ" এবং "এমন কর্ম্ম আর করব না" এই দুইখানি প্রহসনই প্রহসন হিসাবে যেমন উৎকৃষ্ট, সেইরূপ পরজাতির অনুচিকীর্ষা প্রবৃত্তিকে দমন এবং সংযত করিবার চেষ্টাতেও সেকালের বাংলা নাট্যকলায় অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিল। এ দুখানি বই এখন বাজারে পাওয়া যায় কিনা জানি না, আজিকালিকার বাঙ্গালী ঐ দুখানি প্রহসনের খবর রাখেন কিনা সন্দেহ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রহসন রচয়িতারূপে বাংলা সাহিত্যে উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিলেন। নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয় পরে সেই স্থান অধিকার করেন। অমৃতলালের রঙ্গকৌতুক এবং ব্যঙ্গশ্লেষ হিন্দু পুনরুত্থানের আন্দোলনের মুখেই ফুটিতে আরম্ভ করে। বিদেশীর অনুচিকীর্ষার বিরুদ্ধে তখন দেশে একটা অতি প্রবল ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। প্রথম যুগের বিলাতী সভ্যতা এবং সাধনার প্রভাবের প্রতিকূলে তখন প্রবল প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে সময় এই অনুচিকীর্ষা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লেখনী চালনা আরম্ভ করেন, তখনও আমাদের ইংরাজীনবিশেরা বিদেশের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্যের আত্মজ জ্যোতিরিন্দ্র এবং তাঁহার অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথই একরূপ বলিতে গেলে পরবর্ত্তী হিন্দু পুনরুত্থানের মূল প্রবর্ত্তক। দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং আর একদিক দিয়া দেখিলে এই পুনরুত্থানের বা প্রতিক্রিয়ার গোমুখী হইয়া ছিলেন, এরূপও বলা যায়। "জামাই বারিক" এবং "সধবার একাদশী" তখনকার সমাজের অহিতাচারের উপরে তীব্র কশাঘাত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। "বহু বিবাহ", "বিধবা বিবাহ নাটক", "বিয়ে পাগলা বুড়ো", "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ"—এ সকল প্রহসন এবং

নাট্যসৃষ্টি প্রাচীন হিন্দু সমাজের কুরীতি এবং কুসংস্কার লোক-চক্ষে হীন করিয়া, সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনে শক্তি সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথমে নূতন সমাজ এবং ধর্ম্মসংস্কারক দলের আতিশয্যের উপরে শানিত বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপ করিয়া পরোক্ষভাবে স্বদেশের সাধনা এবং সভ্যতার প্রতি শিক্ষিত সমাজের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন।

(৮)

নবযুগের নাট্যকলায় মনোমোহন বসু মহাশয়ও একটা উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছেন। মনোমোহন বসুর নাটকগুলির খোঁজখবর আধুনিকেরা রাখেন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু আমরা তাঁর নাটক পড়ি আর না পড়ি, তিনি বর্ত্তমান যুগের স্বাদেশিকতায় ও দেশচর্য্যায় যে শক্তি আধান করিয়াছিলেন, তাহা বাংলার নবযুগের ইতিহাস বিস্মৃত হইবে না। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পরেও লোকে তাঁহার রচিত—

দিনের দিন সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন,
অন্নাভবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ,
অনশনে তনু ক্ষীণ।

এই গান গাইয়া থাকে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই সঙ্গীতের অন্তরালে যে বাস্তবতা ছিল, আজ লোকের চিত্তে তার অনুভূতি শতগুণে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল আজ তাহাই প্রকাশ্যভাবে সাধারণ লোকের চক্ষুগোচর হইয়াছে। বাংলার নবযুগের নাট্যকলার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় রামনারায়ণ, মাইকেল, দীনবন্ধু, উপেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মনোমোহন প্রভৃতির রসচিত্রের দ্বারা গঠিত

হইয়াছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতির স্থান। ইঁহারা হিন্দু-পুনরুত্থান ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার মুখে ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠেন। এই নব্য হিন্দু আন্দোলনের কথার সঙ্গে গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির নাট্যকলা অনুস্যূত। এই আন্দোলনের কথা বিবৃত করিবার সময়ে গিরীশচন্দ্র প্রভৃতির রসস্থষ্টির আলোচনা করাই সঙ্গত হইবে।

(৯)

বাংলার রঙ্গমঞ্চ আমাদের আধুনিক স্বাদেশিকতা ও দেশচর্য্যাকে কি পরিমাণে যে সেবা করিয়াছেন, কি অভিনয়ের নিপুণতায়, কি রসস্থষ্টির কুশলতায়, বর্ত্তমান যুগের বাংলার অভিনেতা ও অভিনেত্রী-গণের কেহ কেহ যে সভ্যতাভিমানী অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠতম অভিনেতা ও অভিনেত্রী অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহেন, অনেকে এ সকল কথা বোঝেন না বা ধ্যান করিয়া দেখেন না, কিম্বা ইচ্ছা করিয়া দেখিতে চাহেন না। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে নট বলিয়া একটা সম্প্রদায় বা জাতি ছিলেন। নাট্যকলার অনুশীলন ইঁহাদের পুরুষানুগত বা জাতিগত ব্যবসায় ছিল। নট নটী গৃহস্থ ছিলেন। সে ব্যবসায় ক্রমে লোপ পাইয়া যায়। সঙ্গীতকলা এবং নৃত্যকলা উভয়ই মধ্যযুগে গণিকাদিগের দ্বারা সেবিত হয়, প্রাচীনকালেও হইত। বাৎস্যায়নে ইহার কথঞ্চিৎ প্রমাণ পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা আজিকালি গণিকা শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করি, বাৎস্যায়নের কালে সে অর্থে ব্যবহৃত হইত না। যে সকল স্ত্রীলোক চৌষট্টিকলা আয়ত্ত করিতেন তাঁহাদিগকেই বাৎস্যায়নের কালে গণিকা বলা হইত। যাত্রাকালের মন্ত্রে—'দ্বিজনৃপগণিকা পুষ্পমালা পতাকা' প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে তাহাতে বোধ হয় গণিকা শব্দ এই অর্থেই ব্যবহৃত

হইয়াছে, সাধারণ ভ্রষ্টচরিত্রা স্ত্রীলোক অর্থে নহে। ক্রমে মধ্যযুগে রাষ্ট্রীয় অভ্যুদয় নাশের সঙ্গে ইহজীবনের দুঃখ অপমানের অসহ্য যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মানুষ যখন নিতান্ত নিরাশ ও একান্ত অসহায় হইয়া পরলোককে অধিকার করিয়া ইহলোকের ক্ষতিপূরণ করিবার আশায় সংসারের সকল ভোগ বিলাসকে বিষবৎ বর্জ্জন করিতে আরম্ভ করে, তখন হইতে যাবতীয় রসকলার অনুশীলন ধার্ম্মিক ও ভদ্রসমাজের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহারই ফলে সঙ্গীতাদি ললিত কলার অনুশীলন ভদ্রসমাজে লোপ প্রাপ্ত হয়। আধুনিক যুগে ইংরাজী শিক্ষা ও য়ুরোপীয় সাধনার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা যখন ললিত কলার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলাম তখন ভদ্রসমাজে নট নটী পাওয়া সম্ভব ছিল না। প্রথমে পুরুষেরাই সখের রঙ্গালয়ে রমণীর ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। ইহাতে রসসৃষ্টির ব্যাঘাত হইত, অভিনেতাদিগের চরিত্রও যে বিশুদ্ধ থাকিত এমন বলা যায় না। সত্য রসসৃষ্টির প্রয়োজনে যখন রমণীর ভূমিকা রমণীকেই গ্রহণ করিতে হইল, তখন সমাজে নাট্য ব্যবসায় অপাংক্তেয় হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় শুদ্ধ রসসৃষ্টি এবং নাট্যকলার যথাযথ উন্নতি সম্ভব ছিল না। সমাজের চিন্তা এবং চরিত্রকে যাঁহারা উদ্বুদ্ধ ও নিয়মিত করিতেছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের একটা বিশাল ব্যবধান প্রতিষ্ঠিত হইয়া নাট্যকলার উন্নতির গুরুতর ব্যাঘাত জন্মাইয়াছিল। নাট্যকলা বিশেষতঃ রঙ্গমঞ্চের রসসৃষ্টি সমাজের প্রাণস্রোত হইতে পৃথক থাকিয়া আপনার সম্যক্ সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। কিন্তু এই গুরুতর অন্তরায় সত্ত্বেও বাংলার নবযুগের রঙ্গমঞ্চ নাট্যকলার যে উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে, ইহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। অভিনেতা এবং অভিনেত্রীগণ যদি সমাজের চিন্তানায়কদিগের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মিলিয়া মিশিয়া নিজেদের রসসৃষ্টির প্রেরণা লাভ করিতে

পারিতেন, তাহা হইলে নবযুগের বাংলার রঙ্গমঞ্চ আধুনিক য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতম রঙ্গমঞ্চের সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু এ সত্ত্বেও বিগত পঞ্চাশ ষাট বৎসরের বাংলার চিন্তাধারা এবং জীবনধারার বিকাশে বাংলার এই 'অপাংক্তেয়' রঙ্গমঞ্চ যে অসাধারণ শক্তি সঞ্চার করিয়াছে একথা অস্বীকার করা যায় না। আজিকার বাংলা যে সকল শক্তির সমাহারে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, নবযুগের নাট্যকলা এবং রঙ্গমঞ্চ তাহার মধ্যে অন্য কোনও অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে।

পঞ্চদশ কথা

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সুরেন্দ্রনাথ

বাংলার নবযুগের ইতিহাস আধুনিক বাঙ্গালীর চিন্তাতে ও চরিত্রে বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠতম স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শকে গড়িয়া তুলিবার জন্য শতাব্দব্যাপী একটা সংগ্রামের ইতিহাস। এই সংগ্রামের নায়করূপেই বাঙ্গালী বিগত শত বর্ষকাল ধরিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের আধুনিক চিন্তা ও সাধনায় শিক্ষা ও দীক্ষাগুরুর স্থান অধিকার করিয়া আছেন। সত্য স্বাধীনতার আদর্শ মানুষের সমগ্র জীবনে ছাইয়া পড়ে। প্রায় সর্ব্বত্রই এই স্বাধীনতার আদর্শ সর্ব্বপ্রথমে ব্যক্তিগত জীবনে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। বন্ধনের অনুভূতি এবং বেদনা হইতেই স্বাধীনতার লিপ্সা স্ফুরিত হয়। আর মানুষ সর্ব্বদাই আপনার ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম্ম ও সমাজের বন্ধনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া এই সংগ্রামের সূচনা করে। এক কালে ধর্ম্মই মানুষের জীবনের মুখ্য সাধনা ছিল। আর তখন মানুষ ধর্ম্ম বলিতে পারলৌকিক সম্বন্ধই বুঝিত। মুক্তির অর্থ তখন সংসার-বন্ধন বিমোচন ছিল। ইহজীবনের সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে একান্ত পীড়িত হইয়া মানবের চিত্ত একটা দ্বন্দ্বাতীত সমতা লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ধর্ম্মের অনুসরণ করিত। ধর্ম্ম তখন অনেক ক্ষেত্রে বা অধিকাংশ স্থলে পারলৌকিক ইষ্টের অন্বেষণ করিত। পরলোকই মানুষের নিকটে একমাত্র সাধ্য ছিল। পরলোকে মানুষ ইহলোকের সুখদুঃখ আরোপ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখকে স্বর্গ ও ঐকান্তিক

দুঃখকে নরক নামে অভিহিত করিয়া এই নরক-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইয়া স্বর্গকামনায় ধর্ম্মসাধন করিত। আমাদিগের দেশে বহুকাল হইতে জনমণ্ডলী ইহলোকে অভ্যুদয়হীন হইয়া ঐহিক সুখ এবং মঙ্গলকে তুচ্ছ করিয়া পারলৌকিক কল্যাণ-কামনায় ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ছিল। ধর্ম্ম তখন সংস্কারবদ্ধ, আচারবদ্ধ, বাহ্য ক্রিয়াকলাপবদ্ধ হইয়া মানুষের চিন্তাকে ও কর্ম্মকে শত বন্ধনে বাঁধিয়াছিল।

প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির মধ্যে একটা তুমুল সংগ্রাম চিরদিন মানুষের জীবনে জাগিয়া আছে। এই সংগ্রামের মুখে পড়িয়া অধিকাংশ লোকে ইহলোকের অভ্যুদয়ও লাভ করিতে পারিত না, অতীন্দ্রিয় সম্পদ-লাভে যে অচ্যুত শান্তি পাওয়া যায়, তাহাও পাইত না। ইহ-লোককেও ছাড়িতে পারিত না, পরলোককেও দৃঢ় করিয়া ধরিতে পারিত না। এইজন্য বাহিরে সমাজ-শাসনভয়ে তাহারা ধর্ম্মের বহিরঙ্গের অনুসরণ করিলেও অন্তরে এই ধর্ম্মের বিরুদ্ধেই নিজেদের অজ্ঞাতসারে একটা দ্রোহীভাব সঙ্গোপনে পোষণ করিত। সংসার এবং পরমার্থের মধ্যে যতক্ষণ না একটা সত্য সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা হয়, ততক্ষণ জনসাধারণের অন্তরের নিভৃততম অন্তরে এই দ্রোহীভাব জাগিয়া রহে। মানুষের চরিত্রে যাহা কিছু অধর্ম্মাচরণ বা পাপাচরণ দেখিতে পাই, ভিতরের এই নিগূঢ় দ্বন্দ্ব এবং দ্রোহিতা হইতে তাহার উৎপত্তি। এই দ্বন্দ্ব ও দ্রোহিতা স্বল্পবিস্তর পরিমাণে সকল সমাজেই জাগিয়া রহে। যেখানে বাহিরের ধর্ম্মের শাসন যত কঠোর হয়, সেখানে ভিতরের এই দ্বন্দ্ব ও দ্রোহিতা তত তীব্র হইয়া উঠে। আমাদের দেশেও মধ্যযুগে ইহাই ঘটিয়াছিল। আর মাঝে মাঝে সাধু ও সিদ্ধ মহাপুরুষেরা নিজ নিজ যুগপ্রভাবকে অধিকার করিয়া সংসার এবং পরমার্থের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টাও করিয়াছিলেন। এই চেষ্টা হইতেই এক-

দিকে বিশুদ্ধতম তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবসাধনা ও অন্যদিকে বামাচারী ও সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল। তান্ত্রিক সাধনের ভিতর সর্ব্বদাই প্রচ্ছন্নভাবে একটা সমাজদ্রোহিতা জাগিয়া ছিল। এই সাধনা মুক্তি-কামনাতেই ঐকান্তিক নিবৃত্তিলাভের জন্য ভোগ এবং প্রবৃত্তির পথে সাধককে চালাইয়া লইতে চাহিয়াছিল। বৈষ্ণব-সাধনা মুক্তি এবং ভোগ উভয়কেই বিষবৎ বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বকামনা বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ ভগবদ্-প্রীতির প্রেরণায় ভোগ-সাধক ইন্দ্রিয়-সকলকে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া সংসার এবং পরমার্থের মধ্যে একটা উদার ও উচ্চ সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। তান্ত্রিক এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সিদ্ধ মহাপুরুষদিগের জীবনে সম্যকভাবে এই সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠাও হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ লোকে এই মহা সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহারা সংসার এবং পরমার্থের বিষম দ্বন্দ্বের মুখে পড়িয়া 'ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্ট' হইয়া রহিল। এই অবস্থায় বাহিরে ধর্ম্মের শাসন মানিয়াও ভিতরে ভিতরে লোকে এই শাসনকে মুক্তির সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। বরঞ্চ এই শাসনাধীনে তীব্র বন্ধন-বেদনাই অনুভব করিতে লাগিল। এই অবস্থায় জনসাধারণের অন্তরে ধর্ম্ম ও সমাজ-শাসনের বিরুদ্ধে একটা নিগূঢ় দ্রোহীভাব জন্মিয়া উঠা ও জাগিয়া থাকা অনিবার্য্য। ইংরাজ এদেশে আসিবার পূর্ব্ব হইতে জনসাধারণের অন্তরে এই দ্রোহীভাব স্বল্প-বিস্তর বিদ্যমান ছিল। নূতন ইংরাজী শিক্ষা ও য়ুরোপীয় সাধনার আধুনিক স্বাধীনতা এবং মানবতার প্রেরণা সমাজের এই প্রচ্ছন্ন দ্রোহিতাকেই প্রকট করিয়া তুলে। ইংরাজী-নবিশদিগের চিন্তাতে ও চরিত্রে যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আগন্তুক বা আকস্মিক নহে। জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের অজ্ঞাতসারে যে ভাব ব্যাপকরূপে বিদ্যমান ছিল, এবং ব্যাপক বলিয়াই যাহা প্রকাশ্যভাবে

তেমন করিয়া প্রকট হয় নাই, সেই নিগূঢ় দ্রোহীভাবই নূতন ইংরাজী-নবীশদিগের অন্তরে ও আচরণে কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত হইয়া প্রস্ফুট হয়।

কোনও সমাজে কোনও সময়ে জনসাধারণের মধ্যে যে ভাব প্রচ্ছন্ন না থাকে তাহা কখনও সেই সমাজের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের মধ্যে একটা তুমুল ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র-বিপ্লবের আকারে প্রকট হইয়া উঠে না। বাংলার নবযুগের ইতিহাসে মুষ্টিমেয় ইংরাজী-নবীশদিগের মধ্যে যে ধর্ম্ম ও সমাজ-দ্রোহিতা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার সঙ্গে দেশের জনসাধারণের একটা অতি নিগূঢ় যোগ ছিল না, এরূপ কল্পনা করা যায় না। ফলতঃ এই ধর্ম্ম ও সমাজ-দ্রোহিতাকে যাঁহারা বিদেশী অনুচিকীর্ষার ফলে একটা আগন্তুক ও আকস্মিক উৎপাত বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত মনোবিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হয় না।

(২)

বাংলার নবযুগের ইতিহাসে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা ব্রাহ্ম-সমাজের ধর্ম্মদ্রোহিতা এবং সমাজদ্রোহিতা হইতে। ধর্ম্ম এবং সমাজের বন্ধনই তখন মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে পীড়িত করিতেছিল। সুতরাং নবযুগের নূতন চিন্তা ও সাধনা সকলের আগে এই বন্ধনকেই ছেদন করিতে চাহিয়াছিল। বন্ধন-বেদনার অনুভব হইতেই মুক্তির বাসনা জাগ্রত হয়। রাষ্ট্রীয় জীবনে তখনও কোনও তীব্র বন্ধন-বেদনার অনুভূতি জন্মে নাই বলিয়া বাংলার নবযুগের ইতিহাসের প্রথম পর্ব্বাধ্যায়ে প্রকাশ্যভাবে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা আসে নাই। বরঞ্চ ইংরাজ আমাদিগের আধুনিক স্বাধীনতা এবং মানবতার আদর্শের দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরু হইয়াছিল বলিয়া ইংরাজের রাষ্ট্রীয় শাসন-বন্ধনকে আমরা আমাদিগের কল্যাণের সোপান বলিয়াই একরূপ বরণ

করিয়া লইয়াছিলাম। ইংরাজ শাসন দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াই আমরা ভাবিতাম যে আমরা নিরাপদে সমাজ এবং ধর্ম্মের শাসনকে তুচ্ছ করিতে পারিয়াছিলাম। হিন্দু রাজা থাকিলে এমন ভাবে আমরা ধর্ম্ম ও সমাজদ্রোহিতা করিতে পারিতাম না। ইংরাজের রাষ্ট্রীয় শাসন আমাদিগকে মনু ও পরাশরের ধর্ম্ম ও সমাজ শাসনের হাত হইতে মুক্তি দান করিয়াছিল। এই শাসনের ছায়াতলে থাকিয়াই আমরা ব্রাহ্মণেতর জাতি হইয়াও নির্ব্বিরোধে বেদাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অধিকার পাইয়াছিলাম। ইংরাজ দেশের রাজা হইয়াছিল বলিয়াই আমরা পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও আমাদিগের দায়াধিকার হইতে বঞ্চিত হই নাই। ইংরাজ রাজত্বের গুণেই ইংরাজী শিক্ষিত ব্রাহ্মণেতর জাতির লোকেরা ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের মধ্যেও আচার্য্য ও ধর্ম্মোপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।

ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বেও এরূপ হইয়াছিল, সত্য। মুসলমান শাসনাধীনেও ভারতের সর্ব্বত্র একটা প্রবল ধর্ম্ম ও সমাজবিপ্লব ঘটিয়াছিল। সেই বিপ্লবমুখে বহুল পরিমাণে মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ্য শাসন কোথাও বা নষ্ট এবং প্রায় সর্ব্বত্রই শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে সকল বিপ্লবে লোকের ধর্ম্মে এবং সমাজে এতটা ওলটপালট করিয়া দেয় নাই। যতটা করিতে পারিয়াছিল তাহাও বিধর্ম্মীর হাতে রাষ্ট্র-শাসন ন্যস্ত ছিল বলিয়া। আর মুসলমান অধিকারে ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লব ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু ইংরাজাধিকারের মতন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এতটা প্রতিষ্ঠা হইতে পারে নাই। মুসলমান-শাসন নিতান্তই স্বেচ্ছাতন্ত্র ছিল, বিধিতন্ত্র বা নিয়মতন্ত্র ছিল না। এই সকল কারণে ইংরাজ আমলের প্রথম অবস্থায় বিদেশীয় রাষ্ট্রীয় শাসনের বন্ধন-বেদনা তেমন তীব্র হইয়া উঠে নাই; জাগে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

(৩)

কিন্তু স্বাধীনতার প্রেরণা বা মুক্তির বাসনা মানুষের অন্তরে একবার জাগিলে তাহার সমগ্র চিত্ত ও চরিত্রকে অধিকার না করিয়া ছাড়ে না। যে একবার জীবনের কোনও বিভাগে সত্যকার মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছে, সে কোন বিষয়ে কোন প্রকারের বন্ধন সহিতে পারে না। এইজন্য নবযুগের বাংলায় ধর্ম্ম ও সমাজদ্রোহিতার আকারে যে মুক্তি-বাসনা প্রথমে আপনাকে সফল করিতে চাহিয়াছিল, অতি অল্পকালের মধ্যে তাহা আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনেও রাষ্ট্র-দ্রোহিতা জাগাইয়া তুলিল। ধর্ম্মে ও সমাজে স্বাধীন হইব, অথচ রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা বিজাতীয় প্রভুশক্তির অধীন হইয়া রহিব, ইহা সম্ভব নহে। [ইংরাজীনবীশ বাঙ্গালী ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয়ে আসিয়া প্রথমে সমাজ-ভয়কে জয় করিয়াছিলেন। সত্যের প্রেরণায়, শাস্ত্র ও সমাজ শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ইঁহারা রাষ্ট্রীয় শাসনের বন্ধন কাটিবার জন্য সহজেই বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইলেন।] এইরূপেই বাংলার নবযুগের স্বাধীনতার সংগ্রামে শাস্ত্রদ্রোহিতা ও সমাজদ্রোহিতায় রাষ্ট্রদ্রোহিতা জাগ্রত হয়।

ইংরাজী শিক্ষা ও য়ুরোপীয় সাধনা কেবল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শেরই প্রতিষ্ঠা করে নাই, আমাদিগের অন্তরে একটা নূতন স্বাজাত্যাভিমান বা স্বদেশহিতৈষিতা কিম্বা patriotismএর আদর্শও জাগাইয়া তুলে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ও আধুনিক মনুষ্য-সমাজের জ্ঞানলাভ করিয়া আমরা নিজেদের হীনতা বোধ করিতে আরম্ভ করিলাম। দুনিয়ার সম্মুখীন হইয়া দেখিলাম—

চীন, ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান

কেবল আমরাই এতবড় একটা প্রাচীন সভ্যতা ও সাধনার উত্তরাধিকারী হইয়াও পরাধীন ও হেয় হইয়া রহিয়াছি। জগতের স্বাধীন দেশের তুলনায় নিজেদের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা আমাদিগের অন্তরে এক অভিনব বেদনা জাগাইয়া তোলে। এই বেদনার ভিতর দিয়াই আমাদের আধুনিক স্বাদেশিকতা এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম হয়। আর বাংলার নবযুগের এই নূতন স্বাদেশিকতার সুতিকাগারে সুরেন্দ্রনাথ অন্যতম প্রধান ধাত্রীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

(৪)

সুরেন্দ্রনাথ আজ অগৌরবে আচ্ছন্ন হইয়া আছেন। কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমান অমর্য্যাদাতে কেবল বাংলার নহে সমগ্র ভারতের আধুনিক রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে, তাঁহায় পূর্ব্ব কীর্ত্তি কণা পরিমাণেও মুছিয়া যাইবে না। আমাদের এই স্বাদেশিকতা ও স্বাধীনতার আন্দোলনের অন্যতম আদিগুরু সুরেন্দ্রনাথ। প্রথম যৌবনে দেশের নব্যশিক্ষিত ও শিক্ষার্থী যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা জাগাইয়াছিলেন, তাহাই ঋজু কুটিল পথে পরিচালিত হইয়া আজিকার প্রবলতর স্বাদেশিকতা ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার গতিবেগের সৃষ্টি করিয়াছে। আজ দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সাধকেরা প্রবলপরাক্রান্ত বৃটিশ প্রভুশক্তিকে উপহাস করিয়া অম্লানবদনে মৃত্যুকে পর্য্যন্ত বরণ করিতেছেন। দলে দলে ইংরাজের শাসন-যন্ত্রকে বিকল করিয়া বা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য প্রকাশ্যভাবে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার সহচর এবং অনুচরেরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শুষ্ক মাটি কাটিয়া নূতন খাত প্রস্তুত করিয়া যে স্বাদেশিকতার পুণ্য প্রবাহ আনিয়াছিলেন, তাহা না আনিলে আজিকার এই প্রবল প্লাবন সম্ভব হইত না। এই

কথাটা এখন ভাল করিয়া মনে রাখা কর্ত্তব্য। সুরেন্দ্রনাথের প্রাচীন কীর্ত্তি তাঁহার অধুনাতন অপযশের দ্বারা নষ্ট হইবার নহে। কালপ্রভাবে একদিন সুরেন্দ্রনাথের অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব দেশের চিত্ত ও চরিত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কালপ্রভাবেই আবার তাঁহার সে পূর্ব্ব-গৌরব ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। "কালোহি বলবত্তর।" কাল আপনার কর্ম্ম করে, কত ভাঙ্গে, কত গড়ে। কিন্তু সর্ব্বদর্শী নিরপেক্ষ ইতিহাস একদিন যাহা গড়িয়া উঠে, তাহাকে ভুলে না; আবার যাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহাকেও অবিশ্বাসী কৃপণের মতন আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহে না; কিন্তু পরমার্থ দৃষ্টিতে ভাঙ্গা ও গড়া, উত্থান ও পতন, গৌরব ও অগৌরব উভয়ের সম্যক্ বিচার করিয়া উভয়কেই তাহাদের যথাযো[illegible]স্থানে রক্ষা করে। নিরপেক্ষ ইতিহাসের চক্ষে নবযুগের বাংলার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অভিব্যক্তিতে সুরেন্দ্রনাথের যে একটা অনন্যলব্ধ বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহা কখনও নষ্ট হইবার নহে। সাময়িক দলাদলির প্রেরণায় সমসাময়িক লোকেরা যাহা দেখিবে না বা দেখিতে পাইবে না, মানুষের ক্রিয়াকলাপের চিরন্তন সাক্ষী নিরপেক্ষ ইতিহাস সর্ব্বদাই তাহা দেখিবে এবং উদাসীন জনমণ্ডলের চক্ষে উজ্জ্বল করিয়া তাহা ধরিয়া রাখিবে।

(৫)

সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যান। তাঁহার পূর্ব্বে কেবল একজন মাত্র বাঙ্গালী এই উদ্দেশ্যে বিলাত গিয়াছিলেন। স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কেবল বাংলার নহে, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষেরই প্রথম দেশীয় সিভিলিয়ান হইয়া আসেন। সত্যেন্দ্রনাথের পরে বোধ হয় বোম্বাইয়ের শ্রীপদ বাবাজি ঠাকুর ইংরাজ সিভিল সার্ব্বিসে ভর্ত্তি হয়েন।

ইঁহার পরেই সুরেন্দ্রনাথ, রমেশ চন্দ্র দত্ত এবং বিহারীলাল গুপ্ত এই তিনজন বাঙ্গালী যুবক সিভিলিয়ান হইয়া আসেন। ইঁহারা তিন জনে একসঙ্গে বিলাত যাত্রা করেন। সুরেন্দ্রনাথ দেশে ফিরিয়া প্রথমে শ্রীহট্টে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ হয়েন। আমি তখন শ্রীহট্ট গভর্ণমেণ্ট স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। এখানেই সুরেন্দ্রনাথকে আমরা প্রথম দেখি। তখনকার দিনে দেশীয় সিভিলিয়নেরাও ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগের মতন স্বদেশের সমাজ হইতে দূরে থাকিতেন। ইঁহারা ইংরাজী পোষাক পরিতেন, ইংরাজী ধরণে চলাফেরা করিতেন, সকল বিষয়ে ইংরাজের অনুকরণ করিয়া নিজেদের পদ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইতেন। কিন্তু ইংরাজী পোষাক পরিলেই বাঙ্গালী ইংরাজ হইতে পারে না। নবীনচন্দ্র এইজন্য ইংরাজের পরিচ্ছদধারী, ইংরাজের অনুচিকীর্ষাপরায়ণ, ইংরাজী শিক্ষিত, বিলাত প্রত্যাগত বাঙ্গালীকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছিলেন ঃ—

"সিংহচর্ম্মে তুমি মেষ অল্পপ্রাণ!"

সুরেন্দ্রনাথ শ্রীহট্টে ইংরাজের কেবল অনুকরণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না; ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগের সঙ্গে সকল বিষয়ে আপনাকে সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। বিজিত বাঙ্গালীর এই স্পর্দ্ধা বিজেতা ইংরাজ রাজপুরুষদিগের সহ্য করা কঠিন হইল। সুরেন্দ্রনাথ একদিকে দেশীয় সমাজের সঙ্গে মিশিতে চাহিলেন না, আপনার অভিনব পদমদে বিভোর হইয়া তিনি স্বদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিতে চাহিলেন না, অন্যদিকে স্থানীয় ইংরাজ সমাজেও আপনার শিক্ষা ও পদের যোগ্য আসন পাইলেন না। তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা ইংরাজ রাজপুরুষদিগের অসূয়াই জাগাইয়া তুলিল। সাদার-ল্যাণ্ড তখন শ্রীহট্টের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। আমি তখন বালক বলিলেও হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিদ্যাবুদ্ধির বিচার করিবার অধিকার জন্মে

নাই। তবে বালক হইলেও তাঁহার বিশাল বপু আমাদিগের অন্তরে যে "হাস্য-অদ্ভুত-করুণ-রুদ্র" রসের উদ্রেক করিত সে কথা এখনও মনে আছে। শুনিয়াছিলাম তাঁহার জন্য এজলাসে নূতন আসন প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের সংকীর্ণায়তন আসন তাঁহার বিশাল বপুকে ধারণ করিতে পারে নাই। একটা আস্ত বিলাতী কুমড়া না হইলে নাকি তাঁহার উদরপূর্ত্তি হইত না। সাদারল্যাণ্ড সাহেবের সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই সুরেন্দ্রনাথের খটাখটি বাধিয়া যায়। এই অপেক্ষাকৃত অপরিণতবয়স্ক বাঙ্গালী সিভিলিয়ানের ধৃষ্টতা ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটের অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রমে ইনি সুরেন্দ্রনাথের ভ্রম ত্রুটি খুঁজিতে আরম্ভ করেন। সুরেন্দ্রনাথের এজলাসের বাঙ্গালী আমলাদের মধ্যে কেহ কেহ ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুগ্রহ লাভের লোভে তাঁহার বিরুদ্ধে গোপনে সত্যমিথ্যা নানাপ্রকারের অভিযোগ পেশ করিতে লাগিল। এইরূপে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটা বেশ ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিলেন। ক্রমে সুরেন্দ্রনাথের এজলাসের নথীতে দু'একটা গুরুতর ভুল বাহির হইয়া পড়িল। একটা মামলায় ফরিয়াদী ও তাহার সাক্ষীরা আদালতে হাজির থাকা সত্ত্বেও মামলা তাহারা হাজির নাই বলিয়া খারিজ হইয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ মোকদ্দমার নথীতে এই কথা লিখিয়া দেন। যতদূর মনে পড়ে ইহাই তাঁহার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল। এই অভিযোগেই তাঁহার কর্ম্ম যায়। একদিকে অভিযোগ গুরু সন্দেহ নাই। কোনও ধর্ম্মাধিকরণে ধর্ম্মাবতার বিচারকের পক্ষে এরূপ মিথ্যা কথা নথীভুক্ত করা কিছুতে মার্জ্জনীয় নহে। কিন্তু এ সকল বিষয়ে প্রায় সকল আদালতেই বিচারকদিগকে তাঁহাদের পেষকারের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। পেষকারের উপরে সর্ব্বদাই চোখ রাখিতে হয় ইহাও সত্য। কিন্তু বিচারক যতই কেন সতর্ক হইয়া চলুন না, পেষকার যে

মাঝে মাঝে তাঁহার চক্ষুতে ধূলি দিয়া তাঁহার দ্বারা এ সকল কাজ করাইতে পারে না, এমনও বলা যায় না। সুরেন্দ্রনাথ যে জানিয়া শুনিয়া এরূপ করিয়াছিলেন, এ কথা তখনও কেহ কহে নাই। এদেশের লোকে কোনওদিনই তাহা বিশ্বাসও করে নাই। ঘুষ খাইয়া জানিয়া শুনিয়া কোনও বিচারকের পক্ষে এইরূপ মিথ্যা নথী প্রস্তুত করা অসম্ভব; সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার শত্রুরাও কোনওদিন এরূপ ইঙ্গিত করিতে সাহস পান নাই। তাঁহার পেষকারও এইজন্য দণ্ডিত হইয়াছিল। সুতরাং পেষকারের দোষেই যে এটা হইয়াছিল, গভর্ণমেণ্টও ইহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। এ সত্ত্বেও এই সামান্য অনবধানতার জন্য সুরেন্দ্রনাথ দুরপনেয় কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া রাজকর্ম্ম হইতে অপসৃত হয়েন। ইহা তাঁহার নিজের পক্ষে এবং সমগ্র দেশের পক্ষে ভালই হইয়াছিল। প্রথমতঃ এই ঘা না পাইলে সুরেন্দ্রনাথের বিদেশের মোহ কাটিত কি না সন্দেহ। তিনি সাহেব জিং রাজকর্ম্মে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া বিদেশী আমলা তন্ত্রের অঙ্গীভূত থাকিয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কেবল রাজসেবাই করিয়া যাইতেন, দেশসেবার অবসর ও মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিতেন না।

(৬)

কর্ম্মচ্যুত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ বিলাতে আপীল করিতে যান। বিলাত হইতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া বোধ হয় ১৮৭৫ সালে দেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার পিতৃবন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয় অল্পদিন পূর্ব্বে সাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিটিউসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বিলাত হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া এই ইন্‌স্টিটিউসনে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়েন। এখান হইতেই সুরেন্দ্রনাথের নবজীবন আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে তিনি দেশ-

সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া আপনার আলোকসামান্য বাগ্মিতার প্রভাবে দেশের শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী নবযুবক সমাজে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার নূতন প্রেরণা সঞ্চার করিয়া আমাদিগের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় সাধনার উদ্বোধন করেন। নবযুগের ইতিহাসে এই সূত্রেই সুরেন্দ্রনাথ আপনার অনন্য-প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

ষোড়শ কথা

সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন

বাংলার নবযুগের ইতিহাসে সুরেন্দ্রনাথ যে অনন্যলব্ধ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন, আনন্দমোহন বসু মহাশয় তাহা পান নাই, এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু আনন্দমোহন বসুর সাহচর্য্য না পাইলে সুরেন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে যে কাজটা করিয়াছিলেন, কিছুতেই তাহা করিতে পারিতেন না, ইহাও অতি সত্য। আনন্দমোহন একটা সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার আদর্শকে ধরিয়া আপনার দেশের আধুনিক ধর্ম্মকর্ম্মকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পাইয়া আনন্দমোহন বোধ হয় ১৮৭০ কি ১৮৭১ ইংরাজীতে বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে নবপ্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নিকটে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। সেকালের ব্রাহ্মেরা অতিশয় সত্যবাদী এবং সংযতেন্দ্রিয় ছিলেন। আনন্দমোহনের চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেকালে যাঁহারা বিলাত যাইতেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই বিলাতী ভোগবিলাসের স্রোতে হাল ছাড়িয়া ঝাপাইয়া পড়িতেন। কিন্তু আনন্দমোহন সম্বন্ধে কেহ কোন দিন এসকল বিষয়ে কণাদপি পরিমাণেও অসংযমের অভিযোগ আনিতে পারে নাই। আনন্দমোহন বিলাত যাইয়া কখন সুরা স্পর্শ করেন নাই। এমন কি, তামাকু পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিয়া চলিয়াছিলেন। আনন্দমোহনের কঠোর ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৌতুক-ছলে

তাঁহাকে "সাধু আনন্দমোহন" বা Saint Ananda Mohan বলিয়া ডাকিতেন। আনন্দমোহন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া 'র‍্যাংলার' হয়েন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন ভারতবাসী এই বৈশিষ্ট্য লাভ করেন নাই। যেমন পড়াশুনায়, সেইরূপ আপনার বিশুদ্ধ চরিত্র-গুণেও আনন্দমোহন সেকালের কেম্ব্রিজ সমাজে একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। আনন্দমোহন কেম্ব্রিজ ছাড়িয়া আসিবার প্রায় পঁচিশ বছর পরেও কেম্ব্রিজে যাইয়া লোকমুখে তাঁহার কথা শুনিয়াছি। কেম্ব্রিজ তখনও তাঁহার স্মৃতি একেবারে ভুলিয়া যায় নাই। তিনি যে ঘরটাতে থাকিতেন, পঁচিশ ছাব্বিশ বছর পূর্ব্বেও (১৮৯৯-১৯০০) তাঁহার কলেজের গৃহরক্ষীরা (caretakers) সে ঘরখানিকে আনন্দমোহনের ঘর বলিয়া বাঙ্গালী দর্শকদিগকে দেখাইয়া দিত। একদিকে কেম্ব্রিজের সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়া অন্যদিকে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আনন্দমোহন বোধ হয় ১৮৭৫ কি '৭৬ ইংরাজীতে দেশে ফিরিয়া আসেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এণ্ট্রান্স হইতে এম, এ, পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই যতদূর মনে পড়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া তিনি বিলাত যান। সেখানেও অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। এই কারণে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি দেশময় ব্যাপিয়া পড়ে। কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধি অপেক্ষা তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্রের খ্যাতিটা আরও বেশী ছিল। সেকালের কোন বিলাত-ফেরত বাঙ্গালী আনন্দমোহনের মতন দেশের লোকের এমন অকৃত্রিম শ্রদ্ধা লাভ করেন নাই; সুরেন্দ্রনাথও নহেন, অন্য কেহও নহেন। বিশেষতঃ ইংরাজ আমলা-তন্ত্র সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রে যে কালিমা মাখাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা দেশের লোকের চক্ষে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় নাই। তখনও লোকে প্রাণ খুলিয়া

সুরেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতে পারে নাই। এ অবস্থায় সুরেন্দ্র-নাথের পক্ষে কেবল অলোকসামান্য বাগ্মিতা প্রভাবে লোকনায়কত্ব লাভ করা সম্ভব ছিল না। আনন্দমোহনের বিশুদ্ধ চরিত্রের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা মিলিত হইয়াই বাংলার নবযুগের ইতিহাসে আমাদের আধুনিক রাষ্ট্র-কর্ম্মের সূচনা করে। একা সুরেন্দ্রনাথ দেশে আধুনিক রাষ্ট্রীয় আদর্শকে এমন ভাবে জাগাইয়া তুলিতে পারিতেন না। আনন্দমোহনের পক্ষেও একেলা এ কাজটা করা অসাধ্য ছিল। ইঁহারা পরস্পরকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের আধুনিক গণতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সাধনার প্রতিষ্ঠা করেন।

(২)

আনন্দমোহনের স্বাধীনতার আদর্শ সুরেন্দ্রনাথের আদর্শ অপেক্ষা বহুল পরিমাণে পূর্ণতর ছিল। আনন্দমোহনের মধ্যে যে অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতি ছিল, সুরেন্দ্রনাথের তাহা ছিল না। আনন্দমোহনের idealism কিম্বা আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতি অনুরাগ সুরেন্দ্রনাথের চিত্তকে কখনও অধিকার করে নাই, স্পর্শ করিয়াছিল কি না সন্দেহ। সুরেন্দ্রনাথ সর্ব্বদাই সুবিধাবাদী ছিলেন। কোন কদর্থে কথাটা ব্যবহার করিতেছি না। ইংরাজীতে যাহাকে expediency কহে, এখানে আমি তাহাকেই সুবিধাবাদ কহিতেছি। এই expediency বা সুবিধাবাদই পলিটিশিয়ান বা রাষ্ট্রকর্ম্মীদের জীবনের মূলসূত্র। রাষ্ট্রকর্ম্মীরা কোন সনাতন আদর্শের বড় ধার ধারেন না। আসন্ন কাজটা কি করিয়া হাসিল হইবে তাহারই দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া চলেন। এই কারণে আশু ফললিপ্সু রাষ্ট্র-কর্ম্মীদিগের মধ্যে কোন প্রকারের সনাতন আদর্শের প্রতি বিশেষ অনুরাগ বা নিষ্ঠা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সনাতন

আদর্শের প্রতি অনুরাগ এবং নিষ্ঠাকেই ইংরাজীতে idealism কহে। আর এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব যে সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে কোন দিন এই idealism ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। সুরেন্দ্রনাথ আপনার অলৌকিক বাগ্মিতা প্রভাবে দেশের কোমলমতি যুবক দলকে মাতাইয়াছিলেন। কিন্তু বাংলার বৈষ্ণব ইতিহাসে যেমন শোনা যায়—

'নিমাই আপনি পড়িয়া বলে সামালিও ভাই'

—সুরেন্দ্রনাথ কোনদিন এমনিভাবে আপনি পড়িয়া অপরকে সামলাইতে কহেন নাই। তিনি দেশকে নাচাইয়াছেন, নিজে নাচেন নাই। দেশকে স্বাধীনতা-যজ্ঞে ঝাঁপাইয়া পড়িতে প্রণোদিত করিয়াছেন, নিজে ইষ্টানিষ্ট বিচার-বিবর্জ্জিত হইয়া এ আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়েন নাই। তাঁহার নিন্দা করিবার জন্য এ কথা কহিতেছি না। বিধাতা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ ফললিপ্সু রাষ্ট্রকর্ম্মী করিয়াই গড়িয়াছিলেন, ভাবুক অপ্রত্যক্ষ আদর্শের অনুরাগী করিয়া গড়েন নাই। সুরেন্দ্রনাথ যদি রাষ্ট্রকর্ম্মী না হইয়া ফলাফলবিচার-বিরহিত ভাবুক হইতেন, তাহা হইলে তিনি যে কাজটা করিয়াছেন, তাহা করিতে পারিতেন কি না তাহা কে বলিবে? অন্য দিকে বাঙ্গালী জাতটা চিরদিনই ভাবুকের জাত। আদর্শের সাড়া না পাইলে বাঙ্গালী কোন দিন আত্মহারা হইয়া কর্ম্মের পথে ধাবিত হয় নাই। ভারতবর্ষের অন্য জাতিরা প্রত্যক্ষবাদী বা practical, এ কথা সকলেই জানেন ও মানেন। বাঙ্গালীর মতন তাঁরা সূক্ষ্ম কাটিতে জানেন না; নব্যন্যায়েরও প্রতিষ্ঠা করেন নাই। বাঙ্গালীর ন্যায় তাঁহারা ভাবপ্রবণ নন। বাংলার ভক্তিবাদও ভারতের অন্য কোন প্রদেশে ফুটিয়া উঠে নাই। এই ভাবপ্রবণতা বা idealism বাঙ্গালীর হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়া আছে। সুতরাং আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত

বাঙ্গালীও কেবল সুরেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ফলপ্রসু রাষ্ট্রকর্ম্মের আহ্বানে মাতিয়া উঠিতেন না। সুরেন্দ্রনাথের যাহা ছিল না, আনন্দমোহনের তাহা ছিল। আনন্দমোহনের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের খ্যাতি ছিল; আনন্দ-মোহনের মধ্যে একটা সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার আদর্শের প্রেরণা ছিল। আনন্দমোহনের আর কিছু ত্রুটী-দুর্ব্বলতা থাকুক না কেন, একটা ভাবুকতা বা idealism ছিল, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আর আনন্দমোহনের এই idealismএর সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের practical politics এবং অসাধারণ বাগ্মিতা মিলিত হইয়াই আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সূচনা করে। বাংলার নবযুগের ইতিহাসের এই অধ্যায়ে সুরেন্দ্রনাথ এবং আনন্দমোহনকে পৃথক করা যায় না।

(৩)

সিভিল সার্ব্বিস কর্ম্মচ্যুত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ ভারত সরকারের এই অবিচারের বিরুদ্ধে আপীল করিবার জন্য বিলাত গমন করেন। তাঁর প্রতি যে গুরুতর অবিচার হইয়াছিল, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইলেও ইহার দ্বারা তাঁহার অনবধানতাই প্রমাণিত হয়, তাঁর অসাধুতা বা দোষাবহ অক্ষমতা প্রমাণিত হয় না। এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃত অপরাধ তাঁহার জাত ও বর্ণ। ইংরাজ সিভিলিয়ান এরূপ অপরাধে কখনই এমনভাবে দণ্ডিত হইতেন না। হাতে হাতে অল্পদিন মধ্যেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথের পদচ্যুতির অল্পদিন মধ্যেই রংপুরের ইংরাজ সিভিলিয়ান জজের বিরুদ্ধে ইহা অপেক্ষা শতগুণে গুরুতর অভিযোগ আসে। এই জজ, সাহেবের নাম, যতটা মনে পড়ে, বোধ হয় লেভিন ছিল। ইনি প্রায়ই আপনার আদালতের পেষকারকে দিয়া মোকদ্দমার রায়

লিখাইয়া লইতেন। ইহার অন্তরালে কেবল জজ সাহেবের আলস্য এবং আইন-কানুন সম্বন্ধে অমার্জনীয় অনভিজ্ঞতা ব্যতীত আরও কিছু ছিল কিনা বলা কঠিন। কিন্তু তিনি যে নিজের হাতে সকল মোকদ্দমার রায় লিখিতেন না, একথাটা প্রমাণ হইয়াছিল। কিন্তু এই গুরু অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াও এই ইংরাজ জজের যে দণ্ড হয় তাহা সুরেন্দ্রনাথের প্রতি যে দণ্ড বিহিত হইয়াছিল তাহার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। সুরেন্দ্রনাথকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া ইংরাজ সরকার মাসিক ৫০৲ পেনসন বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু লেভিন সাহেবের জজিয়তি যাওয়া ছাড়া একেবারে পদচ্যুতি হইয়াছিল কিনা মনে পড়ে না। অন্ততঃ হইয়া থাকিলেও তিনি যে মোটা পেনসন লইয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হন, একথা ঠিক। লেভিন সাহেবের মোকদ্দমায় সুরেন্দ্রনাথের প্রতি অবিচার যে কতটা গুরুতর হইয়াছিল ইহা বুঝা যায়। এরূপ গুরুতর অবিচার এদেশের ইংরাজ আমলাতন্ত্রই করিতে পারেন, তখন আমাদের এই সংস্কার জন্মিয়াছিল। কিন্তু আলেহী বিলাতী ইংরাজেরা এরূপ অবিচারের সমর্থন করিবেন, ইংরাজীনবীশ বাঙ্গালী সহজে ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। ইংরাজের উপরে এতটা শ্রদ্ধা তখনও ছিল বলিয়াই সুরেন্দ্রনাথ অনেক অর্থব্যয় করিয়া বিলাতে আপীল করিতে যান। সে আপীল যখন নামঞ্জুর হইল, তখন সুরেন্দ্রনাথের এবং তাঁহার স্বদেশবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্তরে ইংরাজ-চরিত্রের প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল তাহা একেবারেই নষ্ট হইয়া গেল। যে সুরেন্দ্রনাথ ইংরাজকে জীবনের আদর্শ করিয়া প্রথম যৌবনে ইংরাজ সাজিয়া জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই সুরেন্দ্রনাথই এখন এক অভিনব স্বাজাত্যাভিমানের প্রেরণায় দেশবাসীকে দেশচর্য্যা-ব্রতে দীক্ষিত করিবার জন্য

বদ্ধপরিকর হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ বোধ হয় আনন্দমোহনের এক সঙ্গেই এবারে বিফলমনোরথ হইয়া বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন। অন্ততঃ এক সঙ্গে না আসিলেও অল্পদিন অগ্রপশ্চাৎ দু'জনে আসিয়া কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান ইন্স্‌টিটিউসনে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন, এবং আনন্দমোহন কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করিতে আরম্ভ করেন।

(৪)

আনন্দমোহন কলিকাতা এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, আইন-ব্যবসায়ে সে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। সে শক্তি তাঁহার ছিল কিনা বলা কঠিন। তবে যেদিন সর্ব্ব প্রথমে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে একটা কঠিন মামলায় সওয়াল-জবাব করিতে দণ্ডায়মান হন, সেদিন জজ এবং এটর্নি সকলেই তাঁর বুদ্ধিমত্তা, বাক্‌পটুতা এবং ব্যবহারশাস্ত্র-কুশলতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন; এবং কেহ কেহ এরূপও ভাবিয়াছিলেন যে অনতিবিলম্বে আনন্দমোহন কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার মহলে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবেন। আনন্দমোহন তাহা করিতে পারেন নাই। আর ইহার একটা প্রধান কারণ এই যে আনন্দমোহন কোন দিন ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়কে জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য একরূপ আপদ্‌ধর্ম্মরূপেই তিনি আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরের ঝোঁক ছিল লোকসেবা এবং দেশসেবার প্রতি। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আনন্দমোহনকে 'সাধু আনন্দমোহন' বলিয়া ডাকিতেন; পাদ্রী আনন্দমোহন বলিলে বোধ হয় তাঁহার চরিত্রের

মূল সূত্রটা ভাল করিয়া প্রকাশিত হইত। আনন্দমোহন নিজে অনন্যকর্ম্মা হইয়া ধর্ম্মপ্রচার ব্রত গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু অনেক-বার তিনি বুঝি ব্যারিষ্টারি ছাড়িয়া ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন, তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা এরূপ আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এ আশা পূর্ণ না হইলেও একথা সত্য যে আনন্দমোহন কোন দিন আইন ব্যবসায়ে আপনার সমুদায় সময় ও শক্তি নিয়োগ করেন নাই। যতটা সম্ভব স্বল্প সময় ও শক্তি ব্যয় করিয়া যতটা বেশী অর্থ উপার্জ্জন করা যাইতে পারে সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। এইরূপে জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট সময় ও শক্তি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে এবং লোকসেবাতে উৎসর্গ করিবার জন্য আনন্দমোহন সর্ব্বদাই লালায়িত ছিলেন। ব্যারিষ্টারি জমাইতে হইলে হাইকোর্টকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া থাকিতে হয়। আসলি মামলায় (original sideএ) পশার জমাইতে না পারিলে কলিকাতার হাইকোর্টে বড় ব্যারিষ্টার হওয়া যায় না। এই পশার জমাইতে হইলে যেভাবে যতটা পরিশ্রম করিয়া নিজের ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে হয়, আনন্দমোহনের সে ধৈর্য্য ও শ্রমসহিষ্ণুতা ছিল না। আর ছিল না এই জন্য যে নিজের ব্যবসায়ের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগও ছিল না। আইনের সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিষ্কাসনে তিনি বোধ হয় কোন দিন গভীর আনন্দ বোধ করেন নাই। তাঁর জীবনের আনন্দের উৎস ছিল স্বাধীনতার সাধনাতে। পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে —সর্ব্বত্র সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার আদর্শের প্রতিষ্ঠা দেখিবার জন্য আনন্দ-মোহনের অন্তর আযৌবন লালায়িত ছিল। এই স্বাধীনতার অদের্শের প্রেরণাতেই তিনি সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হইয়া পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাংলার ইংরাজী নবীশদিগের নূতন ও উদার রাষ্ট্রকর্ম্মের দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু হইয়া দণ্ডায়মান হন।

(৫)

আনন্দমোহন বিলাত হইতে আসিবার সময় বোম্বাই সহরের শিক্ষিত ও শিক্ষার্থীরা মিলিত হইয়া কি ভাবে দেশে একটা নূতন শক্তি জাগাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, ইহা দেখিয়া আসেন। বোম্বাইয়ে তখন একটা নূতন ছাত্র মণ্ডলী—Student Movement—গড়িয়া উঠিতেছিল। ঠিক বলিতে পারিলাম না, কিন্তু আমার মনে হয় যে এই নূতন আন্দোলন হইতেই ক্রমে ক্রমে দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমাজের বা Deccan Education Society'র জন্ম হয়। এই সমাজই দাক্ষিণাত্যে আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা করেন। লোকমান্য তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতি দক্ষিণাত্যের ভারত-প্রসিদ্ধ লোকনায়কেরা এই শিক্ষা-সমাজ হইতেই নিজেদের দেশসেবা-ব্রতে দীক্ষালাভ করেন। রাণাডে, চিপলুঙ্কর, নামযোশী প্রভৃতি বোম্বাইয়ের এই ছাত্রমণ্ডলীর সঙ্গে পরোক্ষভাবে কিম্বা অপরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আনন্দমোহন বিলাত হইতে দেশে ফিরিবার পথে বোম্বাইয়ের এই ছাত্রমণ্ডলীর কিছু কিছু পরিচয় লাভ করিয়া আসেন। কলিকাতায় আসিয়াই সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিয়া তিনি এখানে একটা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে চাহেন। এইভাবে ১৮৭৫ সালের শেষাশেষি কিম্বা '৭৬ সালের প্রথমে কলিকাতা ছাত্রমণ্ডলীর—Calcutta Students' Associationএর প্রতিষ্ঠা হয়। এই ছাত্রমণ্ডলীকে আশ্রয় করিয়াই সুরেন্দ্রনাথ এবং আনন্দমোহন উভয়েই নিজেদের নূতন রাষ্ট্র-কর্ম্মকে দেশের মধ্যে গড়িয়া তুলেন।

কলিকাতার ছাত্রমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন আনন্দমোহন, সহকারী সভাপতি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ; আর প্রথম সম্পাদক ছিলেন নন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়। নন্দকৃষ্ণ বসু সে সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

উজ্জ্বলতম রত্ন ছিলেন। বোধ হয় আনন্দমোহনের মতন তিনিও প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া এম, এ, পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষাতেই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ছাত্র-মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাকালে কিম্বা তাহার অল্পদিন পরে নন্দকৃষ্ণ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। কলিকাতার তদানীন্তন ছাত্রমণ্ডলে নন্দ-কৃষ্ণের অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা ছিল। ছাত্রজীবন তখনও সঙ্ঘবদ্ধ হয় নাই; নতুবা নন্দকৃষ্ণ সমসাময়িক শিক্ষার্থী যুবক-মণ্ডলীর নায়করূপেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন। সুরেন্দ্রনাথ এবং আনন্দমোহন তাঁহাদের নূতন কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান গড়িতে যাইয়া নন্দকৃষ্ণকে এই ছাত্রমণ্ডলীর সম্পাদকের পদে বরণ করেন। এই কলিকাতা ছাত্রমণ্ডলীকে অবলম্বন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ যেমন সেকালের শিক্ষানবীশ বাঙ্গালীদিগের রাষ্ট্রীয় জীবন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেইরূপ এই ছাত্রমণ্ডলীই সুরেন্দ্রনাথের এবং আনন্দমোহনের রাষ্ট্রনায়কত্বও গড়িয়া তুলিয়াছিল।

(৬)

এই কলিকাতা ছাত্রমণ্ডলীর বা Students' Association-এর রঙ্গমঞ্চেই সর্ব্বপ্রথমে সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ বাগ্মীপ্রতিভা প্রকাশিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু স্কুলের একটা গ্যালারী ছিল, এখন সেটা আছে কিনা জানি না। বর্ত্তমান সংস্কৃত কলেজের পশ্চিমের ঘরে এই গ্যালারিটা ছিল। এখানেই কলিকাতা Students' Association-এর সভা হইত। তখনও সরকারী স্কুল কলেজে রাষ্ট্রনীতির আলোচনা বন্ধ হয় নাই। এই রঙ্গমঞ্চেই সুরেন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রথমে আপনার অলোকসামান্য বাগ্‌বিভূতি বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রথম বক্তৃতার কথা এখনও মনে আছে। বিষয় ছিল— "Rise of the Sikh Power in India"; ইহার পূর্ব্বে ইংরাজী-

নবীশ বাঙ্গালী রাষ্ট্রীয় বিষয়ে এমন বক্তৃতা শুনে নাই। আজ "শিখের বলিদানের" কাহিনী বাংলার অন্তঃপুরেও প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের শিক্ষিত লোকেরাও স্বদেশের আধুনিক ইতিহাসে স্বাধীনতার প্রেরণা অনুভব করেন নাই। রঞ্জিৎ সিংহের নাম জানা থাকিলেও, তেগ বাহাদুর ও তাঁহার—শির দিয়া শীর নেহি দিয়া—অর্থাৎ মাথা দিলাম বটে ধর্ম্ম দিলাম না—এই অসাধারণ ত্যাগের কথা কেহই প্রায় জানিতেন না বলিলেও হয়। গুরু গোবিন্দের নাম তখন আমাদের মধ্যে অপরিজ্ঞাতই ছিল। সুরেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথমে শিখ ইতিহাসের প্রাণোন্মাদিনী স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী আমাদের নিকটে উপস্থিত করেন। তাঁহার এই প্রথম বক্তৃতাকালে কলিকাতার গোলদিঘীর চারিদিকে ঘন ঘন করতালি ধ্বনিতে বহিরাকাশে যেমন একটা ঝড় উঠিয়াছিল, সেইরূপ কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমণ্ডলীর অন্তরেও একটা অভূতপূর্ব্ব ভাবের বন্যা ছুটিয়াছিল।

কহিয়াছি যে সাহিত্যের মধ্য দিয়া, নাট্যকলা ও রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে ও ইংরাজের শিক্ষা দীক্ষার ফলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নামে গতানুগতিক ধর্ম্মদ্রোহিতা এবং সমাজদ্রোহিতার ভিতর দিয়া নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একটা অভিনব স্বাধীনতার প্রেরণা এবং স্বাজাত্যাভিমান জাগিয়া উঠিতেছিল, সুরেন্দ্রনাথ তাহাকেই রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে ফুটাইয়া তুলেন, প্রাচীনের প্রেরণাকে অধুনাতন রাষ্ট্রীয় জীবনে জাগাইয়া তুলেন। সত্যেন্দ্রনাথ 'ভারতের জয়' গাহিতে যাইয়া পৌরাণিকী কীর্ত্তি কাহিনীর আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাহাতে নূতন স্বাদেশিকতা ভাবাঙ্গে মাত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল। কল্পনাই তখন আমাদের স্বদেশসেবার আশ্রয় ছিল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণার্জ্জুন প্রভৃতি স্মরণাতীত অতীতের প্রতিধ্বনি মাত্র আনিতেন। কিন্তু

ইদানীন্তন কালেও যে ভারতে অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ভারত মহাকাব্যের আদর্শ যে আধুনিক ইতিহাসেও ফুটিয়া উঠিয়াছিল, একথা অনেকেই জানিতেন না। সুরেন্দ্রনাথের এই প্রথম বক্তৃতা আমাদের কল্পনাকে বাস্তব রাজ্যে আনিয়া ফেলিল। ইংরাজ শক্তি যে অপরাজেয়, শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে এই ধারণাই জন্মিয়াছিল। ইংরাজ অনামিকা সঞ্চালনে ভারতবর্ষে আপনার অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভু-শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সেকালের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকের মনে এই ধারণাই ছিল; শিখের শৌর্য্য-বীর্য্যের নিকটে ইংরাজের শৌর্য্য-বীর্য্য যে বারবার পরাভব স্বীকার করিয়াছে, একথা ভাল করিয়া আমরা জানিতাম না। ইংরাজের ইতিহাসে যেখানে ইংরাজ বেদম হারিয়া গিয়াছে তাহার কথা জয়পরাজয় ঠিক হয় নাই এই ভাবেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং শিখের শক্তি যে কত দুর্দ্ধর্ষ ছিল, একথা আমরা ভাল করিয়া জানিতাম না। সুরেন্দ্রনাথ নিজে মৌলিক গবেষণার সাহায্যে এসকল তথ্যে পৌঁছেন নাই, ইহা সত্য। ম্যালকলম প্রভৃতি ইংরাজ ঐতিহাসিকেরাই এসকল কথা বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা সেকালে স্কুল-কলেজে ভারতের যে ইতিহাস পড়িতাম তাহাতে এসকল সাংঘাতিক সত্যের স্পষ্ট উল্লেখ ছিল না। এই জন্য সুরেন্দ্রনাথের "Rise of the Sikh Power" বিষয়ক বক্তৃতা যুগপৎ আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দেয় এবং স্বাজাত্যাভিমানকে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করে। সুরেন্দ্রনাথের এই বক্তৃতা বাংলার নবযুগের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। সেই দিন হইতেই নবযুগের বাংলার ইতিহাসে নূতন রাষ্ট্রকর্ম্মের এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম হয়।

(৭)

সুরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে আমাদের নূতন স্বদেশাভিমান, কহিয়াছি,

প্রাচীনের কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। মহাভারতই আমাদিগের প্রাচীন শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী দ্বারা আমরাও যে দুনিয়ায় একদিন একটা বড় জাতি বা nation ছিলাম এই ভাবটা আমাদের ভিতরে জাগাইয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথের—

গাও ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়
কি ভয়, কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

ও অন্যান্য সঙ্গীত ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অর্জ্জুন প্রভৃতির অলোকসামান্য ক্ষাত্রবীর্য্যের কীর্ত্তি গাহিয়া আমাদিগের স্বদেশাভিমানকে জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। রঙ্গলাল রাজপুত ইতিহাসের বীরকীর্ত্তি গাঁথিয়া আমাদিগের নূতন স্বদেশ-প্রেমকে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র আকারে ইঙ্গিতে আমাদের বর্ত্তমান হীনতার ছবি ফুটাইয়া তুলিয়া অন্যদিকে আমাদিগের এই নূতন দেশপ্রীতিকে জাগাইয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহারা কেহই খোলাখুলিভাবে প্রামাণ্য ইতিহাসের ভিত্তির উপরে দেশমাতৃকার মন্দির গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন নাই। এই কাজটা সুরেন্দ্রনাথই প্রথমে আরম্ভ করেন এবং শিখ খালসার উৎপত্তি ও অভ্যুত্থানের কাহিনী বিবৃত করিয়া ভারতের ক্ষাত্রবীর্য্য যে ইদানীং কালেও অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগে এই সিদ্ধান্ত আমাদিগের মধ্যে প্রচার করেন। গুরু তেগ বাহাদুর এবং গুরু গোবিন্দের কথা প্রাচীন না হইলেও পুরাতন বটে। কিন্তু চিলিয়নওয়ালা ও গুজরাটের যুদ্ধ এই সেইদিন হইয়াছিল বলিলেও চলে। এই সকল লড়াই প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ প্রভু-শক্তির সঙ্গেই হইয়াছিল। ভারত-বিজয়ী ইংরাজকে মুষ্টিমেয় শিখ-সেনা কিরূপে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, শিখের ইতিহাসে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। স্কুল-পাঠ্য লেথ্‌ব্রিজ সাহেবের ইতিহাসে শিখদের সঙ্গে ইংরাজের যে সকল লড়াই হইয়াছিল, তাহার কথা

আমরা পড়িয়াছিলাম বটে। শিখ খালসার উৎপত্তির বিবরণও মোটামুটি জানা ছিল। কিন্তু তাহার অন্তরালে যে কত বড় স্বজাতি-বাৎসল্যের প্রতিষ্ঠা ছিল, একথা ইংরাজ লেখক নিজেও বোধ হয় জানিতেন না, অথবা জানিলেও আমাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই। আর এ কথা পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে আধুনিক কালে শিখে ইংরাজে যে লড়াই হইয়াছিল, তাহার কথা বলিতে যাইয়া কখনও ইংরাজের পরাভব স্বীকার করেন নাই। অথচ সত্যদর্শী ও সত্যবক্তা ইংরাজ ঐতিহাসিক যে কেহ ছিলেন না, তাহা নহে। সুরেন্দ্রনাথও গুরুমুখী শিখিয়া শিখদের নথিপত্র হইতে ভারতে শিখ-শক্তির অভ্যুদয়ের কাহিনী সংগ্রহ করেন নাই। ম্যালকলমের শিখ-শক্তির অভ্যুদয়—Rise of the Sikh Power in India—গ্রন্থ অবলম্বনেই সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতার শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী যুবক-মণ্ডলীর নিকটে শিখ-ইতিহাসের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বাক্‌বৈভবের দ্বারা অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন।

যতদূর মনে পড়ে ইহার অল্পদিন পরে ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির বিদ্যালয়-গৃহে (L.M.S. Institution) সুরেন্দ্রনাথ আমাদের এই বাংলা দেশে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যে সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংস্কার আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করেন, তাহার কথা আমাদের নিকটে প্রচার করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ও সাধনার তত্ত্বাঙ্গের, ভাবাঙ্গের এবং ভজনাঙ্গের কথাই আমরা আজিকালি শ্রদ্ধা সহকারে আলোচনা করিয়া থাকি। কিন্তু শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় পন্থার ভিতরে যে একটা অসাধারণ স্বাধীনতা ও মানবতার প্রেরণা আছে, ইহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করি না। মহাপ্রভুর আবির্ভাব কালে তান্ত্রিক সাধনাই

বাংলার হিন্দু সমাজকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল। এই তান্ত্রিক সাধনাতেও একদিক দিয়া একটা জাতি-বর্ণের অতীত মানবতার আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল। "প্রবর্ত্তে ভৈরবী-চক্রে" সর্ব্ববর্ণ দ্বিজোত্তম এই সূত্রে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এ সত্বেও অত্যাশ্রমী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী এবং পরমহংস সম্প্রদায় ব্যতীত তান্ত্রিক সাধনাতে সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব নিরতিশয় প্রবল ছিল। ভৈরবী-চক্র অতিশয় নিগূঢ় অন্তরঙ্গ সাধনার একটা বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ছিল। এই চক্রে বর্ণাশ্রমবিহিত আচার-বিচারের স্থান ছিল না। কিন্তু সাধারণ লোকদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব এইজন্য কণামাত্রও হ্রাস পায় নাই বরঞ্চ বাড়িয়াই গিয়াছিল। আমাদিগের তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতিতেই ইদানীন্তন কালে প্রাচীনতম বৈদিক যাগযজ্ঞের ধারা আসিয়া পড়িয়াছিল। যাজ্ঞিকদিগের ঐন্দ্রজালিক ও অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম্মের ভাব বাংলার তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতিতেই এদেশে রক্ষিত হইয়াছিল। বাংলার পৌরোহিত্যের প্রভাব সহজেই এ সকল পূজাপদ্ধতির ভিতরে খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। বাংলার প্রতিমা-পূজা বিশেষ ভাবে তান্ত্রিক মতবাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। আর এই সকল পূজাপদ্ধতির প্রয়োজনে তন্ত্রধারক, পুরোহিত প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগেরও প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এইরূপে মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে বাংলা দেশে একদিকে তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতির প্রয়োজনে ও অন্যদিকে মুসলমানের বর্ণাশ্রমবিরোধী সাম্যবাদের প্রভাব হইতে হিন্দুর ধর্ম্ম ও আচার-বিচারকে রক্ষা করিবার জন্য সে সময় বাংলা দেশে ব্রাহ্মণদিগের ও জাতিভেদের প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত দৃঢ় হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম এগুলিকে যতটা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, তাহার নাম শেষমাত্রও ছিল না। এই ধর্ম্ম ও সমাজ-শাসনের শৃঙ্খলে বাংলার হিন্দু সমাজ জড়বৎ অচল

হইয়া পড়িয়াছিল। রঘুনন্দন এই অচলায়তনের ভিত্তিকে ভাঙ্গেন নাই, বরঞ্চ সময়োপযোগী ব্যাখ্যা করিয়া এই প্রাচীন সমাজ-বন্ধনকে আরও দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই সময়ে মহাপ্রভু জাতি বর্ণ নির্বিবশেষে সকল শ্রেণীর মধ্যে হরিনাম প্রচার করিয়া এবং—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা

এই মহাবাক্য প্রচার করিয়া ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে হিন্দু ও ম্লেচ্ছকে একই সাধনপথে প্রবর্ত্তিত করিলেন। এই সাধনের মুখ্য অঙ্গ দুই—নাম জপ ও নাম কীর্ত্তন। এই জপ ও কীর্ত্তনের অধিকারী জাতিবর্ণের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় নাই ;

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়া সদা হরিঃ।

তৃণের মত যে দীন হইতে পারে, তরুর মত যে সহিষ্ণু হইতে পারে, নিজে অমানী হইয়া অপরকে যে মান দিতে পারে, এই সাধন-সম্পত্তি যার লাভ হইয়াছে, সে ব্রাহ্মণই হউক আর চণ্ডালই হউক তাহারই শ্রীহরি নাম কীর্ত্তনে অধিকার জন্মিয়াছে। ইহা দ্বারাই মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত ভক্তিসাধনে অধিকারী অনধিকারী নির্দ্ধারিত হইল। এখানে আর কোন প্রকারের অধিকারী-ভেদ স্থান পাইল না। এইরূপে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বাংলা দেশে একটা প্রবল সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত করেন। ইহার ফলে মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতি, এমন কি, তদানীন্তন সমাজে সুবর্ণবণিকাদি যাঁহাদের জল অনাচরনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত তাঁহারা পর্য্যন্ত মন্ত্রদাতা গুরুর পদ প্রাপ্ত হইলেন। তান্ত্রিক হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণেরাই একমাত্র গুরু ছিলেন। ব্রাহ্মণেতর সাধক কোথাও কুলগুরুর আসন পাইয়াছিলেন, এমন শোনা যায় নাই।

মহাপ্রভু তাঁহার বৈষ্ণব-সাধনে ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণদিগের এই একচেটিয়া অধিকার নষ্ট করিয়া দিলেন। এমন কি যাঁহারা মুসলমান কুলে জন্মিয়াছিলেন অথবা মুসলমান সংসর্গে জাতিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে পর্য্যন্ত তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লয়েন। এইরূপে শ্রীশ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভু বাংলা দেশে সাম্য মৈত্রী এবং স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজীনবীশ বাঙ্গালীদিগের মধ্যে বাংলার আধুনিক ইতিহাসে এই তথ্যটা প্রচার করেন। মহাপ্রভুর গভীর ভক্তিসিদ্ধান্ত ও ভক্তি-সাধনার কথা শুনিবার ও বুঝিবার অধিকার তখনও আমাদের জন্মায় নাই। সুরেন্দ্রনাথও তাহার সন্ধান পান নাই। কেশবচন্দ্র তখন সবেমাত্র বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভক্তিরসের একটু আধটু সন্ধান পাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ মহাপ্রভুর সামাজিক সংস্কারের কথাই বিশেষভাবে আমাদিগকে কহিয়াছিলেন। তাঁহার শিখের ইতিহাসের বক্তৃতাতে আমরা প্রথম দেখিয়াছিলাম যে য়ুরোপের স্বদেশ-ভক্তি আমাদের দেশেও ফুটিয়াছিল। দেশ-ধর্ম্ম বা দেশচর্য্যা বা patriotism য়ুরোপের একচেটিয়া নহে। ভারতবর্ষের লোকেও অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংহত প্রজাশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। জনশক্তির হাতে এদেশেও একতন্ত্রী রাজশক্তি পরাভূত হইয়াছে। সেইরূপ তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন-বিষয়ক বক্তৃতাতে আমরা দেখিলাম, স্বাধীনতা ও মানবতার নামে সমাজ-সংস্কার ও সমাজের শাসন বন্ধনকে ছেদন করিবার চেষ্টা কেবল য়ুরোপেরই হয় নাই; আধুনিক যুগে আমাদের এই বাংলাদেশেও একটা প্রবল সমাজ সংস্কার ও সামাজিক বিপ্লবের তরঙ্গ ছুটিয়াছিল। এই দুইটি বক্তৃতা দ্বারা সুরেন্দ্রনাথ আমাদের নকল নবিশী দেশভক্তি বা patriotismকে

বৈদেশিক ইতিহাসের কল্পিত প্রভাব ও প্রেরণা হইতে মুক্ত করিয়া আমাদের নিজেদের ইতিহাসের বাস্তবতার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। এ কম কথা নহে। আজ আমরা বহুল পরিমাণে আমাদের দেশচর্য্যা সাধনে য়ুরোপের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াছি। আমাদিগের নিজেদের সাধনা, সভ্যতা, শাস্ত্র, এবং ইতিহাসের উপরে দেশমাতৃকার মন্দির গড়িয়া তুলিয়াছি। কিন্তু এই পুণ্যপীঠের ভিত্তি খুঁজিতে গেলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বিকার পঞ্জাবের ও বাংলার অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাসের ব্যাখ্যাতেই তাহা খুঁজিয়া পাইব।

(৮)

সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষা কেবল আধুনিক ভারতবর্ষের প্রামাণ্য ইতিহাসের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আধুনিক য়ুরোপের ইতিহাস হইতেও তিনি বহুতর ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া আমাদের এই নূতন মাতৃপূজার যজ্ঞের সমিধ্-কুশরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেকালে এক এম, এ, পরীক্ষা যাঁহারা দিতেন এবং সেজন্য ইতিহাস পড়িতেন তাঁহাদের বাহিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আধুনিক ইতিহাস পড়িতেন না। স্কুলে আমরা লেথ্‌ব্রিজ সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং কলিয়ারের ইংলণ্ডের ইতিহাসই পড়িতাম। কলেজে আসিয়া টেলরের প্রাচীন ইতিহাস, অর্থাৎ পারস্য, ব্যাবিলন এবং বিশেষভাবে ইহুদার পুরাণ-কথা—আজিকালি তাহাকে ইতিহাস বলা যাইবে কি না সন্দেহ—এবং ইহারই সঙ্গে সঙ্গে স্মিথ সাহেব কৃত গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস পড়িতাম। এক ইংলণ্ডের ইতিহাস ছাড়া আধুনিক জগতের আর কোন ইতিহাসেরই খবর রাখিতাম না। কেহ কেহ কার্‌লাইলের French Revolution

কলেজ-পাঠ্য রূপে না হইলেও গৃহ-পাঠ্যরূপে পাঠ করিতেন। এছাড়া খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্বদেশীয় বা বিদেশীয় একতন্ত্রী রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে নবজাগ্রত প্রজাশক্তি স্বাধীনতার নামে যে সংগ্রাম করিয়াছিল, তাহার কোন সংবাদ আমরা রাখিতাম না। সাহিত্যের ভিতর দিয়া মাঝে মাঝে একটু আধটু খবর পাইতাম মাত্র। বাইরনের কবিতায় বিশেষতঃ Isles of Greece শীর্ষক পত্তে গ্রীসে যে স্বাধীনতার সংগ্রাম হইয়াছিল তাহার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার ঐতিহাসিক তথ্য জানিতাম না। হঙ্গারি, ইটালি, সুইজারল্যাণ্ড্, এমন কি আয়র্লণ্ডে পর্য্যন্ত যে স্বাধীনতার সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহার বিশেষ কিছুই জানিতাম না। ম্যাট্‌সিনি, কসুথ, উইলিয়াম টেল কিম্বা এমেটের নাম পর্য্যন্ত আমাদের জানা ছিল না। সুরেন্দ্রনাথই প্রথমে আমাদিগের নিকটে এসকল পুণ্য-কাহিনী প্রচার করেন। তাঁহারই মুখে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে ইটালির শিক্ষার্থী যুবকেরা কি করিয়া সংঘবদ্ধ হইয়া Young Italy সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, একথা শুনিতে পাই। সুরেন্দ্রনাথই প্রথমে ম্যাট্‌সিনির জীবনী, চরিত্র, দেশচর্য্যার আদর্শ এবং স্বদেশের উদ্ধারকল্পে তিনি যে প্রায় জীবনব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহার কথা আমাদিগকে বলেন। এইরূপে আধুনিক ইটালির স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাস হইতে আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা লাভ করি। আয়র্লণ্ডেও ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রথম দিকে টমাস ডেভিস এবং গাভান ডাফি প্রভৃতি নব্য শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় কি করিয়া সুষুপ্ত স্বদেশবাসীদিগকে জাগাইয়া স্বাধীনতার নামে দেশচর্য্যা-ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথের মুখেই প্রথমে আমরা সেই কাহিনীও শুনিতে পাই।

ম্যাট্‌সিনির গ্রন্থ, ডাফির Young Ireland আমাদের এই নূতন দেশচর্য্যার বা মাতৃপূজার তন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আমরা এইসকল কাহিনীতে একেবারে মশগুল হইয়া উঠিয়াছিলাম। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র প্রভৃতি যে দেশভক্তির ভাব মাত্র প্রচার করিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ তাহাকে ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনাবলীর উপরে গড়িয়া তুলেন। আমরা যে পথে ইটালি আপনার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল, যে ভাবে আয়র্লণ্ড ইংরাজের শাসন-শৃঙ্খল ছেদন করিতে চাহিয়াছিল, যে ভাবে আমেরিকা ব্রিটিশের বন্ধনমুক্ত হইয়াছিল, সেই সকল দৃষ্টান্তের অনুকরণ ও অনুসরণ করিবার জন্য চেষ্টিত হইলাম।

(৯)

রাজশক্তির প্রতিকূলে একটা ভাব না জাগিলে প্রজাশক্তি কখনও আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে না। আমরা যখন প্রথম ইংরাজী শিখিলাম, তখন ইংরাজের বিরুদ্ধে আমাদের ইংরাজী-নবীশ যুবকদিগের মধ্যে বিদ্বেষ ত দূরের কথা, কোন অশ্রদ্ধা পর্য্যন্ত জন্মে নাই। ইংরাজই আমাদের এই নূতন সাধনার দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। তাঁহারাই আমাদের বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্গতির জ্ঞান ফুটাইয়া দেন। আমরা যখন তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রেরণায় আমাদের গতানুগতিক ধর্ম্ম-বিশ্বাস এবং সমাজ শাসনের বিরুদ্ধে উঠিয়া দাঁড়াইলাম, লৌকিক ধর্ম্মের আচার বিচার বর্জ্জন করিতে লাগিলাম, জাতিভেদ প্রত্যাখ্যান করিলাম, দেবদেবীর উপাসনা মিথ্যা বলিয়া উপহাস করিতে লাগিলাম, তখন দেশের ইংরাজ রাজপুরুষেরা আমাদিগের এই সৎ সাহসের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন; পাকে প্রকারে আমাদিগের এই ধর্ম্ম ও সমাজ-বিপ্লবের আয়োজনে শক্তিসঞ্চার করিতে লাগিলেন।

সুতরাং আমাদের এই নূতন স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রথমে তাঁহারা আমাদের স্বপক্ষেই ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের ভাবের এবং আদর্শের এই ঐক্য ছিল বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা এমন কি ভক্তিও করিতাম। ইংরাজ এদেশের রাজা হইয়া আমাদের পুরুষপরম্পরাসঞ্চিত অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। অসঙ্গত সমাজশাসনের এবং অলীক ও অযৌক্তিক ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বন্ধন হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছে। ইংরাজ এদেশের রাজা না হইলে যে নূতন স্বাধীনতার অপূর্ব্ব আস্বাদন আমরা লাভ করিয়াছি তাহা পাইতাম না। ইংরাজ দেশের রাজা না হইলে হিন্দু সমাজ আমাদিগকে পিষিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিত। আমরা কিছুতেই এমন নির্ব্বিবাদে ও শান্তিতে নিজেদের মতবাদের অনুবর্ত্তন করিতে পারিতাম না; জাতিভেদ প্রভৃতি কুপ্রথা অবলীলা-ক্রমে ভাঙ্গিয়া দিতে পারিতাম না; এমন কি, স্বাধীনভাবে নিজেদের শাস্ত্র-সাহিত্যের অধ্যয়ন পর্য্যন্ত করিবার অধিকার পাইতাম না। আমাদের প্রথম যুগের ইংরাজী-নবীশদিগের এইরূপ ধারণাই জন্মিয়া-ছিল। বহুদিন পর্য্যন্ত বহুতর শিক্ষিত লোকের অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল। ইংরাজ চরিত্রের উপরে এই আস্থা, ইংরাজের সভ্যতা ও সাধনার প্রতি এই শ্রদ্ধা, ভারতের ব্রিটিশ প্রভুশক্তির প্রতি এই কৃতজ্ঞতা, আমাদিগের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষাকে প্রবল হইয়া উঠিতে দেয় নাই। সেকালের অনেক শিক্ষিত লোকেই মনে করিতেন যে আমরা ক্রমে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়া নিজেদের সমাজ-গঠনকে সুসংস্কৃত করিয়া তুলিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের উপ-যুক্ত হইলে, ইংরাজ স্বতঃ হইতেই আমাদিগকে তাহার শাসন-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিবে। ভারতবর্ষ নাবালক। ইংরাজ এই নাবালকের সম্পত্তি অলি ও অছিরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে মাত্র।

দায়াধিকারী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজের সম্পত্তির ভার যখন নিজের হাতে লইতে পারিবে, তখন তাহার সদাশয় অভিভাবক তাহাকে আপনার অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনা হইতেই প্রসন্ন চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিবেন। ইংরাজ এ কথা কহিতেন। আমাদের প্রথম যুগের ইংরাজী-নবীশেরাও এই কথাকে বেদবাক্যরূপে মানিয়া লইয়াছিলেন।

এই সকল কারণে আমাদের নূতন স্বাধীনতার আদর্শ সমাজে এবং ধর্ম্মজীবনেই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, রাষ্ট্রীয় জীবনে সে চেষ্টার ভাল করিয়া সূচনা পর্য্যন্ত হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথ এবং আনন্দমোহনও প্রথম জীবনে ইংরাজের প্রতি শ্রদ্ধাবানই ছিলেন। কিন্তু ক্রমে সমসাময়িক ইংরাজী-নবীশদিগের মতন তাঁহাদিগেরও এই শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথের প্রতি এখানকার ইংরাজ সরকার এবং বিলাতের মন্ত্রী-সমাজ পর্য্যন্ত যে অবিচার করিয়াছিলেন, তাহাতেই বিশেশভাবে তাঁহাদের চক্ষু খুলিয়া যায়। দেশের লোকেরও ইংরাজের প্রতি অবিশ্বাস দৃঢ় হইয়া উঠে। কিছুকাল হইতেই দেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইংরাজ রাজপুরুষদের একটা রেষারেষি জাগিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রথম প্রথম যখন আমরা তাঁহাদের মুখে যে বুলি শিখিয়াছিলাম, আশ্চর্য্য কৃতিত্ব সহকারে তাহারই আবৃত্তি করিতে লাগিলাম, তখন শিষ্যের বিদ্যাবত্তার প্রতিষ্ঠা দেখিয়া গুরুর অন্তরে যেমন আত্মশ্লাঘার উদয় হয়, ইংরাজের অন্তরে সেইরূপই হইয়াছিল। ইংরাজ আমাদের কৃতিত্ব দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইত। কিন্তু ক্রমে যখন আমরা তাহার শিক্ষালাভ করিয়া সেই শিক্ষার দাবীতেই ইংরাজের সঙ্গে সমান অধিকার ও আসন গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলাম, তখন গুরু-শিষ্যে প্রতিযোগিতা বাধিয়া গুরুর পূর্ব্বের স্বাভাবিক স্নেহ এবং শিষ্যের আগেকার সহজ শ্রদ্ধা উভয়ই একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। ইংরাজী-নবীশ বাঙ্গালীরা সকল বিষয়ে ইংরাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা

করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরাজও যথাসাধ্য চারিদিকে তাহাদিগকে চাপিয়া রাখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষা এই ইংরাজ বাঙ্গালীর বিদ্বেষটাকে খুবই বাড়াইয়া তুলে একথা অস্বীকার করা যায় না।

ফলতঃ সুরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার প্রাক্কালেই নানাকারণে কলিকাতা সহরে দেশীয় এবং বিদেশীয়দিগের মধ্যে একটা তীব্র বিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেকালে মেডিক্যাল কলেজে ইংরাজ ও য়ুরোপীয় সেনাবিভাগে প্রবেশার্থী ছাত্রেরা বাঙ্গালী ছাত্রদের এক সঙ্গে ডাক্তারী শিক্ষা করিত। এই সেনাবিভাগের ছাত্রেরা বাঙ্গালী শিক্ষার্থীদিগের উপরে অনেক সময়ে অত্যাচারও করিত। এই সূত্রে একবার উভয় পক্ষের মধ্যে একটা ভীষণ মারামারি বাধিয়া যায়। এই আগুনটা একরূপ সহরময় ছড়াইয়া পড়ে। শুনিয়াছি যে আটদশদিন পর্য্যন্ত এই কারণে বাঙ্গালী টোলায় ইংরাজ বা ফিরিঙ্গি আসিলেই মার খাইত; আর ইংরাজ বা ফিরিঙ্গি টোলায় বাঙ্গালী যাইলেই মার খাইত, এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। এইজন্য কলিকাতায় ছাত্রমহলে তখন হইতেই একটা প্রখর ইংরাজবিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। এই ভাবেতেও সুরেন্দ্রনাথ ইন্ধন যোগাইয়াছিলেন। স্কুল-কলেজে আমরা ব্রিটিশ ভারতের যে ইতিহাস পড়িতাম, তাহাতে ইংরাজের গুণগ্রামের কথাই দেখিতাম। কত জটিল-কুটিল নীতির আশ্রয়ে, কত রাজনৈতিক ছলে বলে কৌশলে যে ব্রিটিশ প্রভুশক্তি শনৈঃ শনৈঃ সমগ্র ভারতকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহার কথা আমরা জানিতাম না। সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষা হইতে আমরা ইহারও প্রথম পরিচয় পাইতে লাগিলাম। ম্যাটসিনির প্রবন্ধাবলী, গাভান ডাফির Young Ireland এবং Torrensএর Empire in Asia, কার্লাইলের French Revolution, মার্কিনের স্বাধীনতার ইতিহাস,

এ সকল আমাদের এই নূতন রাষ্ট্রীয় সাধনার শাস্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই শাস্ত্রের অধ্যাপক, এই সাধনার প্রধান গুরু হইয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ। আজ সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কালবশে নষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা যাহারা আজ তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়া নিজেদের দেশবাৎসল্য ও স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে সার্থক করিবার চেষ্টা করিতেছি, সুরেন্দ্রনাথের সেই প্রথম শিক্ষাদীক্ষা যদি বাংলা না পাইত, তাহা হইলে আমাদের নূতন স্বাধীনতার প্রচেষ্টা কোথায় থাকিত, এ কথা ভাবিয়া দেখি না।

বাংলার নবযুগের নাট্যকলা এবং নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র

[১৯৩২ ইংরাজীতে বিপিনচন্দ্র পাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। শরীরের অসুস্থতার জন্য তিনি ইহা দিতে পারেন নাই; এবং ঐ বৎসরই ২০শে মে তারিখে সন্ন্যাসরোগে তিনি পরলোক গমন করেন। এই অসমাপ্ত প্রবন্ধ তাঁহার একরূপ শেষ রচনা। 'নবযুগের বাংলায়' ইহা সবশেষে মুদ্রিত হইল।—প্রকাশক]

বাংলার নবযুগের নাট্যকলা এবং নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র এই বিষয়ে দুইটী বক্তৃতা দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আমাকে ডাকিয়াছেন। তাঁহাদের এই অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। এবিষয়ে আমার বিশেষ কোন যোগ্যতা আছে, এ অভিমান আমার নাই। যথোপযুক্তভাবে নূতন গবেষণা করিয়া যথা-সাধ্য এই যোগ্যতা অর্জ্জনের সময় ও শক্তিও আমার নাই। এজন্য ভয় হয় যে আমি যাহা বলিব পণ্ডিতেরা তাহাতে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য হয়ত কিছুই পাইবেন না। কে কোন্ আদর্শের তুলাদণ্ডে আমার বক্তব্যের ওজন করিবেন, জানি না। তবে নাট্যকলা সম্বন্ধে এই দীর্ঘজীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতাতে আমি যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহার দ্বারাই গিরিশচন্দ্রের রসসৃষ্টির বিচার করিতে চেষ্টা করিব। ইহাতে দোষ-গুণ যাহাই ঘটুক না কেন, তাহা আমার নিজের, অধীতবিদ্যাজনিত নহে,—এই কথাটা সকলের আগে বলিয়া রাখিতে চাই।

আমার উপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা হঠাৎ এভার কেন

অর্পণ করিলেন, জানি না। তবে গিরিশচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পরে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য কলিকাতা টাউন-হলে যে বড় সভা হয়, তাহাতে আমি দুই-চারিটী কথা বলি। আমার বোধ হয় সেই ক্ষুদ্র বক্তৃতা মনে করিয়াই আমার উপরে আজ এই গুরুভার অর্পিত হইয়াছে। সেই সভায় আমি একটা কথা কহিয়াছিলাম, অনেকের নিকটে তাহা নূতন ঠেকিয়াছিল। পুরাতন ধর্ম্মনীতিবাদীরা খৃষ্টিয় বাইবেলের দশাজ্ঞার কষ্টি-পাথরে রসসৃষ্টির বিচার করিয়া তাহার ভাল মন্দ নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। আমি এই রীতির প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। স্রষ্টার গুণাগুণ তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইবে, তাঁহার সাধারণ আচার-আচরণের দ্বারা নহে, এই কথাটা রসতত্ত্বের আলোচনায় একটা মূল কথা। সেক্সপীয়র চোর ছিলেন না সাধু ছিলেন, তিনি সত্যই হরিণ চুরি করিয়াছিলেন কিনা, তাঁহার পারিবারিক জীবন সুশৃঙ্খল বা উচ্ছৃঙ্খল ছিল, এ সকলের দ্বারা তিনি যে সকল অলোকসামান্য রসচিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন তাহার বিচার হইবে না। এসকল সৃষ্টির বিচার হইবে রসের গুণাগুণের দ্বারা। কবির কাব্যের বিচার দেউলের বা গির্জ্জার বা মসজিদের শুচিতা বা অশুচিতার দ্বারা হইবে না। এই বাহিরের শুচিতা বা অশুচিতার কষ্টি-পাথর দিয়া নাট্যকলার কিম্বা নাটকাভিনয়ের গুণাগুণ কষা যায় না। যখন যেখানে এই চেষ্টা হইয়াছে সেখানেই মনগড়া ধর্ম্ম-নীতির পীড়নে রসের স্বাভাবিক স্ফুর্ত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং ক্রমে মানবপ্রকৃতি এই অত্যাচারের প্রতিশোধ তুলিতে যাইয়া অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার স্রোতে সকল নীতির বন্ধনকে কাটিয়া দিয়া সমাজকে যথেচ্ছাচারের পথে চালাইয়াছে।

ইংরাজের ইতিহাসে দ্বিতীয় চালসের্র সময়ে ইংরাজ-সমাজ ইহার সাক্ষ্য দিয়াছে। আমাদের দেশেও বৌদ্ধযুগের অন্তিমভাগে কঠোর ও

নিষ্ঠুর বৈরাগ্যের শাসনের প্রতিক্রিয়াতে যে ফল ফলিয়াছিল, বাৎসায়ণের কামসূত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রসসৃষ্টিকে বা রসস্রষ্টাকে সাধারণ পুঁথিগত ধর্ম্মনীতির বন্ধনে বাঁধা যায় না। কখনও কোথাও ইহা হয় নাই। রসসৃষ্টির জন্য যে মুক্ত জীবন প্রয়োজন, তাহাকে প্রচলিত লৌকিক সদাচারের কঠোর বেষ্টনীর ভিতরে চাপিয়া রাখা সম্ভব হয় না।

(২)

অবশ্য সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের একটা সনাতন আদর্শ আছে। গীতা "ঊর্দ্ধমূলো অবাক্‌শাখঃ এষাঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" বলিয়া মানব সমাজের এই নিত্যসিদ্ধ আদর্শেরই ঈঙ্গিত করিয়াছেন। এই আদর্শ সমাজে মানুষ সহজ জীবন যাপন করে এবং তাহার নিত্যসিদ্ধ প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়। এই আদর্শ সমাজ 'বন্ধনমুক্ত'। সেখানে প্রেমের শাসন মাত্র আছে, অন্য কোন শাসন নাই। এই আদর্শ সমাজে সখ্য, বাৎসল্য, মধুরাদি রস প্রকৃতির প্রেরণায় আপনি ফুটিয়া উঠে। এ সমাজের নরনারীরা স্বধর্ম্ম আচরণ করিয়া মুক্তভাবে বিহার করে। আমাদের বৈষ্ণব সাধনাতে এই নিত্যসিদ্ধ আদর্শ সমাজকে ব্রজধাম বা বৃন্দাবন রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মনুষ্য সমাজ সর্ব্বত্রই আদিকাল হইতে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে—ক্বচিৎ কখনও সজ্ঞানে, অধিকাংশ সময় অজ্ঞানে, প্রকৃতি বশে এই আদর্শেরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এই আদর্শ যখন আয়ত্ত হইবে তখন ধর্ম্মনীতির সঙ্গে রসসৃষ্টির মিলন ও সমন্বয় হইয়া যাইবে। এখন এ দুইএর মধ্যে অনেক সময় যে বিরোধ দৃষ্ট হয় তাহা আর থাকিবে না। কৃত্রিম এবং কল্পিত সদাচারের সঙ্গে রসসৃষ্টির সঙ্গতি এখনও হয় নাই। কিন্তু ক্রমশঃ আধুনিক সভ্য সমাজ এই

সমন্বয়ের দিকে চলিয়াছে। যে পরিমাণে মানবসমাজ প্রাচীন এবং মধ্যযুগের শাস্ত্র-পুরোহিত শাসিত ধর্ম্মনীতির বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া মানবের প্রকৃতি নিহিত যে সহজ ধর্ম্ম তাহাকে জীবনের ধ্রুব-তারা বলিয়া বরণ করিয়া লইতেছে, সেই পরিমাণে রসসৃষ্টি এবং রসানুশীলনের সঙ্গে ধর্ম্মনীতির এবং সমাজনীতির পূর্ব্বকার বিরোধ ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া রসানুশীলন এবং ধর্ম্মাচরণকে একটা উচ্চতর ভূমিতে তুলিয়া লইতেছে। ইহার ফলে নাট্যকলা এবং রঙ্গমঞ্চও ক্রমে ক্রমে ভদ্রসমাজে আপনার যথাযোগ্য সম্মান প্রাপ্ত হইতেছে।

(৩)

কিন্তু রসসৃষ্টিরও যে কোন ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই এমন বলা যায় না। রসের রাজ্যেও তার নিজের একটা ধর্ম্ম বা নিয়ম আছে। আধুনিক সাধনার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে মানব জীবনের বিভিন্ন বিভাগের স্বারাজ্য স্বীকার করিয়াছে। রাষ্ট্রনীতির নিয়ম ধর্ম্মনীতিতে চলে না। সাম, দান ভেদাদির দ্বারা ধর্ম্মজীবন গড়িতে যাওয়া ধর্ম্ম নষ্ট করা মাত্র। আবার যে ঐকান্তিক অকপটতা ও সত্যবাদিতা ধর্ম্মনীতির প্রাণ, তাহাকে রাষ্ট্রনীতিতে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তাই বলিয়া রাষ্ট্রনীতি যে ছল-চাতুরীর পথ ধরিয়া চলিবে, এমনও নহে। ছল-চাতুরীর প্রয়োজন মন্ত্রগুপ্তির জন্য। কেবল শুদ্ধ বুদ্ধির কৌশলে এই মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করা অসাধ্য বা অসম্ভবও নহে। যুদ্ধক্ষেত্রের এক নীতি। সেখানে সেনাপতিকে আপনার চাল লুকাইয়া রাখিতেই হয়। ইহা দোষণীয় নহে। যুদ্ধবিগ্রহের লক্ষ্য যখন পরপীড়ন কিম্বা পররাষ্ট্রাপহরণ হয় তখনই যুদ্ধবিগ্রহাদির দ্বারা ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটে, মন্ত্রগুপ্তির দ্বারা নহে। যুদ্ধক্ষেত্রে অহিংসানীতি প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। যুদ্ধক্ষেত্রে অহিংসাধর্ম্মের অনুশীলন ধর্ম্ম নহে অধর্ম্ম।

তবে হিংসারও একটা নিয়ম আছে। পতিত বা আহত কিম্বা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যে অরাতি সংগ্রাম হইতে বিরত হয় কিম্বা যে অস্ত্রধারী যোদ্ধা নহে, তাহার বিনাশসাধনে উদ্যত হওয়া নিতান্তই অধর্ম্ম। আমাদিগের পুরাতন ক্ষাত্রধর্ম্মে একদিন এসকল নীতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সাধারণ ধর্ম্মের মাপকাটিতে ক্ষাত্রধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

(৪)

ফলতঃ বহুমুখ, বহুকর্ম্মশীল, বহুধর্ম্মপরায়ণ জটিল মানবজীবনের বিভিন্ন বিভাগের ভালমন্দের বিচার কোন একটা বিশিষ্ট বিধানের দ্বারা হয় না, হইতে পারে না। জীবনের বিভিন্ন বিভাগের ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার হইবে সেই সেই বিভাগের আপনার বিশিষ্ট বিধিনিষেধের দ্বারা। খামখেয়ালের উপরে কোন বিধিনিষেধের প্রতিষ্ঠা হয় না। সকল কর্ম্মেরই এক একটা বিশিষ্ট লক্ষ্য আছে। সেই ক্ষেত্রে যাহাতে সেই লক্ষ্য লাভ হয়, তাহাই বিধেয়। সেই লক্ষ্য লাভের যাহাতে ব্যাঘাত জন্মায় তাহাই নিষিদ্ধ। ইহাই সার্ব্বজনীন নীতি। ধর্ম্মসাধনের সার্ব্বজনীন লক্ষ্য মোক্ষলাভ। এই লক্ষ্য দ্বারাই ধর্ম্মনীতির প্রতিষ্ঠা হয়। সেইরূপ সমাজ-জীবনের একটা লক্ষ্য আছে। এই লক্ষ্য মানুষে মানুষে, সমাজের মধ্যে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয় সেই সকল সম্বন্ধের উৎকর্ষ সাধন এবং সেই সকল সম্বন্ধের অনুশীলনের দ্বারা সমাজের লোকের শ্রেষ্ঠতম মনুষ্যত্ব বিকাশ। এই লক্ষ্য সাধনের জন্যই গার্হস্থ্য-নীতি ও সমাজধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। সমাজ বহু ব্যক্তির সমষ্টি। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে তাহাদের নিজ নিজ স্বত্ব স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সমাজের সমষ্টিগত জীবনকে রক্ষা করিতে হয়। ইহাই সমাজধর্ম্ম। এক্ষেত্রে সন্ন্যাসীবিহিত

একান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়া সমাজ-নীতি-বিগর্হিত। এইজন্য আমাদের প্রাচীন সমাজ-নীতির বিধানে গার্হস্থ্যে সন্ন্যাসের নিয়ম চলে না, সন্ন্যাস-আশ্রমেও গৃহস্থের ধর্ম্ম খাটে না।

জীবনের বিভিন্ন বিভাগের এক একটা লক্ষ্য আছে। এই সকল বিশিষ্ট লক্ষ্য সাধারণ মানব জীবনের সার্ব্বজনীন লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত। জীবনের বিভিন্ন বিভাগের এই সকল বিশিষ্ট লক্ষ্যের দ্বারা তাহার ধর্ম্ম বা নীতির প্রতিষ্ঠা হয়। সেই লক্ষ্য লাভের সাহায্য যাহাতে হয় তাহাই বিধেয়; সেই লক্ষ্য লাভের ব্যাঘাত যাহাতে হয় তাহাই নিষিদ্ধ। ইহাই সার্ব্বজনীন নীতি বা ethics। আধুনিক ধর্ম্মনীতিশাস্ত্রে বা ethics-এ এই সাধারণ লক্ষ্যের নাম আত্মোপলব্ধি; ইংরাজীতে self-realisation। বাহির হইতে ধার করা কোন বিধিনিষেধের দ্বারা আধুনিক ধর্ম্ম-নীতি পরিচালিত হয় না।

(৫)

নাট্যকলার লক্ষ্য রসসৃষ্টি। নাটকাভিনয়ের লক্ষ্য চিদাকার রসের রূপকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকারে ফুটাইয়া তোলা। এই লক্ষ্যের দ্বারাই নাট্যকলার এবং রঙ্গমঞ্চের নীতির নির্ণয় হইবে। এই লক্ষ্য লাভের যাহা সহায়, এ রাজ্যে তাহাই ধর্ম্ম বা নীতি; যাহা অন্তরায় তাহা অধর্ম্ম বা দুর্নীতি। এই মূল সত্যের উপরেই নাট্যকলা বা রঙ্গমঞ্চের স্বারাজ্যের প্রতিষ্ঠা। এখানে মনুর বা পরাশরের, ত্রিপিটকের কিম্বা বাইবেলের নিয়ম খাটাইলে চলিবে না। এই কথাটাই আমি গিরিশ-চন্দ্রের স্মৃতিসভায় কহিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কথাটা হয়ত সকলের প্রীতিকর হয় নাই, অথচ নিতান্ত 'নীতিবদ্ধ' লোকেও সরাসরিভাবে এই কথাটা উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। অন্যদিকে বাংলার আধুনিক রঙ্গমঞ্চের নটনটীরা নিজেদের আত্ম-মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং

চরিত্র রক্ষার একটা পথের ইঙ্গিত, মনে হয়, এখানে পাইয়াছিলেন। নিতান্ত নীতিবদ্ধ যাঁহারা তাঁহারাও যদি কথাটা তলাইয়া দেখেন তাহা হইলে তাঁহাদের নিজেদের আদর্শের সঙ্গে রসসৃষ্টির একটা সমন্বয়ের পথ দেখিতে পাইবেন।

কারণ, সংযম যেমন ধর্ম্মসাধনের সেইরূপ নাট্যকলা এবং রঙ্গ-মঞ্চেরও সাধারণ নিয়ম। রস এবং ইন্দ্রিয়ভোগ এক নহে। ইন্দ্রিয় ভোগ মাত্রই রসের পর্য্যায়ে উঠে না। বিষয়-সাক্ষাৎকারে ইন্দ্রিয়ের যে চরিতার্থতা লাভ হয় এবং এইজন্য যে আনন্দ উপচিত হয় তাহা যতক্ষণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সীমাকে অতিক্রম করিয়া না যায়, ততক্ষণ রসের জন্ম হয় না। রস বস্তু অতীন্দ্রিয়। রসের ভূমি—ইংরাজীতে যাহাকে romantic plane কহে—তাহা আধ্যাত্মিক বা spiritual। তাহা কখনও ইন্দ্রিয় বিকারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না। এইজন্য অসংযমে রসের অনুভূতি হয় না। আমাদের বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীতে এই সত্যটাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কহিয়াছেন—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হাম ওরূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
সোহই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধু যামিনী রভসে গোঁহায়িনু
না বুঝিনু কৈছল কেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাঁখলু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

এই সত্যটারই ইঙ্গিত পাইয়া জর্জ্জ ইলিয়ট কহিয়াছেন, "Our love at its highest flood goes beyond its object and loses itself in the Infinite।"

বৈষ্ণব সাধনার রসতত্ত্বে প্রথম কথাই ইহা। "উজ্জ্বলনীলমণির" প্রথম সূত্র এই—

নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিকারঃ।

ইন্দ্রিয়ের বিষয় ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেও যে চিত্ত তাহার ভোগের জন্য কিঞ্চিন্মাত্র চঞ্চল হইয়া উঠে না, সেই চিত্তকেই নির্ব্বাকার চিত্ত কহে। যে জিতেন্দ্রিয় নহে, সে কখনও এই নির্ব্বিকার অবস্থা লাভ করে না। যাহার এই নির্ব্বিকার অবস্থা লাভ না হইয়াছে সে কখন রসের আস্বাদন করিতে পারে না। তাহার অন্তরে সত্য রসের অনুভূতি হয় না। যাহার অন্তরে সত্য রসের অনুভূতি হয় না, সে কখন রসের ছবি আঁকিতে বা ফুটাইতে পারে না। অসংযত ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় তাহার সতত চঞ্চল চিত্তে রসের রূপ বসিতে পায় না। নিয়ত কম্পিত দর্পণে যেমন কোন কিছুর রূপ ধরা যায় না, সেইরূপ ইন্দ্রিয় লালসা-বিক্ষিপ্ত চিত্ত-দর্পণে কোন রসের মূর্ত্তি প্রকাশিত হয় না। যে রসের রূপের সৃষ্টি করে বা করিতে পারে, সে সেই সৃষ্টিকালে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় রাজ্যের বাহিরে অতীন্দ্রিয় জগতে যাইয়া উপস্থিত হয়। ইহাই রসসৃষ্টির সার্ব্ব-জনীন অভিজ্ঞতা। ইহা যোগেরও অভিজ্ঞতা। যোগযুক্ত না হইলে রসস্রষ্টা হওয়া যায় না। যোগযুক্ত না হইয়া কেহ রসের সত্য রূপকেও রঙ্গমঞ্চে ফুটাইয়া তুলিতে পারে না। যতক্ষণ কবি রসের সৃষ্টি করেন, ততক্ষণ তিনি যোগযুক্ত হইয়া থাকেন। এই যোগ ভাঙ্গিয়া গেলে তাঁহার যে অবস্থাই হউক না কেন, তাহার দ্বারা তাঁহার রসসৃষ্টির ব্যাঘাত হয় না, বিচারও হইতে পারে না। নটনটীও যোগযুক্ত না

হইয়া রঙ্গমঞ্চে কোন রসের সত্য রূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারেন না। যে সকল নট বা নটী রসের ভূমিতে যাইয়া উঠিতে পারেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই সেই সৃষ্টিকালে সেই সৃষ্টিকার্য্যের লোভে সংযম সাধন করিতে হয়। যাঁহারা করেন না বা পারেন না, তাঁহাদিগের নাট্যকলা ফুটিয়া উঠে না, ফুটিয়া উঠিবার অবসরও পায় না। তাঁহাদের কৃতিত্ব নাট্য-রসের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। দেহের ললিত লাবণ্য, কণ্ঠের মধুরতা কিম্বা রিরংসার হাবভাবের দ্বারা দর্শকবৃন্দের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া তাঁহারা সাময়িক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেও পারেন, কিন্তু সত্য স্রষ্টার পূত আসনে তাঁহাদের স্থান হয় না।

(৬)

অমূর্ত্ত রসকে মূর্ত্তি দান করা নাট্যকলার মুখ্য উদ্দেশ্য। কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতিও ইহাই করিতে চাহে। তবে একদিকে সাধারণ কাব্য এবং উপন্যাস, আর অন্যদিকে দৃশ্যকাব্য এবং নাটকের প্রভেদ এই যে, কাব্যে এবং উপন্যাসে কবি আপনার কল্পনাবলে শুদ্ধ ভাষার সাহায্যে বিভিন্ন ঘটনাবলীর সংযোজনের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রসের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। নাট্যকারকেও তাঁহার সৃষ্টির জন্য এই সকল উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। উপাখ্যানের নায়ক-নায়িকা প্রভৃতিকে পরস্পরের মধ্যে কথোপকথনের দ্বারা আপনাপন মনোভাব ব্যক্ত করিতে হয়, এবং যথোপযোগী ক্রিয়া বা অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা সেই মনোভাবকে দৃঢ় করিয়া দর্শকদিগের মনে মুদ্রিত করিতে হয়। কিন্তু উপন্যাসে বা কাব্যে যাহাদের চরিত্র বর্ণিত হয় তাঁহারা সাক্ষাৎভাবে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হন না। সুতরাং মোটের উপরে সমগ্র কাব্যখানি বা উপন্যাসটি পাঠ করিয়া তবে পাঠককে কাব্যোল্লিখিত কিম্বা উপন্যাস-বর্ণিত ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের চিত্র আপনার

মনোমধ্যে কল্পনার তুলিতে আঁকিতে হয়। প্রতি মুহূর্ত্তে কাব্য বা উপন্যাস পড়িবার সময়ে সেসকল চরিত্রের ছবি তিলে তিলে পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয় না। নাটক বা দৃশ্যকাব্যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নাটকীয় রসের ছবি দর্শকবৃন্দের চক্ষের উপরে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। অল্প সময়ের মধ্যে ঘটনাবহুল বিচিত্র ভাবসমাকুল আখ্যায়িকার সমগ্র একটি ছবি নাট্যকার ও নটনটীদিগকে রঙ্গমঞ্চে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। এইজন্য নাট্যরচনায় নাটকের মূল লক্ষ্য স্থির করিয়া নাট্যকারকে অনন্যমনে সেই লক্ষ্যের অনুধাবন করিতে হয়। নাটকীয় উপাখ্যানে অনেক অবান্তর বিষয় চিত্তের সমক্ষে উপস্থিত হইলেও সেসকলের অনুসরণের লোভ ত্যাগ করিয়া মূল লক্ষ্যের যাহা অনুকূল, কেবল তাহাকেই বাছিয়া লইয়া নাটকীয় চিত্রে গাঁথিয়া তুলিতে হয়। যে নাট্যকার আগন্তুক বা অবান্তর বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহার অনুসরণ করেন, তাঁহার নাট্যকলা আদর্শ লাভে সমর্থ হয় না। কাব্যে কিম্বা উপন্যাসে এসকল অবান্তর বিষয়ের অনুসরণ মার্জ্জনীয়, কখন কখন তাহার দ্বারা কাব্যের বা উপন্যাসের উৎকর্ষ সাধনের সাহায্য হইয়া থাকে। নাটকে ইহা অমার্জ্জনীয়। ইহা দ্বারা নাট্যকলার ব্যভিচার ঘটিয়া থাকে। আমাদের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসে মুদির দোকানে নীলকমল এবং তাহার সঙ্গীকে আনিয়া গ্রন্থকার ব্রাহ্মসমাজের উপরে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা উপন্যাসে দুষনীয় নহে, কিন্তু নাটকে অমার্জ্জনীয় হইত। কারণ "স্বর্ণলতার" মূললক্ষ্য একান্নবর্ত্তী পরিবারের এক ভ্রাতা উপার্জ্জনক্ষম আর এক ভ্রাতা উপার্জ্জনে অক্ষম হইলে এই অবস্থার বৈষম্য হইতে যে হিংসা, দম্ভ প্রভৃতির সৃষ্টি হয় তাহাই ফুটাইয়া তোলা। ইহার সঙ্গে মুদির দোকানে নীলকমলের ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি ইঙ্গিত করার কোন সম্বন্ধ নাই। ঐ আখ্যায়িকাটি বাদ দিলে উপন্যাসের অঙ্গহানি হইত না। তবুও উপন্যাসে এরূপ

অবান্তর বিষয়ের অবতারণা অমার্জ্জনীয় নহে। আমাদের প্রাচীন যাত্রাগানে শ্রোতৃমণ্ডলের চিত্তকে একটু বিশ্রাম দিবার জন্য মাঝে মাঝে সঙের অবতারণা হইত। সেইরূপ স্বর্ণলতায় এই অবান্তর চিত্রটির সমাবেশও উপন্যাসে মার্জ্জনা করা যায়। আমার মনে নাই স্বর্ণলতার অভিনয়ে এই চিত্রটি বাদ দেওয়া হইয়াছিল কি না। যদি না হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার দ্বারা "সরলা" নাটকে নাটকের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, এ কথা বলিতে হইবে।

ফলতঃ উপন্যাসেই হউক কিংবা নাটকেই হউক সত্য রসস্রষ্টা কখন আপনার উপাখ্যানে এরূপ অবান্তর বিষয়ের সমাবেশ করেন না। তাঁহারা যোগযুক্ত হইয়াই আপনাদের সৃষ্টিকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে এরূপ অবান্তর বিষয়ের অবতারণা দেখা যায় না। তাঁহার উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা এবং বিবিধ ঘটনাবলীর পরস্পরের সঙ্গে এমনই আটা গাঁথুনি দেখিতে পাই যাহাতে কোন অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রবেশের অনুপরিমাণেও অবসর নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি অতি সহজেই এইজন্য নাট্যাকারে পরিণত হইতে পারিয়াছে।

(৭)

নাট্যকলার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে ঘটনাবৈচিত্র্য আছে, কিন্তু প্রত্যেক ঘটনাটি একটা মূল বস্তুকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কল্পিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে সেক্ষপীয়ারের মেক্‌বেথের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম অঙ্কে ডাইনীদিগের সঙ্গে দর্শকের এবং মেক্‌বেথের পরিচয় ঘটাইয়া পরে রাজপদ লোভে মেক্‌বেথের অন্তরে যে সাংঘাতিক ও একরূপ বৈপ্লবিক বিকার উপস্থিত হয়—কবি তাহারই বীজ বপন করেন। ডাইনীরা মেক্‌বেথের অন্তরে যে লোভের বিষ লুকাইয়াছিল

তাহাই আশ্চর্য্য কৌশল সহকারে বাড়াইয়া তোলে। তারপর নাটকের ঘটনাবলীতে এই বিষবৃক্ষই অঙ্কুরিত, পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া মেক্‌বেথের জীবনের নিদারুণ "ট্রেজিডি"র সৃষ্টি করিয়াছিল। এইরূপ সকল উৎকৃষ্ট নাটকেই প্রত্যেকটি ঘটনা একটা মূল ঘটনা বা বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া ঘটে। কালিদাসের শকুন্তলাতেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্ব্বাসার শাপ, নদীতে স্নান করিতে যাইয়া শকুন্তলার অঙ্গুলী হইতে দুষ্মন্ত দত্ত অঙ্গুরীয়ের স্খলন এই দুইটি সামান্য ও আকস্মিক ব্যাপার ঘটাইয়া কবি শকুন্তলা যে দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন ইহার নিদান দেখাইয়াছেন। পরে ধীবর কর্ত্তৃক রাজার অঙ্গুরীর উদ্ধার ও রাজার নিকটে তাহা উপস্থিত করা—ইহাও দুষ্মন্ত শকুন্তলার পুনর্মিলনের সূত্ররূপে গ্রথিত হইয়াছে। এইরূপে শ্রেষ্ঠ অঙ্গের নাটক মাত্রেই প্রত্যেক ঘটনা একটা মূল লক্ষ্যকে ধরিয়া চলে এবং তাহাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। যেখানে ইহা হয় না সেখানে নাট্যকলার আদর্শ ভ্রষ্ট হইয়া যায়।